# বাংলার নাটক

# ও

# নাট্যশালা

শচীন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

চার টাকা

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীমুরারিভূষণ গুহ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়—১৩৬৪

# নিবেদন

বাংলার নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বইখানি আমি লিখিনি। প্রায় ত্রিশ বছরকাল বাংলার নাট্যশালার নানা প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত থেকে, বাংলা নাট্যশালার জন্য নানা ধরণের নাটক লিখে, পৃথিবীর নানা নাট্যান্দোলনের বহু নায়কের সঙ্গে আলাপ আলোচনার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে আমাদের নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা জন্মেছে, তাই আমি বোঝাতে চেয়েছি।

সকল বাংলা নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে আমি আলোচনা করিনি, মূল ধারাটি ধরেই শুধু অগ্রসর হয়েছি। ইতিহাস যা এসে পড়েছে, তা প্রায় সবই নিয়েছি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' থেকে। বাংলার নাট্যশালা ও নাট্যানুরাগীরা চিরদিন তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হবে। তিনি যেখানে ইতিহাস শেষ করেছেন, বাংলার নাট্যশালা তার পরও ইতিহাস রচনার নানা উপাদান সৃষ্টি করে চলেছে। সে ইতিহাস লেখবারও সময় আজ এসেছে।

বাংলার নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস লেখবার জন্য যে নিরপেক্ষতা আবশ্যক, আমার তা নেই; থাকবার কথাও নয়। ত্রিশ বছর কাল আর সব-কিছু ছেড়ে যা নিয়ে কাটিয়েছি, তার প্রতি আমার মায়া ও মোহ থাকবে না এমন জ্ঞানী লোক আমি নই। অবিচার আর কুশাসন যে মায়া আর মোহের চেয়ে সৃষ্টির বেশি সহায়ক, মানুষের বৈচিত্র্য বহুল সৃষ্টির ইতিহাসে তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শচীন সেনগুপ্ত

# বাংলার নাটক ও নাট্যশালা

# বাংলার নাটক ও নাট্যশালা

## পুরাতন প্রসঙ্গ

নাটক আর নাটুকেদের কথাই বলতে বসেছি। আমরা নাটুকে। আমাদের নাটক লেখবার, মঞ্চস্থ করবার, এবং অভিনয় দেখবার সখ আছে। আমরা নাটককে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি, নাটকের মাধ্যমে কিছু কিছু বাণীও আমরা প্রচার করেছি, এবং তার ফল বিচার করে দেখে আরো কিছু প্রচারের অভিপ্রায় রাখি। বিজ্ঞরা বলেন, সখ আছে—মেটাও সখ; কিন্তু সমাজের ক্ষতি কোরো না। আমরা বলি, যে আজ্ঞে! সমাজের ক্ষতি করবার মতলব নিয়ে আমরা নাটক লিখি না, নাটক অভিনয় করি না। আমরা জানি সমাজের ক্ষতি যাতে হয়, তা নাটক হয় না। এককালে একদল বিজ্ঞ বলেছিলেন, বঙ্কিম বিষবৃক্ষ লিখে বাংলার ঘরে-ঘরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে গেছেন। আজ কেউ তা বলেন না, যদিচ ক্ষতি কখনো কখনো কিছু কিছু কোথাও কোথাও হয়েছে। কিন্তু প্রচুর লাভ সে ক্ষতি তলিয়ে দিয়েছে। বিষ আর অমৃতের তফাৎ মানুষ বুঝেছে, ভাববার অবসর পেয়েছে—বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করা যায়। আমাদের সখের ফলে ক্ষতি যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকে, লাভও হয়েছে প্রচুর। এত লাভ হয়েছে যে, মানুষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এই কথা ব'লে যে,—নিরক্ষর-প্রধান এই দেশে সঙ্গীত নাটক আর নৃত্য সংস্কৃতিকে দ্বারে দ্বারে বহন করে এমন এক সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা সকল বহু-ভাষাভাষী দেশে দেখা যায় না; যার সর্বজনীনতা সকল এক-ভাষাভাষী দেশেও সুলভ নয়। সুতরাং আমরা জেনে ফেলেছি আমাদের এই সখ অকল্যাণ করেনি, যদিচ কখনো কখনো এই সখ

কিছু কিছু অনাচারকে, ব্যভিচারকে, অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ধর্মের সখ, দিগ্বিজয়ের সখ, রাজচক্রবর্তীত্বের সখ, এমন কি দার্শনিকতার সখও তা দিয়েছে।

ধর্মের সৌখীনরা গোড়াতেই বুঝেছিলেন, তাঁদের সখকে রূপায়িত করতে হলে নাটুকে সৌখীনদের সহায়তা অপরিহার্য। তাই মন্দির-গীর্জাতেই সকল দেশের নাটক জন্ম লাভ করেছে,—সৌখীন-ধার্মিকদের রচিত অথবা কথিত কাহিনীকে রূপ দিয়েছে। কিন্তু জন্ম লাভ করবার পর থেকেই সে পৃথক হবার চেষ্টা করেছে। মন্দির-গীর্জার নাট-মন্দির তার পরিণতির পক্ষে একান্ত অপরিসর, নেহাৎই সংকীর্ণ ক্ষেত্র, বলে তার মনে হয়েছে। সে ছুটে বাইরে আসতে চেয়েছে। এসেছেও তাই। এইজন্যই এসেছে যে, মন্দির-গীর্জায় জন্ম তাকে অন্তরে অন্তরে বৈরাগী করে দিয়েছে, ভূমার সন্ধানী করে দিয়েছে। গতি, আত্মবিস্তৃতি, বহুরূপী হবার প্রবৃত্তি, তাকে মন্দির-গীর্জা থেকে পথে-প্রান্তরে টেনে বার করেছে। দেবতাকে সে দেখেছে সমাজের মানুষে মানুষে। জীবনের সাধনাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে মানুষের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার, পাপ-পুণ্যের, অন্তরের সুরাসুরের সংঘাতে প্রতিফলিত। এই সব সংঘাত যদি না থাকত, তা হলে মানুষ জড় হয়ে যেত, গতির প্রেরণা পেত না, পরম পরিণতির স্বপ্ন দেখত না। নাটক তাই বাইরে এসেই সংঘাতকে আর পরিণতিকে অপরিহার্য বলে মেনে নিল। কিন্তু সংঘাতকে রূপ দিতে হলে মানুষের অন্তরের বিপরীত প্রবৃত্তিগুলির প্রবলতা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করতে হয়। তাই সৃষ্টি হয় চরিত্র। সুদৃঢ় চরিত্র না হলে সংঘাত হবে কেমন করে? ভাষায় আমরা সংঘাত বলতে বুঝি স্থূল বস্তুর বা ব্যক্তির সংঘাত; চরিত্রবান লোক বলতে বুঝি নিয়মানুগ সৎ-স্বভাবের লোক। নাটকের সংঘাত মূলত অন্তরের সংঘাত, নাটকের চরিত্র সদসৎ উভয়ই।

মানুষের পরম পরিণতি আজও অজানা। অন্তত ভারতবর্ষ মৃত্যুকেই মানুষের পরম পরিণতি বলে জানে না। শুধু জানে তা অপরিহার্য; কিন্তু শেষ নয়, কায়া পরিবর্তন। শেষ ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু নাটকে পরিণতি আনতেই হবে। যা জানা নেই, তা নাটকে কেমন করে ঘটানো যায়? কেবল মাত্র ইঙ্গিতে, জানবার প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে।

# পুরাতন প্রসঙ্গ

ভারতীয় নাটক জন্ম থেকে সুরু করে ক্রমশ যতই পরিপুষ্ট হতে লাগল, ততই রূপকে অরূপে, বাস্তবকে ধ্যানের মূর্তিতে, এককে বহুরূপে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে চলল। অর্থাৎ সে হয়ে উঠল স্বাধীন, স্বয়ম্ভু। নিয়মের শৃঙ্খল সে পায়ে পায়ে ছিঁড়ে চলে, চলে মুক্ত অঙ্গনের সন্ধানে, চলে জনতার পাশে-পাশে, সাথে-সাথে। সে ইউনিটি মানে না, সে অদৃষ্টের অপরিহার্যতা দেখাবার জন্য ট্রাজেডিতেই যবনিকা ফেলে না, সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য বজায় করে রাখবার জন্য সে শুচি-বিকারে আচ্ছন্ন থাকে না। গদ্যে-পদ্যে, লোক-সংগীতে, লোক-নৃত্যে, নিজেকে সম্পন্ন ক'রে সে রস সৃষ্টি করে। আর সেই রসের প্লাবন বইয়ে দেয় সারা দেশে, সমাজের সর্বস্তরে। তার সখ আর সখ থাকে না, সাধনা হয়ে দাঁড়ায়।

রাজারা তাকে সমাদর করে নিয়ে যান প্রাসাদে। তাকে দেন রকমারি মঞ্চ, দেন যবনিকা, প্রেক্ষাগৃহ, সাজ-ঘর। দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে দেন বিদগ্ধ অভিজাতদেরকে। নাটুকেরা বলেন: সুন্দর! তোমরাও তো মানুষ, তোমরাও আমাদের সেবার দাবী রাখ। আদি রসে তোমরা মজে আছ, তাই-ই পাবে আমাদের নাটকে। কিন্তু বুঝিয়ে দেব সে-রস বড় সহজ রস নয়। বীর্য ব্যতীত, ত্যাগ ব্যতীত, কৃচ্ছ্র-সাধন ব্যতীত, সে রস চেখে-চেখে উপভোগ করা যায় না। শুধু তৃষ্ণার তাড়ায় পেট ভরে সে রস পান করলে বদহজম হয়, রাজা দুষ্মন্তের যেমন হয়েছিল।

রাজ-পণ্ডিতরা এলেন নাট্য-শাস্ত্র রচনা করবার আবেদন নিয়ে। গ্রীক্ আরিস্টটল আগে-ভাগে তা রচনা করে রেখে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় নাটুকেরা বল্লেন—শাস্ত্র রচনা করতে চাও কর, কিন্তু মানা না-মানা আমাদের অভিপ্রায় ও প্রয়োজন। গ্রীক্ নাট্যশাস্ত্রবিদ্ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী আরিস্টটল্ কি লিখেছেন জানি না। কিন্তু তার প্রিয় শিষ্য আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের ভেতর দিয়ে গ্রীক্ জাতির মতি-গতি ও প্রবৃত্তির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে খুব আশান্বিত—অনুপ্রাণিত হতে পারিনি। ও হানাহানির আমদানী কল্যাণকর হবে না। একদিকে বেদ আর ব্রাহ্মণ, অন্য দিকে মহাবীর ও বুদ্ধ এবং তার পর অশোক, জীবনের আদর্শ ও আদর্শজাত সংঘাতের

যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারই অপরূপ রূপ আমাদের চিত্ত জয় করেছে।

শাস্ত্রকার ভরত, নাটুকে ভরত, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন রূপকে-উপরূপকে মিলে তিরিশ প্রকার নাট্য প্রয়াসকে। মুড়ি আর মিছরীকে অবশ্য পৃথকই রেখে-ছিলেন। কিন্তু একের বহুরূপের প্রকাশকে তিনি দিয়েছিলেন সমর্থন। যথার্থ বাক্-স্বাধীনতা, ভাবাভিব্যক্তির স্বাধীনতা যে সৃষ্টির সহায়ক, তা ভরতের জানা ছিল, এবং পরবর্তী ভারত, আলেকজান্দারের প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ভারত আর গুপ্ত-আমলের ভারত, তাকেই মানুষের সর্বৈব মুক্তির উপায় বলে জেনেছিল। সেই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা।

মানুষের সর্বৈব মুক্তির যে বাণী কণ্ঠে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই বাণী সারা পূর্ব-এশিয়ার অধিবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করল। নাটুকেরা তাদের মনে রং ধরিয়ে দিলেন ভারতীয় নাটককে ভাষার উর্ধ্বে তুলে, তাকে বর্ণ-বহুল এবং আদর্শবহ করে। অথচ পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই আদর্শবহ সাংকেতিক নৃত্য-নাট্য পূর্ব-এশিয়ার নানা দেশের জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিতও হ'ল, আর তাদেরই গণনাট্যের অংশও হয়ে উঠল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর ভি, রাঘবন সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী অনুষ্ঠিত ড্রামা-সেমিনারে যে প্রবন্ধটি পড়েছেন, তাতে তিনি বিষয়টার দিকে নাটুকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই কথা বলে :—

In the classic Chinese drama presented in gesture and song, there is not only the preservation of codified system of *Gati* or gaits but a considerable part of our *angika* or chitrabhinaya. The Chinese classics, the Nohi of Japan, the Behou of Thailand, the Ramayana dance of Laos, the Cambodian ballet, the Burmese poye, and the Ceylonese kandyan dance preserve for us chapters of Bharata's Natya Sastra.

ভাবুন ত ভারতীয় নাটুকেরা কী কাণ্ডই না করেছিলেন, কী অঘটনই

না ঘটিয়েছিলেন! তাঁরা সৌখীনই ছিলেন, কিন্তু সখকে করে নিয়েছিলেন সাধনা। আজকাল যেমন সরকার থেকে কালচুরাল ডেলিগেশন পাঠানো হচ্ছে, তখনকার দিনে যে অনুরূপ ডেলিগেশন পাঠানো হ'ত, তার সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন নেই। ব্যক্তিগত ভাবে এবং দল বেঁধে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা রেফিউজী হিসেবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে, বহু ভারতবাসী, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী গৃহী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দলে দলে ভারত ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরাই ভারতীয় নৃত্য-নাটককে রূপ দিয়েছিলেন দেশে দেশে। তাঁরা সৌখীনই ছিলেন, কিন্তু সাধনারও পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁরা নাট্যাভিনয়কে বৃত্তিই করে নিয়েছিলেন, বাণীও প্রচার করেছিলেন—কেবল রামায়ণ মহাভারতেরই বাণী নয়, বুদ্ধের মানব স্বাধীনতার বাণী, ভারতীয় অশিক্ষিত জনগণের সহজাত স্বাধীন প্রগতিরও বাণী। তবেই না তা পূর্ব-এশিয়ার মুক্তিকাম মানুষের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেই সৌখীন নাটুকেরা যদি না তাঁদের সাধনালব্ধ শক্তি নিয়ে বাণী প্রচারে অগ্রসর হতেন, যদি পরমুখাপেক্ষী থাকতেন, তা'হলে তাঁরা এ-কাজ করতে পারতেন না। তাঁরা ওকে বৃত্তি করে নিয়েছিলেন ওকে খর্ব না করে, বিকৃত না করে; ওকে রুজি-রোজগারের উপায় করে নিয়েছিলেন বলেই নিশ্চিত করে জেনেছিলেন বিদেশ-বিভূঁই হলেও দিন তাঁদের চলে যাবে, অনশনে মরতে হবে না। ভরসা যেমন ছিল নিজেদের বাণীর ওপর, তেমন ভরসা ছিল বিদেশীদের মুক্তি-পিপাসার ওপর, রস-বোধের ওপর।

দেশের সীমানার মাঝেও যুগে যুগে কত আউল-বাউল, কথক-কীর্তনীয়া, কত রামায়ণ-পাঁচালীর গাইয়ে, কত কবি-তরজার পরিবেশক, কত মঙ্গল-ভাসান-জারি-যাত্রার নাটুকে ব্যক্তিগতভাবে বা সম্প্রদায়গতভাবে সারা দেশে মানুষের প্রগতির, উন্নতির, মুক্তির বাণী প্রচার করে ফিরেছেন। মানুষের মনে-মনে যুগে-যুগে যত দুঃখ, যত গ্লানি, যত হতাশা, যত অজ্ঞানতা জমে উঠত, ওই নাটুকেরা তার সংস্কার করে দিতেন, জন-মনে উর্ধ্বলোকের আলো ঢেলে দিতেন। তারই ফলে ভারতের নিরক্ষর জনগণ অজ্ঞ রইল না; শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝতে না পেরেও আলংকারিক-ধ্বনি শুনেই বিষয়ের

মর্মোপলব্ধিতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল, অভিনয়ের মুদ্রা অবোধ্য রইল না, কাব্য-দর্শন-অলংকার সমন্বিত নাটুকে ভাষা, মার্গ-সঙ্গীত, তাদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করেই ফিরে এল না, চিত্ত জয় করে নিজেদের ঠাঁই করে নিল, কল্পনা-শক্তি হ'ল প্রগাঢ় ও প্রবলতর। নাটক বুঝতে তাদের মুদ্রিত প্রোগ্রামের প্রয়োজন হত না, মুদ্রিত ভূমিকা-লিপিতে পাত্র-পাত্রীদের পরিচয়ের আবশ্যক হ'ত না; নাটকের ভাষা শুনেই তারা বুঝতে পারত কখন 'বৃন্দাবন' কল্পনা ক'রতে হবে, কখন পাহাড়, কখন প্রাসাদ, কখন শ্মশান, কখন প্রমোদ-কানন। নাটকের ভাষা ছিল মুখ্যত অভিনেতৃদের জন্যে, আর প্রধানত অভিনয় ছিল দর্শকদের জন্যে; গান ছিল গাইয়েদের জন্যে, আর সুর ছিল শ্রোতৃদের জন্যে। তাই সৌখীন সেই নাটুকেদের তনু-মন-ধ্যান-ধারণা সব নিয়োগ করতে হ'ত অভিনয়ে। শুধু সখ থেকে যা সুরু হ'ত, তা হ'য়ে উঠত জীবনের সাধনা। তাই অভিনয়ের বাক্য, সংগীতের সুর, হয়ে উঠত ব্রহ্ম আর সুরধুনী, জন্ম ও মুক্তির নিত্য প্রবাহ।

বললে মিথ্যে নিশ্চিতই বলা হয় না যে, ভারতের নিরক্ষর, দরিদ্র, বঞ্চিত, উপেক্ষিত জনগণ, শিক্ষিত, সম্পন্ন, স্বাধিকারলব্ধ, সর্বসমাদৃত স্বল্প-ভাগ্যবানদের চেয়ে জ্ঞানে রুচিতে, শালীনতায়, কল্পনায়, পরহিত-কামনায়, মায়ায়, মমতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় খাট নয়, ছোট নয়। বর্তমান ভারতের প্রধান চতুর্দশটি ভাষা রূপ পরিগ্রহ করেছিল এই জনগণেরই মাঝে উদ্ভূতদের আত্মপ্রকাশের আবেগ-আকুতি থেকে, যাঁদের কেউ কেউ নিজেরাই ছিলেন নিরক্ষর। কেমন করে এ সম্ভব হ'ল? অনেক কারণের মাঝে একটি কারণ সৌখীন নাটুকেদের সখের পরিণতি,—মানুষের মুক্তির জন্য তনু-মন নিবেদন।

## (২)

## নূতনের আবির্ভাব

সেই সুদূর অতীত থেকে মনকে টেনে আনা যাক্ অষ্টাদশ শতকের অন্তিম দশকের শেষার্ধে এই কোলকাতার সৌখীন নাটুকেদের নবনাট্য প্রয়াসে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেরাসিম লেবেদেফ নামক জনৈক রুশদেশীয় ভদ্রলোক একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করলেন বর্তমান এজরা ষ্ট্রীটে, যার তখনকার নাম ছিল ডুমতলা।

কে এই লেবেদেফ? বছর কয়েক আগে বোম্বাই শহরে একটি বিদেশিনী মহিলা, মিসেস আসরাফ, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোলকাতায় লেবে-দেফের কোন স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে কিনা? হয় নি শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। লেবেদেফ যে থিয়েটার করেছিলেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝে তাঁকে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। সে থিয়েটারের জীবন হয় স্বল্পস্থায়ী—পুরো দু'বছরও নয়। তিনি দু'খানি নাটক নির্বাচন করেন—The Disguise ও Love is the Best Doctor। অনুবাদ তিনি নিজে করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাস। নাটকে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' পালাযাত্রা থেকে গান দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল বাঙালী হাল্কা রসের পক্ষপাতী। পণ্ডিতরা বলেন, তাঁর প্রয়াসের সঙ্গে পরবর্তীকালের বাঙালীর নাট্য-প্রয়াসের কোন সম্বন্ধ নেই। আছে কি নেই, এখানে তা আমি আলোচনা করতে চাই না। শুধু এই কথা বলতে চাই যে, পলাশীর যুদ্ধের মাত্র আটত্রিশ বছর পরে একটি বিদেশী ভদ্রলোক এসে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে বাংলা নাটক যে অভিনয় করাতে পারলেন, তার মূলে তাঁর নিজের যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরম বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই সত্য যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ওই সময়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রী, বিশেষ করে অভিনেত্রী, সংগ্রহ অসম্ভব হ'ত যদি এ-দেশের লোক নাটক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ থাকত, অথবা অভিনয়-ধারার সঙ্গে পরিচিত না থাকত। লেবেদেফ ইংরেজী নাটক বাংলায় তর্জমা করে তাতে 'বিদ্যাসুন্দর' পালার গান জুড়ে দিয়েছিলেন এই জেনে যে, বাংলায় নাটকের এবং অভিনয়ের ঐতিহ্য আছে। অনেক বাঙালী সে-কথা জানতেন না; জানলেও মানতেন না। লেবেদেফ সেই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষিত বাঙালীর চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলে আমাদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার সঙ্গত কারণ আছে।

লেবেদেফের কাছে বাঙালীর কৃতজ্ঞ থাকবার আরো যে কারণ আছে, গত বছর সোবিয়েতে গিয়ে আমি তা জেনে এসেছি। তিনি বাংলা শুভঙ্করী রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন; আর অনুবাদ করেছেন ভারতচন্দ্রের পুরো বিদ্যাসুন্দরখানা। শুভঙ্করীর পাণ্ডুলিপি নিজের চোখে আমরা দেখে এসেছি লেনিনগ্রাদ ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটে। আর্যাগুলি লেবেদেফের হস্তাক্ষরে বাংলা হরফে লেখা রয়েছে, টীকা রুশ ভাষায়। বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি ছিল মস্কৌতে। সময়াভাবে সেখানি দেখে আসতে পারিনি।

যদিও বলা হয় লেবেদেফের থিয়েটার বাঙালীর উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি, তবুও ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীর উদ্যোগে যে প্রথম বাংলা নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সুপরিচিত হয়ে ওঠে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়-সাফল্যে। আরো দেখা যায় যে, ওই অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকাগুলিতে অভিনেত্রীরাই অবতীর্ণা হন, এবং অভিনয়ে তাঁরাই পুরুষের চেয়ে বেশি নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠা করেন নবীন বসু—এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো রয়েছে, সেই জমিতে।

লেবেদেফের আর নবীন বসুর থিয়েটারের মাঝে যে আটত্রিশ বছরের ব্যবধান, তা কিন্তু বাঙালীর নাট্য-প্রয়াস স্তব্ধ থাকবার নিষ্ক্রিয় যুগ নয়। ওই আটত্রিশ বছর আধুনিক থিয়েটারের উৎপত্তির যুগ। কিন্তু ওই যুগে বাংলা নাটকের কথা কেউ ভাবেন নি। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু থিয়েটারে সেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজারের

নির্বাচিত দৃশ্য, উত্তররাম চরিত, ইংরেজিতে অভিনীত হয়। তারপর স্কুলে-স্কুলে সেক্‌স্‌পীয়ার অভিনয়েরই হিড়িক চলতে থাকে।

নবীন বসুর থিয়েটারের ২৪ বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাহী যুদ্ধের সময়ে, সাতুবাবুর বাড়ীতে পুনরায় বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যশালা গঠিত হয়। নাটকখানি অনুবাদ, তবে ইংরেজির নয়, সংস্কৃতের—নন্দকুমার রায় অনূদিত 'শকুন্তলা'। ওর একমাস পরেই নতুন-বাজার রামজয় বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' অভিনীত হয়। কেউ কেউ বলেন, 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' শকুন্তলার আগে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' মৌলিক বাঙলা নাটক—বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। ওই বছরেই রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নিয়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। 'রত্নাবলী' অনুবাদ নয়, বাংলায় রূপান্তরিত। মাইকেল মধুসূদনকে দিয়ে ওর ইংরিজি অনুবাদ করানো হয়। মাইকেল অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, এবং 'শর্মিষ্ঠা' লিখে দেন। মেট্রোপলিটান থিয়েটারে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয় উমেশচন্দ্র মিত্র লিখিত 'বিধবা বিবাহ'। বাংলা নাটক ক্রমশ সমাজ-সচেতন হয়ে ওঠে। প্রহসন আসে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে রামনারায়ণের "'যেমন কর্ম তেমনি ফল' রূপে। ওঁরই আরো দু'খানি প্রহসনও ওইখানেই অভিনীত হয়, 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কট'। ওই বছরেই শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটিতে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' এবং তার পরের বছরে বাংলা নাটকের প্রথম ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হয়।

গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও 'কৃষ্ণকুমারী' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ওই থিয়েটারের নাটক সংগ্রহ করবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া, এবং নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন—'বহুবিবাহ', 'হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা' এবং 'পল্লীগ্রামে জমিদারদের অত্যাচার'। নাটককে ক্রমশই সমাজ-সচেতন করে তোলবার এই চেষ্টা মনে রাখবার মতো। বহু-

বিবাহ সম্বন্ধে অবশেষে নাটুকে রামনারায়ণই নাটক লেখেন। সেই নাটকের নাম দেওয়া হয়—'নবনাটক'। ওই নাটক আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ওই নাটক রচনা করবার জন্য নাট্যকারকে প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করে অভিনন্দন জানান হয়, এবং একটি রৌপ্যপাত্রে দুইশত টাকা রেখে পাত্রটি নাট্যকারকে সর্বসমক্ষে প্রণামী দেওয়া হয়। কিন্তু জোড়াসাঁকোর সখও স্বল্পস্থায়ী হয়।

সৌখীনরা সখের ঝোঁকে নাট্যান্দোলন করেন, কিন্তু জীবনের সাধনা করে নেন না। সখ কারুর নাটক লেখবার, কারুর অভিনয় করবার, কারুর মঞ্চ তৈরী করবার, কারুর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেবার, কারুর-বা সাহেবদের বাহবা নেবার। বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে এলেন কে? মাইকেল রাজী ছিলেন, কিন্তু বাদ সাধল দারুণ দারিদ্র্য, আর দুরন্ত ব্যাধি।

রাজা-মহারাজারা, মুচ্ছুদ্দি-শেঠরা সখ মিটিযেই একে-একে সরে পড়লেন। বিদ্যোৎসাহীরাও পাশ কাটালেন। কিন্তু নিবৃত্ত হলেন না বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরুণরা। তাঁদের অন্তরে নাট্যানুরাগের যে আগুন ধরে গিয়েছিল, তা আর নিভল না। আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি বলেই তাঁদের সকল প্রয়াসের পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে একেবারে বাগবাজারের এমেচার থিয়েটারের প্রসঙ্গ অবতারণা করছি। এই এমেচার থিয়েটারে কোন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন না—কেরাণী, শিক্ষক, কিছু সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ-সন্তান মিলে এটি গড়ে তুলেছিলেন। এঁদেরই সম্প্রদায়ে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি আধুনিক বাংলা থিয়েটারের স্মরণীয় ও বরণীয় প্রতিষ্ঠাতৃরা; নায়ক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরাই বুঝতে পারলেন শুধু সখ মেটালে চলবে না। সখকে জীবনের সাধনা করে তুলতে না পারলে নাট্যশালাকে কোনমতে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে না। জীবনের সাধনা করতে হলে বৃত্তি হিসেবে ওকে গ্রহণ করতে হবে, এবং কণ্ঠেও নিতে হবে বিশেষ কোন বাণী, যা শোনবার জন্য শ্রোতৃ-সমাবেশ হবে। অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন প্রয়াস সার্থক হবে না, তাও তাঁরা বুঝলেন। তাই তাঁরা স্থির করলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং সেই থিয়েটার থেকেই জীবিকা অর্জন করতে হবে। অমৃতলাল বসু অবশ্য

বলে গেছেন জীবিকা অর্জন নয়, অভিনয়ের ব্যয়-নির্বাহই ছিল টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় দেখাবার মৌলিক কল্পনা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারে যোগদান করেন না। তাঁর কারণ, শোনা যায়, তিনি টিকিট বিক্রয় করে থিয়েটার করতে তেমন আপত্তি করেন না, যেমন আপত্তি করেন ওকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত করতে। তাঁর যুক্তি ছিল, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' যদি সর্বপ্রকার দৈন্য প্রকাশ করে, সমগ্র জাতির পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছু হতে পারে না। কারণ যাই হোক, ন্যাশনাল থিয়েটারে তিনি যোগ দিলেন না। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হোলো চিৎপুরে 'ঘড়িওলা বাড়ী' নামে পরিচিত বাড়িতে। বাড়ির মালিক ছিলেন তখন মধুসূদন সান্যাল। প্রবেশ মূল্য ধার্য হলো আট আনা আর এক টাকা। 'নীলদর্পণ' ওই থিয়েটারের প্রথম নাটক। ওই দলটি যখন সৌখীন অবস্থায় বাগবাজার ড্রামাটিক সোসাইটি নামে পরিচিত ছিলেন, তখনই ওঁরা দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করে নামের সার্থকতা বোঝাবার জন্য প্রথমেই 'লীলাবতীর পুনরভিনয় না করে 'নীলদর্পণ' উদ্বোধনী-অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেন; কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য তখনো অভিনেত্রী নিয়োগ করেন না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলের ( ২৯শে জুন ) ও দীনবন্ধুর ( ১লা নভেম্বর ) মৃত্যু হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারকে নতুন নাটক যোগাবার লোকের অভাব ঘটে। ন্যাশনাল থিয়েটার মাইকেল-দীনবন্ধুর নাটকগুলিরই অভিনয় করেন। তা ছাড়া রামনারায়ণের 'নব-নাটক' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এবং মহাত্মা শিশির-কুমারের 'নয়শো রূপেয়া'ও অভিনয় করেন।

গিরিশ যে শুধু ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদানে বিরতই ছিলেন তা নয়, ওই থিয়েটারের নিন্দা করে স্বনামে ও বেনামিতে সংবাদপত্রে লিখেছিলেনও অনেক কিছু। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, গিরিশচন্দ্রকেও ন্যাশনাল থিয়েটারে অন্তত একবার অভিনয় করতে হয়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করবার উপযুক্ত লোক না পেয়ে থিয়েটার-কমিটি গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। গিরিশ বন্ধুদের নিরাশ করতে পারেন না। তিনি সম্মত হন। কিন্তু

শর্ত থাকে তাঁর নাম প্রকাশ করা হবে না। তাই ভীমসিংহের চরিত্র রূপায়িত করবেন একজন 'Distinguished' Amateur, এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়।

নাট্য-প্রয়াসে ব্রতী হয়ে বাংলার বিদগ্ধরা প্রথমে কেবল ইংরিজি নাটকেরই অভিনয় করতেন। সেটা যখন একেবারে অস্বাভাবিক মনে হোলো, তখন ইংরিজি নাটকের আদর্শে গঠিত বাংলা নাটক অভিনয়ে তাঁরা মন দিলেন। সে-সব নাটক এবং তাঁদের অভিনয় শিক্ষিতের নাট্য-পিপাসা নিবারণ করল। শহরের ধনিক-বিদগ্ধরাই কেবল সেই সব নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেতেন। তাঁদের মন তখন বিদেশী নাটকের সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। তাঁরা ইংরেজ আমলের আগেকার বাংলা নাটকের রূপকে কোন মূল্যই দিতে চাইতেন না। বিদেশী লেবেদেফ যখন বিদেশী নাটকের বাংলা রূপ দিলেন, তখন তিনি কিন্তু বাঙালীর রুচির কথা ভেবে সেই বিদেশী নাটকের তর্জমাতে বিদ্যাসুন্দরের গান সংযোগ করেছিলেন, এবং দেশী বাদ্য-যন্ত্রই ব্যবহার করেছিলেন অর্কেস্ট্রা হিসেবে। একটি শ্রেণীকে সমগ্র জাতি থেকে লেবেদেফ পৃথক করে দেখেন নি। কিন্তু তখনকার দিনের বাঙালী বিদগ্ধরা তা দেখতেন। মাইকেলের মানসিক পরিবর্তন না ঘটলে কেবল রামনারায়ণের চেষ্টাতেই বাংলা নাটক দেশের বিদগ্ধদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে হয়ে উঠত না।

ইংরেজ আমলের আগেকার বাংলা নাটকের নিন্দাবাদ তখনকার সাময়িক পত্রে হামেসাই দেখা যেত। বাংলা নাট্যরীতি থেকে গ্রহণ করবার মতো কিছু যে থাকতে পারে, এ-কথা শিক্ষিতরা চিন্তার বিষয় করে তোলেন নি। ব্যতিক্রম দেখেছি কেবল মাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ধারায়। তিনিই জানিয়েছেন যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা তিনি পেয়েছেন গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে, রাশি রাশি সংস্কৃত ও ইংরিজি নাটক পড়ে নয়! যদিচ তিনি তর্জমা করেছেন বহু সংস্কৃত নাটক এবং কিছু কিছু ইংরিজি নাটক।

বাংলায় সখের থিয়েটার 'প্রোফেশনাল' থিয়েটারে রূপান্তরিত হবার ফলে যখন অর্থের বিনিময়ে সর্বসাধারণ দর্শক হবার অধিকার লাভ করল, তখন আর

# নূতনের আবির্ভাব

বাংলার নাট্যশালা কেবলমাত্র বিদগ্ধ ধনিকদের আনন্দ নিকেতন হয়ে রইল না। বিভিন্ন রুচির ও শ্রেণীর দর্শক পেক্ষাগৃহে সমবেত হতে লাগলেন। নাট্যশালার পরিচালকরা খুব শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলেন যে, 'গ্যালারীর' দর্শকদের মর্ম-বীণে যে সুর বাজে, তারই সংগে সুর বেঁধে দিতে না পারলে তাঁদের নাটক জনপ্রিয় হবে না, এবং নাটক জনপ্রিয় না হলে নাট্যশালা নিজের আয়ের উপর নির্ভর করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, অর্থের জন্য ধনিকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেও পারবে না।

গিরিশ বুঝলেন বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত দর্শকের,—শহুরে দর্শকের এবং পল্লীরও দর্শকের,—ধ্যানে, ধারণায়, রুচিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। শহুরে দর্শকরা যেমন বাস্তবধর্মী হয়েছে, পল্লীর দর্শকরা তেমনটি হয়নি। পল্লীর দর্শকরা সুর চায়, ধ্বনি চায়, 'স্পিরিচুয়াল' অভিব্যক্তি চায়, কল্পনার বিস্তার চায়, গান চায়, নাচ চায়। ভারতের গৌরবময় যুগে ভারতীয় নাট্যরসিকরাও তাই চাইতেন। ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজরা তা চাইতেন না, কিন্তু এলিজাবেদীয় যুগের ইংরেজরা চাইতেন। মাইকেল, দীনবন্ধু, এমনকি রামনারায়ণও এলিজাবেদীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করলেন না। গিরিশ বুঝলেন তাই করতে হবে, কাব্যকে নাটকের বাহন করতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে মাইকেল তখন ছন্দকে মুক্তি দিয়ে নূতন ছন্দ গড়ে গেছেন। কাব্য সৃষ্টিতে তিনি সেই ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নাটক সৃষ্টিতে করেননি। তাঁর অমিত্রাক্ষর মিলটনের অনুসরণে সৃষ্ট, সেকসপীয়ারের অনুসরণে নয়। মাইকেল অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু গিরিশ বুঝলেন মাইকেলকে অনুসরণ করে তাঁর ছন্দে নাটককে রূপ দেওয়া যাবে না। সেক্সপীয়ারের ছন্দকেও বাংলায় রূপ দেওয়া গিরিশ সহজসাধ্য কাজ বলে মনে করলেন না। আর শুধু ত রূপ দিলেই হবে না, ছন্দের আবেদন দিয়ে শ্রোতৃদেরকে আকৃষ্ট করতেও হবে। একটা সিন্‌থিসিসের প্রয়োজন গিরিশ অনুভব করলেন। জন্ম লাভ করল গৈরিশ ছন্দ। অনেক দুরূহ বিষয় ওই ছন্দের সহায়তায় তিনি বর্ণাঢ্য করে তুল্লেন। বাঙালীর অন্তর যে ছন্দে নেচে উঠত তারই অনুরূপ ছন্দ তিনি ব্যবহার করলেন। 'চৈতন্যলীলা' 'নিমাই সন্ন্যাসে'র কথা ছেড়েই দিলাম,

'বিল্বমঙ্গল', 'পাণ্ডব গৌরব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এমন কি 'শংকরাচার্য' পর্যন্ত যে জনপ্রিয় হয়েছিল, তার কারণ ওই সব নাটকের সুরে, ছন্দে ও বিষয়-বস্তুর রূপারোপে বাঙালী দর্শকরা কিছু কিছু পরিচিত বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন। শহুরে দর্শকদেরকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য তাঁদেরই সামাজিক সমস্যাগুলিকে গিরিশ তাঁদেরই কথ্য-ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এমনকি, কাউকে কাউকে এ-অভিযোগও করতে শুনেছি যে, গিরিশ উত্তর কোলকাতাকেই বাংলাদেশ বলে মনে করতেন, এবং উত্তর, কোলকাতার লোকদের কথ্য-ভাষাকেই বাংলা ভাষা বলে ভাবতেন। 'প্রফুল্ল' 'বলিদান', 'শান্তি কি শান্তি' ? প্রভৃতি নাটকে সত্যই উত্তর কোলকাতার অনেক কথ্য-ভাষার প্রয়োগ পাওয়া যায়, এবং বিশেষ কতকগুলি সামাজিক রীতিরও অবতারণা দেখা যায়। কিন্তু তাকে ত কোন মতে গিরিশের দোষ বলা যায় না, গুণই বলতে হয়। 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' প্রভৃতি মফঃস্বলে 'চৈতন্যলীলা' 'নিমাই সন্ন্যাসের' চেয়ে কম অভিনীত হয়নি। এক কথায় বলা যায়, গিরিশ নাটকের সাহায্যে, নাট্যশালার সাহায্যে শহরের আর মফঃস্বলের, শিক্ষিতের আর অশিক্ষিতের, ব্যবধানে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন।

গিরিশের সেই কাজের প্রকৃত মূল্য আজও নিরূপিত হয়নি। হয় নি যে, তা বোঝা যায় আজকার প্রোফেশনাল নাট্যশালার আর সৌখীন, প্রগতিশীল, নাট্যসম্প্রদায়গুলির অধিকাংশ প্রয়াসে সম্পূর্ণ পৃথক রকমের নাট্যরূপ-পরিকল্পনা থেকে। আজ নাট্যরসিক বলতে একদল কেবল শিক্ষিত শহুরেদেরকেই কল্পনা করেন, এবং অপর দল বোঝেন কেবলমাত্র কৃষক-শ্রমিকদেরকে আর নব-সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদেরকে। গিরিশ দর্শকদেরকে সমাজ-সচেতন করতে চেয়েছিলেন, আর আধুনিক প্রগতিশীলরা চাইছেন দর্শকদেরকে শ্রেণী-সচেতন করতে। গিরিশ বুঝেছিলেন সমাজের সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের নর-নারী নাট্যশালায় সমবেত হয় যদি, তাহলেই সাংস্কৃতিক ঐক্য যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমন সুদৃঢ় হবে নাট্যশালারও ভিত্তি।

ন্যাশনাল থিয়েটার স্থায়ী হয় না। নাটকের অভাবে অথবা অভিনয়ের দোষে, কি জনপ্রিয়তা হারিয়ে, তা বিলুপ্ত হয় না—শুধু ভেঙে যায়। মত-

বিরোধ এবং হিসাব-পত্রের গোলযোগের দরুণ অপ্রিয় পরিস্থিতির ফলেই ভেঙে যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে যায়, গড়ে ওঠে ব্যবসায়ী থিয়েটার। ধনিকরা এগিয়ে আসেন থিয়েটারের ব্যবসা করতে। তারও সব বিবরণ এখানে না শুনিয়ে গিরিশচন্দ্রের সূত্র ধরেই আমি আমার বক্তব্য বলে যাব। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান না করলেও তাঁকেই কেন বাংলা নাট্যশালার জনক, Father of the Bengali Stage বলা হয়, এ-কথাটি পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। সত্যই গিরিশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের শিকড় বাংলার মাটিতে প্রবিষ্ট হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে 'আর্টিষ্টস্ থিয়েটার' রূপে প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থকাম হয়। গিরিশ ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান না করলেও মনে-মনে যে আর্টিষ্টস্ থিয়েটার কামনা করতেন, তা অনুমান করবার কারণ আছে। ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে যাবার পর ধনিকরা থিয়েটার করতে এগিয়ে আসেন, নিশ্চিতই ব্যবসা হিসেবে কিছুটা লাভবান হবার লোভে। নিছক ক্যাপিটালিষ্ট বুঝতে আজ আমরা যা বুঝি, তখনকার সকল ধনিক তা ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন। বাংলার জমিদারদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমতা ছিল, আর্টের প্রতি কম-বেশী অনুরাগও ছিল। তাঁরা তাই কীর্তিমান অভিনেতৃদেরকে, শক্তিমান নাট্যকারদেরকে আহ্বান করে নিয়েছিলেন তাঁদের থিয়েটারগুলিতে। যদিচ মনিব-ভৃত্য সম্পর্ক স্থাপন করবার অভিসন্ধি তাঁদের অন্তরের নিভৃত-কোণে নিশ্চিতই কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থান করছিল, তবুও তাঁরা অভিনেতৃদের ওপর এবং নাট্যকারদের ওপর তাঁদের থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন ; ম্যানেজার রূপে তাঁদেরকেই নিযুক্ত করে।

কিন্তু যাঁরা নিজেরা একটা আদর্শ নিয়ে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁরা শুধু ওইটুকুতেই খুসি থাকবেন কেন? মালিকদের সঙ্গে কর্মীদের নানা সংঘাত ঘটতে লাগল। কাজেই একটা আর্টিষ্টস্ থিয়েটার গড়বার কল্পনা তখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদের অনেকেরই মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। কিন্তু নির্ধন আর্টিষ্টরা কেমন করে নিজেদের থিয়েটার গড়ে তুলবেন? সুযোগের

অপেক্ষায় তাঁরা অন্তরের কামনা অন্তরেই চাপা রেখে বিচ্ছিন্নভাবে ধনিকদের বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করতে লাগলেন। সুযোগ অবশেষে এককালে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই উপস্থিত হ'ল।

ধর্মদাস সুর ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থানুকূল্যে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার যে জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই জমিতেই 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' গড়ে তুল্লেন। এইটি কিন্তু দ্বিতীয় নাট্যশালা যা নিজস্ব বাড়ী করে থিয়েটার করতে নামল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ওরই মাত্র একমাস আগে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নিজের বাড়ীতে আত্ম-প্রকাশ করে। তার মালিক ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। তিনি শক্তিমান অভিনেতাও ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে নাট্য বিষয়ক পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি অভিনেত্রীদের দিয়ে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করাবার সঙ্কল্প করলেন বলে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্রব বর্জন করলেন। শরৎবাবুর 'বেঙ্গল থিয়েটার' নবীন বসুর থিয়েটারের পরে সর্বপ্রথম অভিনেত্রী আমদানি করেন, লেবেদেফের প্রয়াসের আটাত্তর বছর এবং নবীন বসুর প্রয়াসের চল্লিশ বছর পরে। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রথমে অভিনেত্রী বর্জন করেই চলেন, কিন্তু পরে অভিনেত্রী গ্রহণ করেন।

## ( ৩ )

## অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন

এই গ্রেট 'ন্যাশনাল থিয়েটার', 'গজানন্দ' এবং তারই পরিবর্তিত নাম 'হনুমান চরিত' প্রহসন অভিনয় করে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। পুলিশ 'হনুমান চরিত' বন্ধ করে দেয়। গ্রেট ন্যাশনাল 'কর্ণাটকুমার' খুল্লেন। তাও বন্ধ করে দেওয়া হোলো। তারপর 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল ছিল বলে অভিযুক্ত হওয়ায় যখন 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে অভিনীত হয়, তখন অভিনয়কালেই পুলিশ থিয়েটারে হানা দিয়ে নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, বেল বাবু প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এদের সকলকেই অপরাধী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের আদেশ

দেন। হাইকোর্টের আপীলে তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। সমগ্র হাইকোর্ট-বার তাঁদের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, অর্থাৎ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরাজয় সরকার সইতে পারলেন না। বাংলার নাট্যশালাকে শাসন করবার জন্য সরকার তখন আইন-সচিব হবহাউসকে দিয়ে এক আইনের খসড়া তখনকার আইন পরিষদে পেশ করলেন, এবং গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন সেই খসড়াকে আইনে পরিণত করলেন। এই আইনের নাম হলো 'দি ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস য়্যাক্ট অব এইটিন সেভেনটি সিক্স'। সমগ্র ভারতবর্ষকে এই আইনের আওতায় ফেলা হোলো।

এই আইন চালু করে সরকার পুলিশকে এমন ক্ষমতা দিলেন যে, পুলিশ আপত্তিজনক মনে করলে যে-কোন নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে পারবে, এবং সেই অভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল লোককে গ্রেপ্তারও করতে পারবে, মায় যে-বাড়ীতে অভিনয় হবে তার মালিককেও। বলা বাহুল্য 'সিদিশন আইন', জাতিবিদ্বেষ-প্রচার-নিবারণী আইন, অশ্লীলতা নিরোধক আইন চালু থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত এই আইনটি চালু করা হলো নাট্য-শালাকে বিশেষ করে শাসন করবার জন্য। যুক্তি দেওয়া হোলো, নাট্যশালা যাতে না অশ্লীল নাটক অভিনয় করে সমাজের ক্ষতি করতে পারে, তারই জন্য এই আইনের প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ, সাহিত্যে শ্লীলতা আর অশ্লীলতার সীমা-রেখা ঠিক করে দেবার অধিকারী করা হলো বিদেশী পুলিশ কমিশনারকে।

কিন্তু সত্যিই কি তখনকার নাট্যশালা অশ্লীল নাটক পরিবেশন করত? নিশ্চিতই নয়। মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহাত্মা শিশির প্রকাশন, ঘোষ প্রভৃতি যাঁরাই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে নাটক লিখেছিলেন. নাট করে সকলেই স্বদেশের কল্যাণকামী ছিলেন। সমাজের ক্ষতি হতে পারে কাজ তাঁরা করতে পারেন সন্দেহ করাও পাপ। অশ্লীল এই য়েছে; তবুও অজুহাত। আসল উদ্দেশ্য দেশাত্মবোধ জাগরণ রোধ কহয়ে উঠে ওটা সুযুক্তি সধবার একাদশীকেও, অশ্লীলতা প্রচারের অপরাধে অ হয়েছিলেন সব দেশ

সিডিশান আইনের আওতায় ফেলা গেল না বলে। 'গজানন্দ' ও 'হনুমান চরিত' সম্বন্ধে সরকারের আপত্তির কারণ সস্ত্রীক প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে, পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড নামে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সম্রাট হন, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুরস্ত্রী এবং আত্মীয়াদের দিয়ে হিন্দু-প্রথামত বরণ করার প্রতিবাদ করা হয়েছিল ব'লে। সারা দেশ তাঁর ওই কাজটিকে ভাল চোখে দেখেনি। কবি হেমচন্দ্রও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আতিশয্যের নিন্দা করে একটি তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছিলেন, যা প্রচুর জনাভিনন্দন লাভ করেছিল। তিনি কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'বাজিমাৎ'। তার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভালো বটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয় গোবরে শালুক ফুটে ॥
'ফিক্রু' দানে এ তাড়াতে, কল্লে বাজিমাৎ।
গাছ, কাতুরে ভেকো হলে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ॥

*　　*　　*　　*

হেদে ও সহরবাসী, আর কি হাসি হাসবে রেড়ো বলে।
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥

*　　*　　*　　*

আর কেন লো, ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো।
'লাইট' পেয়ে 'রাইট' হয়ে পার হও লো সাঁকো ॥
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায় কাল বদনখানি।
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কজ্জা খুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের দুল।
দেখবে কণ্ঠী, কণ্ঠহার, পিঠের চাঁপাফুল ॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ।
...র বিয়া নয় ত ইহা ? ধরবে নাকো সাপ ॥
এস বড়ঠাকরুণ সাত পোয়াতির মা।
...ন তোমার তিনি তাও কি জান না ?

দেশের লোক বিদেশী রাজদম্পতিকে ও-ভাবে কুল-বধূদের দিয়ে হিন্দুদের ভ কর্মে অনুসৃত 'বরণ' দ্বারা অভ্যর্থনা অনুমোদন করেন না। কিন্তু ার মাঝে সরকারের পরিচালকরা এবং স্তাবকরা রাজদ্রোহের গন্ধ পান, বং জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ-বাণ আসলে ভবিষ্য রাজ-দম্পতির বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে করেন। কিন্তু যে-হেতু আইনত তা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না, সেই হেতু বে-আইনি আইনকে তাঁরা নাট্যশালা শাসনের অস্ত্র করে রাখলেন।

সরকারের দ্বিতীয় আপত্তির কারণ এই যে, তখন দেশের অনেক স্থানে বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা ভারতীয় নারীর লাঞ্ছনা ও মানহানি ঘটত। কোন কোন নাটকে তারও রূপ দেওয়া হোতো। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ছিল সেই রকমই একখানি নাটক। হাইকোর্টে কিন্তু প্রমাণ করা গেল না যে, সেখানি অশ্লীল নাটক। পরন্তু প্রকাশ পেল যে, পুলিশ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চার্জ-শীট তৈরি করেছে। হাইকোর্টের সমগ্র ভারতীয় উকিল ব্যারিষ্টারেরা, এমন কি কংগ্রেসের নেতারাও, নাট্যশালার পক্ষ অবলম্বন করলেন বলে সরকার মনে করলেন প্রকাশ্য বিচারালয়ে মামলা তোলবার সুযোগ দূর না করলে নাট্যশালাকে শাসন করা সহজ হবে না। তাই পুলিশ-কমিশনারকে নাট্যশালার ভাগ্য-বিধাতা করে দেওয়া হোলো। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, আজকার স্বাধীন ভারতেও এই বে-আইনি আইন চালু রয়েছে।

তখনকার দিনে এই আইন চালু করবার কারণ আর যাই হোক, এই আইন এই কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলার নাটক ও নাট্যশালা রূপ পরিগ্রহ করবার সময় থেকেই সমাজ-সচেতন হয়ে উঠে নাটকের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছিল ; অর্থাৎ সমাজকে, সমাজের লোকের আশা আকাঙ্ক্ষাকে, দোষগুণকে, প্রকা ন, করা স্বধর্ম বলে গ্রহণ করেছিল ; কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের জন্যই নাটা করে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। তা হচ্ছে এই য়েছে ; তবুও ইংরাজ শাসকরাই যে নাটককে শাসন করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে ওটা সুযুক্তি নয়—দেশের লোকেরাও নাটককে শাসন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন সব দেশ

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর বেলগাছিয়া নাট্যশালা অবলুপ্ত হয়। তার পর শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা', নাটক নিয়ে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম অভিনয় হয়। মাইকেল যেচে এই নাট্যশালার জন্য নাটক লিখতে যাননি, তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এই নাট্যশালার জন্য নাটক লিখতে। কিন্তু যাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাই তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় বন্ধ করে দিলেন কেন, সে কথা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় রয়েছে। তা এই :—

A few of the Young Bengal class getting a scent of the farce, and feeling that a caricuture made it touch them too closely, raised a hue and cry; and choosing for their leader a gentleman of position and influence who, they knew, had influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the board of their Theatre. This gentleman (also a Young Bengal) fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce.

কেশবচন্দ্র বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। তাঁকে তখন বাংলার গ্যারিক বলা হোতো। মাইকেল কৃষ্ণকুমারী নাটকখানি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মনের ভাব এই ভাষায় প্রকাশ করে :—

"আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নটকুল শিরোমণি; ইহার দোষগুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষতঃ আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি এ অধীনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।"

মাইকেল স্বভাবতই এমন বিনয়ী ছিলেন না। কিন্তু তিনি যাঁর গুণে মুগ্ধ হতেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ Young Bengal ছিলেন মাইকেল

নিজে। তিনি লিখলেন—'একেই কি বলে সভ্যতা ?'—আর তার পরবর্তী Young Bengal-রা তারই অভিনয় বন্ধ করে দেবার জন্য আদা-জল খেয়ে যে লেগে গেলেন, তাই মনে রাখবার মতো কথা। মাইকেল তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ছিলেন Progressive। তাঁর পরবর্তী Young Benga-রা না ছিলেন revolutionary, না ছিলেন progressive; ভেসে বেড়ানোই হয়ে উঠেছিল তাঁদের স্বভাব। কাজেই একেই কি বলে সভ্যতায় তাঁরা তাঁদের নিজেদের অসার মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে ক্ষেপে গেলেন, এবং মাইকেলকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলতে লজ্জা পেলেন না। বঙ্কিম কিন্তু এই নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করে গেছেন :—

"Is this civilization ?"is the best in the language.

'একেই কি বলে সভ্যতা ?'র মতো 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের অভিনয়ও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তা করেন পাইকপাড়ার রাজারা, যাঁরা দু'খানি প্রহসনই মুদ্রণের ব্যয় বহন করেছিলেন। দুখানিই লেখা হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বন্ধ করে দেবার পর আবার প্রহসন লিখতে অনুরোধ করায় মাইকেল জানিয়েছিলেন :—

"Mind, you broke my wings about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali, and write books in Hebrew or Chinese."

নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া, সরকারের দ্বারাই হোক আর স্বজনের দ্বারাই হোক, শুধু বাক-স্বাধীনতা হরণ করাই নয়, লেখকের আত্মসম্মান-বোধেও আঘাত হানা। অনেক লেখক এই আঘাত নিজেদের উপর আহ্বান করে আনতে চান না বলে নাটক লিখতে এগিয়ে আসেন না। যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের অনুভূতি সূক্ষ্ম, তাঁরাও নাটককে এমন রূপ দেন, যাতে করে বাস্তব-জীবন প্রতিফলিত না হয়। দুইটিই নাট্যসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর।

বলা হয়ে থাকে, সকল দেশেই নাটক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে; তবুও সকল দেশেই যখন নাট্যসৃষ্টি হয়েছে, ভারতেই বা কেন হবে না ? ওটা সুযুক্তি নয়। নাটক না হবার হাজারো কারণ থাকতে পারে। সব কারণ সব দেশে

সব সময়ে দূর করতে পারে না। কিন্তু আইনের বাধা যখন ইচ্ছে করলেই সরিয়ে দেওয়া যায়, তখন তা সরিয়ে দেওয়া হবে না কেন? কে বলতে পারে এই আইন না থাকলে রবীন্দ্রনাথের বা বার্ণার্ড শ'র নাটক কি রূপ ধরে প্রকাশ পেত? কে বলতে পারে বাংলা নাটক কতটা দোষমুক্ত হতে পারত? সব সময়ে সব দেশের সব লেখক প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন না, বে-আইনি আইনও মেনে চলেন, আইনকে ফাঁকি দিতেও চান, আইনকে এড়িয়েও অগ্রসর হতে চান। ফলে নাটক দুর্বলও হয়, দোষযুক্তও হয়। শ' প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুলে-ছিলেন, আবার মেনেও নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন। মলেয়ার মেনে নিয়েও লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, জয়ীও হয়েছিলেন; কিন্তু চার্চের অভিসম্পাত, অনন্ত নরক বাস, তাঁর পারলৌকিক সদ্‌গতির বাদ সেধেছিল। তিনি যা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন, তাঁর সমসাময়িক নাট্যকাররা তা পারেন নি। ফরাসী নাটক ও নাট্যশালা বহুকাল ইউরোপের নাট্য-প্রয়াসের নায়কত্ব করেছে। কিন্তু সেই নায়কত্ব অর্জন করবার জন্য ফরাসী জাতিকে আটশ' বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। রাষ্ট্রের বয়সে আটশ' বছর পূর্ণ হলে কর্ণেইল, মলেয়ার, রেসিন একই কালে উদিত হয়ে ফ্রান্সকে ধন্য করেন।

## (৪)

## গ্রেট ন্যাশনাল, ষ্টার ও এমারেল্ড

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' কার্যত শিল্পীদের থিয়েটার হলেও আসলে একটি ব্যক্তিরই মালিকানা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী অবশ্য শিল্পী-বান্ধবই ছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থাভাব ঘটতেই 'গ্রেট ন্যাশনাল' হস্তান্তরিত হয়। প্রতাপ জহুরী নামক জনৈক ধনিক মাড়োয়ারী ওটি কিনে নেন। এই প্রতাপ জহুরীই গিরিশচন্দ্রকে সওদাগরি অফিসের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনেন। গিরিশ এই সময় থেকে তাঁর প্রতিভা নিয়ে নাট্যশালার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

তারপরই প্রতিষ্ঠিত হোলো বিডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটার, পরবর্তীকালে যেখানে

ছিল কোহিনুর ও মনোমোহন। এখন সেই জমির উপর দিয়ে চলে গেছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। সেই জমির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্র, আর থিয়েটারের মালিক হলেন গুরুমুখ রায় নামক জনৈক পাঞ্জাবী, যিনি এসেছিলেন নাট্যশালার প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য নয়, নাট্যশালার জনৈকা অভিনেত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে। কাজেই অর্থের অভাব না ঘটলেও তাঁর সখ বেশিদিন রইল না। তিনি সরে পড়লেন। তখন গিরিশ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসু নিয়োগী, হরি বসু প্রভৃতির ওপরই থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল। গিরিশ নাট্যশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ওঁদেরকে মালিকানা স্বত্বের অধিকারী করে দিলেন, অবশ্য গুরুমুখ রায়েরই সম্মতিক্রমে। ওঁরা ত মালিক হলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? বাড়িটি বাঁধা দিয়ে চৌদ্দ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হোলো। গিরিশ নাটক দিলেন 'কমলে কামিনী', নিজে অভিনয়ও করলেন। চালু হোলো থিয়েটার। পরের বছর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্য-লীলা' নাটক খোলা হোলো। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালারও বরাত খুলে গেল। নাটক শুধু যে অসাধারণ রকমে জনপ্রিয় হয়ে উঠল তাই-ই নয়, নাট্যশালা ও নট-নটিরা ধন্য হয়ে গেল ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পায়ের ধুলো আর আশীর্বাদ পেয়ে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলার নাট্যশালা যেমন সম্প্রদায় নিরপেক্ষ বিদগ্ধদের সমর্থন পেয়ে এসেছে, তেমন বাধাও পেয়েছে হিন্দু ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের নানা গোঁড়া লোকদের প্রতিকূল আচরণ থেকে। অভিনেত্রীদের আবির্ভাব হতে অনেক প্রকৃত হিতৈষীও নাট্যশালার সংস্রব বর্জন করেছিলেন, যেমন করেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। কিন্তু পরমহংস দেবের আশীর্বাদ লাভের পর নাট্যশালা অপরাজেয় হয়ে উঠল। বিরূপ সমালোচনা যদিও শুরু হলো না, তবুও অমৃত সিঞ্চনের লোকেরও অভাব ঘটল না।

কিন্তু সৌভাগ্য ও সাফল্য সত্ত্বেও বিডন ষ্ট্রীটে শিল্পিদের প্রতিষ্ঠিত 'ষ্টার' তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় করে রাখতে পারল না। সৌভাগ্য ও সাফল্যই হোলো তার কাল। কোলকাতার তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী, জমিদার ও ব্যবসায়ী, গোপাললাল শীল থিয়েটারের ব্যবসা করবেন স্থির করলেন, এবং ষ্টার থিয়েটার

যে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই জমিটি কিনে নিলেন। যারা কোলকাতার গোপাললাল শীলের নিজস্ব জমির কিছু অভাব ছিল না। তবুও ষ্টার থিয়েটার যে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই জমি তিনি যে কিনে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন, তার কারণ, তিনি ফলন্ত বৃক্ষসহ বাগানের মালিক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ষ্টার থিয়েটারের শিল্পি-মালিকরা আত্ম-বিক্রয় কোন মতেই গৌরবজনক মনে করলেন না, গোপাললাল শীলের মত প্রখ্যাত ব্যক্তির কাছেও না। গোপাললাল শীল উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলেন। গিরিশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু জমি বিক্রয় রহিত করতে পারলেন না। ষ্টার থিয়েটারের অপর একজন পাওনাদারও সময় বুঝে প্রাপ্য টাকার জন্য নালিশ করলেন। গোপাললাল ষ্টার থিয়েটারের বাড়িটির বাবদ ত্রিশ হাজার টাকা দাম দিলেন। মালিকরা পাওনাদারের ডিক্রী মেটাতে বাধ্য হয়ে বাড়ি বিক্রয় করলেন। গিরিশ চন্দ্র অনেক চেষ্টা করে ষ্টার থিয়েটারের নামটির ওপর গৃহহারা মালিকদের স্থাপন করে দিলেন।

গোপাললাল বিডন ষ্ট্রীটের সেই ষ্টার থিয়েটারের বাড়িতেই নূতন করে থিয়েটার খুল্লেন। তার নাম দিলেন 'এমারেল্ড্ থিয়েটার।' কিন্তু 'এমারেল্ড্ থিয়েটার' উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠলো না। গোপাললাল গিরিশচন্দ্রকে আহ্বান করলেন তাঁর থিয়েটারের ভার নিতে। সহকর্মিদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবেই গিরিশ তাতে রাজী হলেন না। গোপাললাল ঠিক করলেন যে, টাকা দিয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকেও কিনে নেবেন। প্রতাপ জহুরী গিরিশচন্দ্রের অফিসের বেতন ১০০৲ টাকার যায়গায় ১৫০৲ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে সওদাগরী অফিসের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন, আর তিনিই কি পারবেন না গৃহহীন ভ্রাম্যমাণ ষ্টার থিয়েটার থেকে গিরিশচন্দ্রকে ছিনিয়ে আনতে? তাঁর ত টাকার অভাব নেই!

তিনি জানালেন, গিরিশকে তিনি মাসিক ৩৫০৲ টাকা পারিশ্রমিক দেবেন, আর অগ্রিম বোনাস দেবেন নগদ ২০,০০০৲ টাকা। বন্ধুরা গিরিশকে বল্লেন এই স্বার্থ যেন না তিনি হেলায় ত্যাগ করেন। তিনি যে তাঁর স্বার্থ আর বাংলার নাট্যশালার স্বার্থকে অভিন্ন মনে করতেন, একথা তখনো তাঁর সতীর্থরা এবং

শিষ্যরা বোঝেন নি। কাউকে তিনি বলেনও নি ও-কথা। তিনি বন্ধুদের মত জানবার পর গোপাললালের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

ষ্টার থিয়েটারের মালিক যাঁদেরকে তিনি করে দিয়েছিলেন, তাঁরা তখন হাতীবাগানে একটা জমির সন্ধান পেয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য মফঃস্বলে অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। গিরিশ গোপাললাল প্রদত্ত কুড়ি হাজার টাকা বোনাস থেকে ১৬,০০০৲ টাকা গৃহহারা ষ্টার থিয়েটারের মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন—"এই টাকা নিয়ে তোমরা হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটারের নিজস্ব বাড়ী গড়ে তোল। তোমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে না, যদি তোমরা নাট্যশিল্পের ও নাট্যশিল্পিদের মর্যাদা রক্ষা করে চল।" চার বছর আগে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যাঁরা 'চৈতন্য লীলা' অভিনয় দেখিয়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তাঁরাই আবার চার বছর পরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নূতন করে যাত্রা শুরু করলেন। শিল্পিরা গিরিশের এই অনুপম অবদানে এমনই প্রেরণা পেলেন যে, নিজেরাই শ্রমিকের মতো কাজ করে ব্যয়-লাঘবে সহায়তা করলেন, মায় অভিনেত্রী বিনোদিনী পর্যন্ত। প্রাক্তন বাড়ী বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে পাওনাদারের ডিক্রি পরিশোধ করে মালিকদের হাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। তাই দিয়ে, আর গিরিশচন্দ্রের প্রদত্ত টাকা দিয়ে, বর্তমান ষ্টার থিয়েটার গৃহটি নির্মিত হয়। এই ষ্টার থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নসীরাম'ও গিরিশই রচনা করে দেন। তাঁর নাম তখন গোপন রাখা হয়, যে-হেতু গোপাললাল শীলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল যে, তিনি অপর থিয়েটারে নাটক দিতে পারবেন না। বিশ হাজার টাকা বোনাস তাঁকে সেইজন্যই দেওয়া হয়। ষ্টার থিয়েটার শিল্পিদেরই থিয়েটার হোলো, কিন্তু বাড়ির মালিক রইলেন প্রাক্তন ষ্টার থিয়েটারেরই মালিকরা—অর্থাৎ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসু নিয়োগী এবং হরি বসু এবং তাঁদের ওয়ারিশরা। কিন্তু আজ আর তা নেই। আজ বাড়ীটিও অপরের দখলে চলে গেছে।

গিরিশচন্দ্র যদি তাঁর বোনাসের টাকা থেকে ষোল হাজার টাকা তাঁর সতীর্থ-শিষ্যদের হাতে তুলে না দিতেন, এবং বেনামীতে নাটক লিখে না দিতেন, তাহলে ষ্টার থিয়েটারের মালিকরা বাড়ী করবার সুযোগ পেতেন

কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করবার সঙ্গত কারণ আছে। গিরিশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাট্যশালার কাছে সদ্ব্যবহার পাননি। সে কথাও এখানে বলব না। তিনি ক্রমে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। অনেক বিষ তাঁকে কণ্ঠে রাখতে হয়েছিল। তাঁর দানের কথাই আলোচনা করি।

## (৮)

## নাটক ও নেশন

গিরিশের সমর্থনে ও অর্থানুকুল্যে শিল্পিদের থিয়েটারও হোলো, ধনিকের থিয়েটারে তাঁদের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ রইল। বাংলার প্রোফেশনাল থিয়েটারে এই ঐতিহ্যই প্রতিষ্ঠা পেল যে নাট্যকাররা আর অভিনেতৃরা ভৃত্য নন; তাঁরা নাট্যশালার হিতসাধনে মালিকদের সহযোগী বান্ধব। বাংলায় নাটক নিয়ে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তা প্রধানতঃ নাট্যকারদের আর অভিনেতৃদের আগ্রহেই অনুষ্ঠিত হয়েছে; সকল মালিক তাঁদের উপেক্ষা করে কেবল নিজেদের খেয়াল খুসি মতো কাজ করেন নি। অধিকাংশ থিয়েটারেই নট-নাট্যকাররাই থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। গিরিশ-অমৃতলালের আবির্ভাব না হলে এই ঐতিহ্য গড়ে উঠত না। আজ এই ঐতিহ্য অগ্রাহ্য হচ্ছে। কেন, তা পরে বলব। আগে গিরিশের আরো, এবং প্রধানতম অবদানের কথা বলে নি। বলে নি, কেন গিরিশকে বাংলার জাতীয় নাট্যশালার জনক বলা হয়।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল, তা যদিচ পল্লী-সন্তানদের নিয়েই গঠিত, তবুও পল্লীর সেই-সব সন্তান আচারে-ব্যবহারে-রুচিতে শহুরে হয়েই উঠলেন। শহরগুলি ক্রমশই সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য বরাবরই রাজধানীগুলিতেই সাংস্কৃতিক চর্চা তুলনায় বেশী হোতো। তবুও প্রাক্-বৃটিশ আমলে বাংলার বহু পল্লী সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। টোল-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-ছাত্ররা, শাস্ত্রবিদ পুরোহিতরা,

চিকিৎসকরা, শহরে এসে জড়ো হতেন না। সকল বুদ্ধিজীবী পল্লী ত্যাগ করে চলে আসতেন না। তার সুফল ছিল এই যে, তাঁদের সংস্পর্শ পেয়ে পল্লীর নিরক্ষর লোকেরা অল্প-বিস্তর 'ইনটেলেকচুয়াল' ও 'স্পিরিচুয়াল' দৃষ্টির অধিকারী হতে পারত, জাতির জীবন-প্রবাহের দুই কূলে উপলখণ্ডের মতো পড়ে থাকত না।

ইংরেজ যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা চালু করল, যে সাংস্কৃতিক বনিয়াদ গড়তে চাইল, তা শহরের লোকদেরকে পল্লী থেকে একেবারে সরিয়ে আনল। জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রয়াসে পল্লীর দান একেবারে অগ্রাহ্য করা হোলো। এই সর্বনাশা রাষ্ট্র-সমাজের ব্যবস্থার দিকে মহাত্মা গান্ধী দেশনায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার অল্পকাল পরেই। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজের শাসন আর শোষণ দেশের অবস্থা এত শোচনীয় করতে পারত না, যদি না অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে সে এমন রূপ দিত, যার জন্য পল্লীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম তরুণ-তরুণীরা পল্লীর কোল ছেড়ে চলে আসতে প্রলুব্ধ হোতো। মহাত্মা এ কথা বলেছিলেন গিরিশের আবির্ভাবের অনেক পরে। গিরিশ কোনদিন ওকথা ভেবেছেন কি না তা জানি না। রামমোহন ভেবেছিলেন, বঙ্কিম ভেবেছিলেন, দীনবন্ধু ভেবেছিলেন, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক গিরিশ ঘোষ, খ্রীষ্টান লালবিহারী দে, পরম হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার বহু মনীষী ও-কথা ভেবেছিলেন।

নট-নাট্যকার গিরিশ ও-কথা ভাবুন আর না-ই ভাবুন, নাট্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে বুঝেছিলেন শহরের সংগে পল্লীর সাংস্কৃতিক যোগ যদি না নাটকের মাধ্যমে স্থাপন করা যায়, তাহলে নাটক আর নাট্যশালা প্রকৃত জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠবে না। এ-কথা তিনি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন নি, নাটকের ও নাট্যশালার রূপারোপ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কারণেই তাঁর নাটকের রূপ এবং বিষয়-বস্তু মাইকেল আর দীনবন্ধুর নাটকের রূপ ও বিষয়-বস্তু থেকে পৃথক রকমের হয়েছে।

অনেককে বলতে শুনেছি যে, মাইকেল, দীনবন্ধু, বাংলা নাটককে যে উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছিলেন, গিরিশ নাটককে সে পর্দায় রাখতে

পারেন নি; নামিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা বাংলার কথা, বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কথা, বাংলার সংস্কৃতির কথা, ঐতিহ্যের কথা না ভেবে সর্বদাই ইংরিজি নাটকের সংগে বাংলা নাটকের তুলনা করে বাংলা নাটকের মান নির্ণয় করেন, তাঁরাই ও-কথা বলে থাকেন। ঠিক এই রকম বঙ্কিমের উপন্যাসকেও স্কটের উপন্যাসের সংগে তুলনা করে অনেক বিজ্ঞ সমালোচক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিম স্কটের চেয়ে কম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিম বিষয়ক প্রবন্ধ-অষ্টকে বুঝিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিমের উপন্যাস স্কটের উপন্যাসের চেয়ে কোন অংশে কম মূল্যবান নয়। স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশের বিল্বমঙ্গল পড়ে বলেছিলেন, গিরিশ সেক্সপিয়ারকেও অতিক্রম করেছেন ওই নাটকখানিতে। কি কারণে বাংলার ঐ দুটি ঋষিকল্প মহাপুরুষ ও-কথা বলেছিলেন? শুধু কি তাঁরা দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই? নিশ্চিতই নয়। তবে? তাঁরা বাংলা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার উপন্যাস, বাংলার নাটক, বিচার করে দেখেছিলেন বলেই ওই মন্তব্য করেছিলেন।

গিরিশ এলিজাবেদীয় যুগ থেকে ভিক্টোরিয়া যুগ পর্যন্ত ইংরিজি নাট্যশালার সকল প্রয়াসের সংগে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু নকলনবিশীতে প্রবৃত্ত হন নি। যা হোক্ করে তিনি নাটক লিখে নাট্যশালা চালাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন নাটককে এবং নাট্যশালাকে প্রকৃতই 'ন্যাশনাল' করে গড়ে তুলতে। তাঁর নাট্যসাহিত্যে ইংরিজি-নাট্যসাহিত্যের প্রভাবের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই দেখা যায় জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াস।

প্রাচীন যাত্রাকে তিনি অবহেলা করেন নি। মানুষের রূপান্তরের ভিতর দিয়ে পরম পরিণতির ইংগিতকেও তিনি নাটকের লক্ষ্য করে নিয়েছেন। পারিপার্শ্বিকের সংগে ব্যক্তির সংঘাতে ব্যক্তি যে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারে বিশেষ একটা অধ্যাত্ম-স্তরে উঠতে পারলে, তাও যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন ব্যক্তি সেই স্তরে উঠতে না পারলে তার ভেংগে পড়া অনিবার্য। পৌরাণিক এবং সামাজিক নানা নাটকে নানা চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি

তা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জন আছে এ-কথা হয়ত একেবারে মিথ্যে নয়, কিন্তু ভাষায়, চিত্রণে, কাব্যে, আদর্শে, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং রস-সৃষ্টিতে তাঁর বহু নাটক যে সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এ-কথা মিথ্যেও নয়, অত্যুক্তিও নয়।

## ( ৬ )

## থিয়েটার ও যাত্রা

প্রাচীন যাত্রা থেকে বর্তমান থিয়েটার ক্রমবিকাশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, একথা সত্য। আবার এ-কথাও সত্য যে, লেবেদেফের মতো গিরিশও বাইরের আমদানি নাটককে স্বদেশী করে নিয়েছিলেন তাতে শুধু নাচ-গান সমন্বয় করেই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শও ফুটিয়ে তুলে। গিরিশ যেমন প্রাচীন যাত্রার সারবস্তু নিয়েছিলেন, তেমন সমসাময়িক যাত্রাও থিয়েটার থেকে গ্রহণ করেছিল অনেক নূতন বস্তু। আবার থিয়েটারও সঞ্জীবিত করে তুলেছিল অনেক উপেক্ষিত প্রাচীন প্রকাশ-কৌশল। সমসাময়িক যাত্রা ( আজকার যাত্রা নয় ) দৃশ্যপট বাদ দিয়ে, নাট্যশালায় অভিনীত নাটকেরই অনুরূপ নাটক, সংগীতকে বড় স্থান দিয়ে এমন মনোরম করে তুলেছিল, যা প্রাচীন যাত্রার চেয়ে এবং সমসাময়িক থিয়েটারী-নাট্যাভিনয়ের চেয়ে কম জনপ্রিয়, কম শিক্ষাপ্রদ হয় নি।

আমি নিজে কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভকালে যে যাত্রা দেখিছি, তার স্মৃতি থেকে বলতে পারি যে, তারও উপর সেক্সপীয়ারের নাটকের প্রভাব ছিল, যেমন ছিল নৃত্য-গীতে রূপায়িত প্রাচীন যাত্রার প্রভাব। সে যাত্রায় অভিনয় করবার জন্য স্ত্রী-লোক গ্রহণ করা হোত না, সকল স্ত্রী-ভূমিকা পুরুষদেরই দিয়ে অভিনয় করানো হোতো। সে যাত্রার আরো আকর্ষণের বিষয় ছিল বালকদের কোরাস্, জুরীদেরও কোরাস্ এবং একক গান। প্রায় সব গানই থাকত ক্লাসিকাল সুর-সংযোজিত। বালকরা গান গাইতে গাইতে দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত।

প্রতি বালকের পেছনে পেছনে থাকতেন একজন করে বেহালাদার, জুরীরা থাকতেন অভিনয় আসরে। তবলা, পাখোয়াজ, ঢোল, কথনো কখনো খোল, বেহালা, ক্লারিয়োনেট, কর্ণেট, হারমোনিয়াম প্রভৃতি দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হোতো। সাধারণতঃ একটা অংক শেষ হবার পর জুরী-বালকদের কোরাস্ বিরতির সময়টা দখল করে নিত। তখন আসর ত বটেই, সারাটা পল্লীতে, বিশেষ করে নিশীথে, সুরের প্লাবন বয়ে যেত। এই ক্লাসিকাল সুরের প্লাবন পল্লীর নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান শ্রোতৃদেরকে শুধু সুর-সচেতন করে দিত না, কাব্য-সচেতনও করে দিত। পুরুষানুক্রমে বাঙালী গীতিকাব্য সচেতন হয়েছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ওর প্লাবন বয়েছে জয়দেবের আমল থেকে। সেই প্লাবনকে তুমুল তরঙ্গ সঙ্কুল করে দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর ভক্ত শিষ্যরা, বৈষ্ণব কবিরা, আউল-বাউল-কীর্তনীয়ারা, পাঁচালী-কবি-তরজার গায়করা। ইংরেজের রাষ্ট্র-সমাজের ব্যবস্থার ফলে পল্লীর সংগে শহরের, শিক্ষিতদের সংগে অশিক্ষিতদের, রসবোধের ও রুচিবোধের যে পার্থক্য ঘটল, তার উপর, আগেই বলেছি, সেতু রচনা করে দিলেন গিরিশ তাঁর নাটককে স্বদেশীয় রূপ দিয়ে। সেই রূপকে আরো কিছু রঙ ঢেলে, বর্ণোজ্জ্বল করে, তখনকার যাত্রার দলগুলি নিয়ে গেল পল্লীতে পল্লীতে। তারই ফল হলো পল্লীতে থিয়েটারী নাটকের চাহিদা, আর শহরে যাত্রার চাহিদা। পল্লীর শিক্ষিত লোকেরা যেমন সৌখীন সম্প্রদায় গড়ে থিয়েটারী নাটক অভিনয় করতে লাগলেন, তেমন শহরের শিক্ষিতরাও সৌখীন সম্প্রদায় গড়ে যাত্রার পালা অভিনয় করতে লাগলেন। অমৃতলাল মিত্র, বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অন্যতম নায়ক, যাত্রাদল থেকে থিয়েটারে এসেছিলেন। বর্তমান কালে খ্যাতনামা অভিনেতাদের মাঝে তিনকড়ি চক্রবর্তী, হরিমোহন বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ অভিজ্ঞেরা নাট্যশালার মঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে সৌখীন যাত্রা সম্প্রদায়ে নিয়মিত অভিনয় করতেন। এখনও বছরে একবার করে জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি যাত্রায় অভিনয় করেন। সাম্প্রতিক কালে অনেক অভিনেতা ব্যবসায়ী থিয়েটার থেকে ব্যবসায়ী যাত্রাদলে চলে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

# থিয়েটার ও যাত্রা

ঊনবিংশ শতকের শেষে যাত্রাকে জনপ্রিয় এবং উন্নতমান করেন মতি রায়। আমি তাঁর দলের অভিনয় দেখিনি। কিন্তু স্বদেশী যুগে আমি বহু যাত্রাভিনয় দেখিছি। তার মাঝে বিশেষ করে মনে পড়ে ভূষণ দাসের, নীলকণ্ঠের, মথুর সাহার, শংকর চক্রবর্তীর, আর মুকুন্দ দাসের দলের কয়েকখানি নাটকের আর অভিনয়ের কথা। চীনে গিয়ে 'পিকিং অপেরা' অভিনয় দেখে আমার সেই আগেকার দেখা যাত্রা মনে পড়ে। পিকিং অপেরার সংগে আমার দেখা যাত্রার অনেক অমিল থাকলেও, অনেক আশ্চর্য রকমের মিলও লক্ষ্যের বিষয় হয়ে ওঠে। অমিল রয়েছে মূল রূপদানের পদ্ধতিতে। আর মিল রয়েছে গানে নাচে, বাজনায় আর কল্পনার প্রসারে। অমিল ঘটেছে যাত্রা যেখানে আধুনিক হয়েছে সেইখানেই, অর্থাৎ যতটুকু স্বধর্ম বর্জন করে আধুনিক মঞ্চ-নাট্যের ধর্ম অবলম্বন করেছে, ততটুকুতেই। আর মিল রয়েছে সেইখানেই, যেখানে যাত্রা তার প্রাচীন স্বধর্ম বজায় করে রেখেছে। অর্থাৎ, যাত্রায় ভারতীয়ত্ব যেখানে আছে, সেইখানেই আমাদের যাত্রার সংগে 'পিকিং অপেরার' মিল আছে। কিন্তু যে-মিল আমাদের যাত্রার সংগে আছে, তার চেয়ে বেশি মিল আছে 'কথাকলি'র সংগে, কেন না কথাকলি প্রাচীনত্ব বেশি বজায় করে রেখেছে। 'পিকিং অপেরা' সূক্ষ্মতর, আমাদের যাত্রা থেকে, এবং কথাকলি থেকেও। তাই তার অধিকতর মিল রয়েছে ভরতের নাট্যরীতির সংগে। দুটি রীতি অবশ্য হুবহু একই নয়, স্বতন্ত্র; কিন্তু শিল্পাভিব্যক্তির সমান্তরাল প্রয়াস। 'হ্যাংচো অপেরা' পিকিং অপেরারই একটি স্থানীয় অপভ্রংশ রূপ। এর সংগে আমাদের যাত্রার আরও বেশি মিল আছে, যদিচ পার্থক্যও কম নেই।

আধুনিক যাত্রাকে থিয়েটারের প্রভাব থেকে মুক্ত করে প্রাচীন যাত্রাকে পুনরুজ্জীবিত করবার সময় আজ এসেছে। সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবন হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু সেই পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসের ফলেই আমাদের দেশে অপেরা জন্মলাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। বহু ভাষাভাষিক দেশে অপেরার প্রয়োজন খুব বেশি। এতদিন যাত্রাকে থিয়েটারের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়নি এই কারণে যে, এতদিন পরবশতা থেকে মুক্তিলাভের আন্দোলন যে ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল,

তা শহরের ও পল্লীর শিক্ষিত অশিক্ষিতদেরকে সমানই মাতিয়ে তুলেছিল। শহরে ও মফস্বলে থিয়েটারি নাটক সমানে সেই ভাবপ্রবাহকে তরংগসংকুল করে তুলেছিল। থিয়েটারের বহু নাটকের অভিনয় সরকার যেমন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তেমন যাত্রারও বহু পালা-নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়েছিল। ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা', মথুর সাহার 'পদ্মিনী' আর 'ভরতপুরের দুর্গ জয়' মুকুন্দ দাসের প্রায় সব ক'খানা নাটক সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। মুকুন্দ দাসের যাত্রাই প্রথমে যাত্রার আসরে রাষ্ট্র-সমাজের চালু ব্যবস্থার প্রতিবাদ কণ্ঠে ধারণ করে সামাজিক নাটক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। গবর্ণমেণ্টকে এবং সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীকে ব্যঙ্গের কশাঘাতই ছিল ওই যাত্রা-পালাগুলির বিশেষত্ব। গানগুলি ছিল সত্যের সরল ও সবল প্রকাশ। মুকুন্দ দাস নিজে যে অসাধারণ গায়ক ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর গাইবার আবেদন ছিল অসাধারণ—যেমন ছিল নজরুলের। শোনা যায় দেশ-নায়ক অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ মুখোপাধ্যায় মুকুন্দ দাসের পালা-নাটকগুলির জন্য গান বেঁধে দিতেন। অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক দেশাত্মবোধক অগ্নি-রাগের গান লিখেছিলেন। কাজেই একথা সত্য হতে পারে যে, তিনি এবং জগদীশচন্দ্র মুকুন্দ দাসের যাত্রার বহু গান রচনা করে দিয়েছিলেন। মুকুন্দ দাসকে যাত্রা করবার প্রেরণা যে তাঁরাই দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। মুকুন্দ দাসের নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। ভূষণ দাস নিজে ছিলেন উঁচুদরের গায়ক। খুব মিষ্টি কণ্ঠ ছিল তাঁর। তাঁর দলের 'মাতৃপূজা' ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক কোলকাতা কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট একজিবিশনে পর পর আঠারো রাত্রি অভিনীত হয়, এবং মফস্বলের শহরে পল্লীতে নিরন্তর অভিনীত হয়। 'মাতৃপূজা' ছিল পুরাণের ছদ্মবেশে খাঁটি পোলিটিকাল নাটক, সিম্বলিক নয়, দ্ব্যর্থ বাহক নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল সুরেন্দ্র। তাঁকে সুররাজ ইন্দ্রও মনে করা চলত, আবার বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী-আন্দোলনের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেও কল্পনা করা যেত; নাটকের সংঘাতকে দেব-দানবের দ্বন্দ্ব বলেও গ্রহণ করা যেত, আবার দ্বিধা-বিভক্তা বঙ্গ-মাতার অখণ্ড রূপারোপের তখনকার সংগ্রামও কল্পনা করা যেত।

# থিয়েটার ও যাত্রা

পরবর্তীকালে ভূষণ দাসের যাত্রার এই দ্ব্যর্থবহ কৌশল সফলরূপে কোন কোন থিয়েটারী নাটকেও ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর' আর 'কারাগার' উল্লেখযোগ্য দুইটি উদাহরণ। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থিয়েটারী নাটক আর যাত্রার পালা নাটক অধিকাংশই একই উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত ও অভিনীত হোতো। গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ', 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এবং 'সেথা গিয়েছেন তিনি সমরে' গান সমন্বিত 'সাজাহান', 'গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ' গান সমন্বিত 'মেবার পতন' একদিকে, অপর দিকে যাত্রার পালা নাটক 'মাতৃপূজা,' 'বিদুর', 'পদ্মিনী', 'ভরতপুরের দুর্গ জয়' বা 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' এবং মুকুন্দ দাসের সমস্ত পালাগুলি রাজনীতিক মুক্তির বাণী দিয়ে এবং দেশাত্মবোধক গান দিয়ে জাতির জনগণের চিত্ত জয় করে এমনই একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, থিয়েটারী নাটকে আর যাত্রার পালায় জনগণ অপর কোন বিষয় প্রত্যাশাই করত না। নারী পরিচালিত, নর-নারী সংগঠিত মিশ্র-যাত্রা-সম্প্রদায়ও নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হোলো। 'বৌরাণীর দল' ইতিহাস খ্যাত। ত্রৈলোক্যতারিণীর দলের অভিনয় আমি দেখেছি। কীর্তন, ঢপ, খেমটা, ঝুমুরে নারীর শিল্প-প্রয়াস স্বীকৃতি পেল। নাটকের কতকগুলি ফর্মকে নারী শিল্পীরাই বাঁচিয়ে রাখল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রধানতঃ স্বদেশাত্মক নাটকের চাহিদা হয় থিয়েটারে ও যাত্রার আসরে। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রবলতর হয়ে ওঠার সংগে সংগেই নাটকে আর পালা যাত্রায় দর্শকেরা সংগ্রামের আর সংগঠনের রূপও দেখতে চাইলেন। তারই ফলে স্থূল সংগ্রামের দিকে নাটকের ঝোঁক হোলো। সংগ্রামের চিত্র দেখলেই লোকে খুসি হতে লাগল—তা পৌরাণিক সংগ্রামই হোক, ঐতিহাসিক বা সামাজিকই হোক্। যাত্রার পালা-নাটকে ঐতিহাসিক আর সামাজিক নাটক চালু হতে লাগল। আর থিয়েটারেও ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকগুলি রাজনীতিক সংগ্রাম রূপান্তরে প্রকাশ করবার মাধ্যম হয়ে উঠল। সংগঠন সম্বন্ধে যে নাট্যশালা আর যাত্রার দলগুলি উদাসীন রইল, তা নয়।

## ( ৭ )

## সংগ্রাম ও সংগঠন

'মিশর কুমারী' নাটক এ-দেশী বিষয় বস্তু নিয়ে রচিত নয়। তবু তাতে কালার আর ধলার, অধিকার-হারার আর স্বাধিকার-প্রমত্তের, কাফ্রির আর মিশরীর, সংগ্রামের জোরালো পরিচয় আছে। মিশরকুমারী বাঙালীর প্রিয় নাটক হয়ে উঠ্‌ল। বিজ্ঞ সমালোচকরা বল্লেন, বাঙালী নাটক বোঝে না, কাচকে কাঞ্চন বলে গ্রহণ করে। কিন্তু একটি কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, সমালোচক নাটককে যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন, দর্শকরা সে দৃষ্টি দিয়ে নাটক দেখেন না, সকলে দেখতে পারেনও না। দর্শকদের চিত্ত-বীণে যে নাটক যে-কোন কারণে ঝঙ্কার তুলে দিতে পারে, তাই জনপ্রিয় হয়। কিন্তু তাই বলে সমালোচকরা অনধিকার চর্চা করেন, এমন কথা আমি নিশ্চিতই বলি না। শুধু বলি ভরত আর আরিস্টটলের দৃষ্টি দিয়েই কেবল নাটক বিচার করায় নাটকের সম্পূর্ণ বিচার হবে না। নেপোলিয়ন গ্যয়টেকে বলেছিলেন—"গ্রীক নাটক নিয়তির দাবী অপরিহার্য বোঝাবার জন্য যে ট্রাজেডী সৃষ্টি করেছেন, তা আজ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আজ মানুষের নিয়তি বা ডেষ্টিনি হচ্ছে রাজনীতি—যাকে রূপ দেবার ও রূপান্তরিত করবার অধিকার ও শক্তি মানুষের আছে।"

ওই কথাই রকম-ফের করে চেকভ বলেছিলেন—"আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের চেয়ে এমন অনেক কিছু জেনেছি যা তাঁরা কল্পনায় আনতে পারতেন না। নতুন মানুষ নতুন যা-সব জেনেছে, তাই দিয়ে অনাগত মানুষের জন্য এমন এক সৌন্দর্যময় সুষমা মণ্ডিত জগৎ তৈরি হতে চলেছে, আজ যার পরিপূর্ণ রূপ কল্পনায় আনা যাচ্ছে না।" বস্তুত চেকভের 'সি গাল্' নাটকখানিও অনাগত দিনের নাট্য-পরিকল্পনার আভাস। তাই মস্কো আর্ট থিয়েটার ষ্টানিস্লাভস্কি-ডেনচেনকোর পরিচালনাকালে সী-গালকেই ওই থিয়েটারের প্রতীক করে নিয়েছিলেন। তার সঙ্গে কিন্তু ভারতীয় নাট্যরীতির কল্পনার প্রসারের মিল রয়েছে। এই কল্পনার প্রসারে অভ্যস্ত বলেই বাঙালী দর্শকরা মিশরী কাহিনীতে

ব্যক্ত অধিকার-হারা (আরনের) কাছে স্বাধিকার প্রমত্তের (সামন্দেশের) পরাভবকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামেরই প্রকাশ বলে গ্রহণ করেছে। সমালোচকরা অবশ্যই দেখাতে পারেন ও নাটকের সংগঠনে কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে। কিন্তু তাতে করে দর্শকদের মন থেকে ওর প্রভাব ততদিন দূর করতে পারবেন না, যতদিন পৃথিবীতে অধিকার-হারাদের স্বাধিকার-প্রমত্তদের সঙ্গে সংগ্রাম করবার সঙ্গত কারণ থাকবে, আর ওই নাটকের ঘটনায় আর ভাষায় দর্শকরা নিজেদের অবস্থার এবং কামনার প্রতিফলন দেখতে পাবে। এই কথাকে মেনে নিলে ওই মিশরকুমারী নাটকের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানব চিত্তে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা এনে দিতে পারে বলে মূল্য একটা কিছু দিতেই হবে।

'বঙ্গে বর্গী'র মতো নাটকও বাঙালীর প্রিয় নাটক হয়েছে ওই একই কারণে। বর্গীরা বাংলার হিত করেনি। বর্গীর ভয়ে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-শিশু ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রতি অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর বিন্দু-মাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু দেশাত্মবোধে বাঙালী যখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল, তখন আলিবর্দ্দিকে স্বাধীনতার হন্তারক, আর ভাস্কর পণ্ডিতকে মুক্তিদাতা বলে মনে করতে বাঙালীর বাধে নি, যদি চ আলিবর্দ্দিই বর্গীর উপদ্রব থেকে বাঙালীকে বাঁচাবার জন্য বার বার সংগ্রাম করেছিলেন।

বিরোধ যখন হিন্দুতে মুসলমানে হয়েছে, তখন হিন্দুরা হিন্দুর প্রয়াসকেই স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস বলে মনে করেছে। বর্গীর অত্যাচার উপদ্রব নাটকে দেখানো হলেও ভাস্কর পণ্ডিত বাঙালী দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করেছে। পূর্ববর্তী কালের রাজপুত ও মারাঠাদের প্রয়াস নিয়ে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে নানা নাটক লেখা হয়েছে, এবং সে সব নাটক যাত্রার আসরেও অভিনীত হয়েছে। স্বদেশী যুগের 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'প্রতাপাদিত্য' আর স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনের 'গৈরিকপতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা, 'মীরকাসিম', 'বাংলার প্রতাপ' তুলনা করলে দুই যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য উপলব্ধি হবে। পরবর্তীদের নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা পূর্ববর্তীদের নাটকে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আরো একটা পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাবে। তা হচ্ছে দেশ-প্রেমকে স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদীয়মান

তরুণ-তরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রীতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরিচয় 'গৈরিকপতাকায়' 'কারাগারে' 'সিরাজদ্দৌলায়' সুস্পষ্ট পাওয়া যাবে। দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, স্বদেশ প্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ব্যাহত হলে ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই আদর্শকে নাটকে প্রথম স্থান দেন 'সাজাহান' নাটকে 'মহামায়া'র চরিত্র, এবং 'মেবার পতনে 'মানসী' চরিত্র সৃষ্টি করে। বঙ্কিমই অবশ্য এ বিষয়ের পথিকৃৎ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে বাংলা নাটক বেশি রোমান্টিক হয়ে ওঠে। মাইকেল দীনবন্ধু গিরিশের আমলে বাংলা নাটক তেমন রোমান্টিক ছিল না। এর কারণ, আমার মনের হয়, বঙ্কিমের প্রভাব। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' যাঁরা মন্ত্র-হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা বিপ্লবের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা আনন্দমঠকে, দেবীচৌধুরাণীকে, চন্দ্রশেখরকে সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ করে নিয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের এবং বৈপ্লবিক সংগঠনের মূলে রোমান্টিসিজম থাকেই। সন্তান সম্প্রদায, আনন্দমঠ, ভবানীপাঠকের দল বাংলার বিপ্লবীদের প্রেরণা দিয়েছে এ-কথা সকলের জানা আছে। ঘর-ছাড়বার, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করবার কল্পনার, অকূলে ভাসবার, মূলে যে দেশপ্রেম ছিল, যে স্বাধীনতা-প্রীতি ছিল, যে সংগঠন প্রয়াস ছিল, তাঁর মূলে ছিল রোমান্টিক কল্পনা। সর্বত্রই তা থাকে। তাই ওই সময়ের বাংলা নাটক সঙ্গত কারণেই রোমান্টিক হয়ে ওঠে। বঙ্কিমকে নতুন করে পাওযা যায় নাটকে। ওর ফলেই নাটক সক্ষম হয় মুক্তির বাণী দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে। ইংরেজ শাসকরা নাটকের এই প্রয়াস বুঝতে পেরেই নাটককে কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা করেন। সে ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেননি উপন্যাসের, কাব্যের, এমন কি সংবাদপত্রেরও বিরুদ্ধে। আগে পুলিশের অনুমতি নিয়ে আত্ম-প্রকাশ কেবল নাটককেই করতে হয়, অন্য কোন আর্ট ফর্মকে তা করতে হয় না, সংবাদপত্রকেও নয়। এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তায় নাটক আত্ম-নিয়োগ করবার একটা নিজস্ব তাগিদও অনুভব ক'রে যেমন বলিষ্ঠ হতে চায়, তেমন পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য যে-সব কৌশল অবলম্বন করে, তার জন্য আঙ্গিকের দিক

দিয়ে দুর্বলও হয়ে পড়ে। কিন্তু সে দৌর্বল্য সত্ত্বেও বাংলার নাটক অনেক বেশি গতি-বেগ অর্জন করে।

আমাদের বিপ্লব-প্রয়াস, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, যে-কারণেই হোক্, পৃথিবীর নূতন বিপ্লবের আদর্শ ও স্বাধীনতার নূতন আদর্শ উপলব্ধি করে নেয় একেবারে শুরু থেকেই। সে নূতন আদর্শ হচ্ছে, কেবল ভাঙবার জন্যই বিপ্লব নয়, পরবশতার শৃঙ্খল ছেঁড়বার জন্যই কেবল স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, অচলায়তন যেমন ভাঙতে হবে—তেমন সঙ্গে-সঙ্গে গড়বার প্রেরণাও দিতে হবে। দাসত্বের শৃঙ্খল যেমন ছিঁড়তে হবে—তেমন স্বরাজ্যকেও গড়ে তুলতে হবে। যুগপৎ ওই দুই কাজ কর্তব্য বলে মনে হওয়ায় আমাদের দেশে বিপ্লব এবং সংগ্রাম একান্ত করে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠেনি। অনেক সময় আমরা আমাদের প্রয়াসকে পর্যাপ্ত বলে মনে করিনি; ভেবেছি, অপরাপর দেশের মানুষের মতো আমরা শক্তির পরিচয় দিতে পারিনি আমাদের দৌর্বল্যের জন্যই। কিন্তু আজ মনে হয় বিপ্লব ও তার পরবর্তী অবস্থার কথা, সংগ্রাম ও তার পরবর্তী অবস্থার কথা, একসঙ্গে আমাদেরকে বিপ্লবের ও সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছিল বলেই ধ্বংসে ও হননে আমরা মেতে উঠ্‌তে পারিনি। পশুবলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার করতে আমাদের বেধেছে—সিপাহীদের বিদ্রোহকালে সিপাহীদের যা বাধেনি। স্বাধীনতার সংগ্রামে কিছু লোক বোমা মেরে, গুলি ছুড়ে, হত্যা করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু জেনোসাইড বা সমবেত-হত্যার প্রবৃত্তি কখনো জাগ্রত হয় নি।

কেবল বঙ্কিম স্থাপিত আদর্শেই যে সংগঠন ধ্বংসের চেয়ে উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত হয়েছিল তা নয়, বংশ-পরম্পরায় বিপ্লবের যে ঐতিহ্য আমাদের কাছে এসে পৌছেছিল, তাই থেকেই আমরা জেনেছিলাম বিপ্লব ধ্বংসেই পরিণতি লাভ করে না; একান্তই অপরিণত থেকে যায় যদি না সংগঠন তার চরম লক্ষ্য হয়। ভারতবর্ষে যুগে-যুগে যে-সব মহাবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে সব চেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে মানুষের মানসিক পরিবর্তনের দিকে, যে-হেতু বিপ্লবের প্লাবন যদি বন্যার প্লাবনের মতো আকস্মিক রাষ্ট্র সমাজকে প্লাবিত করে অকস্মাৎই আবার সরে যাবার পথ পায়, তাহলে তা শুধু ধ্বংসই করে যায়,

সৃষ্টির সহায়তা করে না। কিন্তু মানুষের মন যদি বিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত হয়, তাহলে প্লাবন নেমে গেলেও মানুষের মনে-মনে বৈপ্লবিক রূপান্তরের আবেগ থেকে যায়, যার ফলে ঘটে রাষ্ট্র-সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সফল হয় নব-সংগঠন।

এই ঐতিহ্য ছিল বলেই ভারতীয় বিপ্লবীরা কোন কালেই পশুবলের উপর সব কিছু নির্ভর করেনি, মানসিক পরিবর্তনের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। বিপ্লবী শুধু বিপ্লবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বলেনি—যাও হত্যা করে এস ; হাতে গীতাও তুলে দিয়েছে, সন্তান-ধর্মে দীক্ষাও দিয়েছে। কেবল দার্শনিক বিচার দিয়ে, ন্যায়ের অমোঘ দাবীকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে, ভক্তির প্লাবন দিয়ে, মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে, ভারতবর্ষ যুগে-যুগে কত মহাবিপ্লবই না সাধন করেছে। সেই সব বিপ্লব সাময়িক পরিবর্তনও সাধন করেছে, মানুষের মনেরও রূপান্তর ঘটিয়েছে। বল-প্রয়োগ বা সশস্ত্র-সংঘাত যে কখনো হয়নি, তা বলি না। যখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তা হয়েছে ; কিন্তু একেবারে ধ্বংসাত্মক হবার আগেই আদর্শের কাছে নতি স্বীকার করে স্তব্ধ হয়েছে, এবং কখনো কখনো আদর্শের তাগিদেই সশস্ত্র সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, গ্রীক শক্তিকে প্রতিরোধ করবার দৃঢ়তা, ইসলামের অভিযানকে প্রায় তিনশ বছরকাল ঠেকিয়ে রাখা। ভারতবর্ষ সমগ্রভাবে মহাবীরের অহিংসার বাণী গ্রহণ করেনি, বুদ্ধকে হিংসা-অহিংসার উর্ধ্বতর স্তরে তুলে ধরেছে পার্থসারথির সমান করে নিয়ে।

যে-ভারত ও-সব করেছিল, ইংরেজ আমলে সে ভারত বাস্তব ছিল না। তার ঐতিহ্যও ছিল না কল্পনায় জাগ্রত। তাই তার সংগ্রাম ও সংগঠন দুই-ই রোমান্স মিশিয়ে চিত্তাকর্ষক, মনোরম, করতে হয়েছে। নাট্য সাহিত্যেও তাই হয়েছে। নাটকে যেমন এসেছে স্থূল-সংঘাত এবং কাল্পনিক ভবিষ্যৎ, তেমনই এসেছে 'পাণ্ডব গৌরব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'রামানুজ', 'জয়দেব', 'চণ্ডীদাস' ; আবার এসেছে 'শকুন্তলা' 'সীতা', 'সাবিত্রী', 'ফুল্লরা', 'বেহুলা', 'মহুয়া', 'খনা', 'চাঁদসদাগর'। তেমনই এসেছে 'কর্ণার্জ্জুন', 'কংসবধ', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শঙ্করাচার্য', 'আত্মদর্শন', 'বুদ্ধচরিত'

'অশোক', 'চক্রব্যূহ', 'অভিমন্যুবধ', 'রাবণ'। শুধু থিয়েটারী নাটকেই এসব আসেনি, যাত্রার পালা নাটকেও এসেছে; এসেছে আরব্য উপন্যাসের, পারস্য উপন্যাসের কাহিনী। বিষয়বস্তু যত এক হয়ে এসেছে, ততই থিয়েটারী নাটক আর যাত্রার পালা-নাটক এক হতে চেয়েছে, শহরের আর পল্লীর দর্শকদের রুচির ও রসবোধের পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে। হালে যাত্রা আধুনিক হবার জন্য থিয়েটারের নাটক বেশি অভিনয় করছে, এবং ব্যবসায়ে লাভবানও হচ্ছে। এমনটি হতে পারত না যদি না গিরিশ নাটককে কিছুটা দেশীয় নাটকের রূপ দিতেন।

## ( ৮ )

## সংগ্রাম ও সমন্বয়

কিন্তু জাতি-সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়ে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে অতীত ভারত সত্তাকেই সন্ধান করেনি, পাশ্চাত্ত্য সংগঠন-প্রয়াসকেও স্বীকার করেছে। তাই সামাজিক নাটকে এসেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। দীনবন্ধু-মাইকেলের সামাজিক নাটক পুনরায় আদর পেয়েছে নতুন দর্শকদের কাছে, গিরিশের সামাজিক নাটকের পাশে-পাশে। কিন্তু পরবর্তী সামাজিক নাটক আরও অন্তর্মুখিন হয়েছে। অর্থাৎ কেবলই আর তা 'প্রফুল্ল' 'বলিদানের' মতো অথবা 'সধবার একাদশীর' মতো কিম্বা 'একেই কি বলে সভ্যতার' মতো সামাজিক কুপ্রথাকে ধূলিসাৎ করবার কথাই ভাবেনি, ব্যক্তির মনের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। সে দৃষ্টি-কোণ বঙ্কিমের দৃষ্টি-কোণ থেকে পৃথক, পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টি-কোণ। ইবসেনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বঙ্কিমের গিরিশের সমাজ-স্থিতিকর নীতির ওপর প্রাধান্য স্থাপন করতে গিয়ে, খানিকটা এগিয়েও, পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়েছে; যেমন শরৎচন্দ্রকেও পশ্চাৎপদ হতে হয়েছে অনুরূপ চেষ্টা যেখানেই তিনি করেছেন। যেখানে তিনি ভারতীয় সিদ্ধরসকে পরিবেশন করেছেন, সেখানে তিনি রয়েছেন অপরাজেয়। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সমাজের কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে

চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে যেখানে হয়েছে, সেখানে শেষ মুহূর্তে তাঁকেও আপোষ করতে হয়েছে। রোহিণীর প্রতি সুবিচার করা হয় নি বলে তিনি কিরণময়ীকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কিরণময়ীকে যে পরিণতিতে তিনি পৌঁছে দিলেন, তাতে করে কিরণময়ীর প্রতি যে সুবিচার করা হয়েছে, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। 'গৃহদাহে', 'শেষ প্রশ্নে'ও এমনই এক যায়গায় পৌঁছে তাকে আপোষের পথ খুঁজতে হয়েছে। আমার মনে হয় ভারতীয় লেখকদের সবাইকেই তাই খুঁজতে হবে, যতদিন না ভারতীয় মন সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-সত্তাকে বড় করে দেখবে। আবার সমাজ যতদিন কুসংস্কারে আছন্ন ছিল, যতদিন সমাজপতিদের স্বৈরাচার সমাজের সাধারণ লোকদেরকে নিপীড়িত রেখেছিল, ততদিন মনে হয়েছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজনীয়। ততদিন মনে হয় নি অতীত ভারত ছিল সমাজতান্ত্রিক ; বহুলাংশে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ। সে সমাজতন্ত্র হিত করেছিল যখন তা উন্নত ছিল, অহিতের হেতুও হয়েছিল যখন তার অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র কখনো লোপ পায় নি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, ছিল সমাজের বাইরে, সমাজ-অঙ্গনে নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাসনা যে প্রবল হয় উঠছে বঙ্কিম গিরিশ তা লক্ষ্য করেছিলেন, তা রূপায়িতও করেছিলেন, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তনও আবশ্যকমনে করেছিলেন, কিন্তু সমাজ-তন্ত্রকে অগ্রাহ্য করতে চাননি। তাঁরা উৎপীড়িতের সম্মুখে, অশান্ত-চিত্তের মানুষের সম্মুখে, স্থাপন করেছেন অধ্যাত্ম-আলো। তাই তাঁদেরকে অনেকে বলেন রিভাইভ্যালিষ্ট, শরৎচন্দ্রকে বলেন প্রগেসিভ রিয়ালিষ্ট।

বঙ্কিম গিরিশ রিভাইভ্যালিষ্ট ছিলেন না, ন্যাশানালিষ্ট ছিলেন, প্রগেসিভও ছিলেন, আইডিয়ালিষ্টও ছিলেন। যাকে রিয়ালিষ্ট বলা হয়, সম্পূর্ণরূপে, সমগ্র-ভাবে, তিনজনের কেউ তা ছিলেন না। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে গিরিশেও পাই ; রোহিণীকে পাই, গোবিন্দলালকে পাই, ভ্রমরকে পাই, দেবেন দত্তকে পাই, ভবানী পাঠক-ব্রাহ্মনন্দকেও পাই, কৃষ্ণকান্তকেও পাই, কিন্তু পাই না প্রতাপকে, পাই না চন্দ্রশেখরকে, পাই না দেবীরাণীকে, পাই না কপাল-কুণ্ডলাকে। বঙ্কিমের রোমান্টিসিজম গিরিশের ছিল না। গিরিশ তরুণ-তরুণীর প্রণয়কে নাটকের বিষয়বস্তু করেন নি। ভাষাকেও, বিশেষ করে গদ্য ভাষাকে,

তিনি রোমান্টিক করতে চান নি, অথবা সেন্টিমেণ্টাল করেন নি ; যথাসম্ভব কথ্য ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও প্রফুল্লকে পাই, যোগেশ-রমেশ-সুরেশকে পাই, কৃষ্ণকান্ত-রোহিণীকে পাই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মানুষের প্রতি যে দরদ পাই, সে দরদ গিরিশে পাই না, এমন কি বঙ্কিমেও পাই না। সমাজতন্ত্র আর অধ্যাত্ম-আশ্রয় বঙ্কিমের গিরিশের হাতের কাছে তৈরি ছিল বলেই উপক্রুত স্বাধিকারহারা বঞ্চিত মানুষকে তাঁরা তৈরী-প্রেস্কৃপশন দিয়ে সবল করবার চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্র সেই তৈরি-প্রেস্কৃপশন ব্যর্থ হবে জেনেই শুধু দরদ ঢেলে, সহানুভূতি সিঞ্চন করে, নিজের চিত্তকে বেদনামুক্ত করেছেন। তিনি কখনো গুরু হতে চান নি, ভবিষ্যতের নির্দেশ দেন নি, ভঙ্গুর-সমাজের দৌর্বল্য এবং ভগ্নাবশিষ্ট সম্পদ দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের প্রতি, অধ্যাত্ম-সান্ত্বনার প্রতি, কিছুমাত্র আস্থা না রেখে। তিনি মানুষকে দেখেছেন, মানুষকে দেখিয়েছেন। তবু আপোষ তিনিও করেছেন।

উপন্যাস যদি ওতেই শেষ হয়, কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নাটককে ওতেই শেষ করা যায় না। তাকে একটা ইঙ্গিত দিতেই হয়, যা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেও দর্শকদের চিন্তার বিষয়, আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। নাটককে নিত্য নূতন-নূতন দর্শক আকর্ষণ করতে হবে ; বেশির ভাগ সেই দর্শক, যাদের বই পড়বার বিদ্যা বা তাগিদ নেই। যে-নাটকের প্রথম রাত্রির দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে কী দেখে এল, কতটুকু আনন্দ নিয়ে এল, কতখানি চিন্তার বস্তু পেল, কোন্-কোন্ বিষয়ে হতাশ হোলো, তা নিয়ে আলোচনা করবার তাগিদ অনুভব না করে, সে নাটক রাতের পর রাত দর্শক আকর্ষণ করতে পারে না। তাই বলা হয় নাটকের ভাগ্য প্রথম রজনীতেই নিরূপিত হয়। কাজেই নাটককে দর্শকের মনের খবর রাখতে হয়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যার বিষয়বস্তু, তেমন সামাজিক নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী-কালে কিছু কিছু রচিত ও অভিনীত হয়েছে ; যেমন, শরৎ ঘোষের 'অভিজাত' যোগেশচন্দ্রের 'নন্দরাণীর সংসার' প্রবন্ধ লেখকের 'ঝড়ের রাতে', 'কালের দাবী', 'কালো-টাকা', 'এই স্বাধীনতা', তারাশঙ্করের 'বিংশ শতাব্দী', 'দুইপুরুষ', জলধর

চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবর্ণা' প্রভৃতি। কিন্তু এক 'দুইপুরুষ' ছাড়া ওর একখানাও দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি, আঙ্গিকের দিক দিয়ে এবং অভিনয়ের দিক দিয়ে অনেক আধুনিক এবং উন্নতমান হয়েও। বঙ্কিমের একমাত্র উপন্যাসের নাট্যরূপ যা দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবার মতো দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি, তা হচ্ছে 'রজনী' শুধু লবঙ্গলতার মতো অনুপম চরিত্র থাকার অপরাধে! রজনী একবার নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন অপরেশচন্দ্র, আর একবার করেছিলাম আমি। দুবারই উঁচু ধরণের অভিনয় হয়েছিল। কিন্তু রজনী দু'বারই স্বল্প কয়েকটি রাত মাত্র দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ অন্ধ, কালা-বোবা, বিকলাঙ্গের প্রতি বাঙালীর সভানুভূতির অভাব নেই। কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, ইবসেনের অনুবাদ একখানিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি। A Doll's Houseএর অনেকগুলি অনুবাদ আছে। কিন্তু সাধারণ বা সৌখীন মঞ্চে তা অভিনীত হয় নি। বহুরূপী An Enemy of the People 'দশচক্র' নাম দিয়ে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু 'ছেঁড়াতার' বা 'পথিক' যে অভ্যর্থনা পেয়েছিল তা পায় নি। বিয়র্ণসনের A Newly Married Coupleএর সঙ্গে আরো দুইটি দৃশ্য যোগ করে 'স্বামী-স্ত্রী' নাম দিয়ে আমি যে নাটক লিখেছিলাম, তা শত রজনী অতিক্রম করেছিল বিপুল সম্বর্ধনার মাঝে; ফিল্মে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, রূপান্তরিতও হয়েছিল। ইবসেন আর বিয়র্ণসন একই দেশের নাট্যকার হয়েও একই দৃষ্টি দিয়ে সমাজের মানুষকে দেখেন নি। মঞ্চে বার্ণার্ড শ'কে রূপ দেবার কোন চেষ্টাই এখনো পর্যন্ত হয় নি। মোপাসাঁর Useless Beauty গল্পটি আমি 'কাঁটা ও কমল' নাম দিয়ে নাটকে রূপান্তরিত করে-ছিলাম। দুর্গাদাস ও শান্তিগুপ্তা অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু নাটকখানি চল্ল না কেবল স্ত্রী মিথ্যে করেও স্বামীকে বলেছিল তাদের সাতটি সন্তানের মাঝে একটি স্বামীর ঔরসজাত নয় বলে। মিথ্যে হলেও স্ত্রীর মুখ দিয়ে ও কথা উচ্চারণ করানো দর্শকরা সহ্য করতে নারাজ।

( ৯ )

## নাটক ও দর্শক

নাটক না চল্লেই বলা হয়, রচনা সফল হয় নি। চল্লে অনেক ক্ষেত্রেই নাটককে তার প্রাপ্যটুকু না দিয়ে বলা হয় অভিনয়ের ও প্রযোজনার গুণেই চলেছে। কিন্তু যাঁর দশখানি নাটক চলে নি, তাঁর কিছু নাটক নিশ্চয়ই ভালোভাবে চলছে। নইলে তাঁরই দশখানা নাটক মঞ্চে স্থান পেত না। আশা করবার মতো পূর্ব-পরিচয় না থাকলে মঞ্চ-মালিক তার পেছনে অর্থব্যয় করবেন কেন? আর একই অভিনেতৃদল সকল নাটককেই সফল করতে পারেন না, একই নাট্যকারেরও সকল নাটককে না। কাজেই মেনে নিতে হয় নাটক সফল হয় নাটকের গুণে, অভিনয়ের ও প্রযোজনার গুণে, এবং দর্শকদের খুসির ও রুচির প্রসাদে। শুধু নাটকের গুণ, শুধু অভিনয়ের বা প্রযোজনার গুণ কোন নাটককে সাফল্য দেয় না। এমনও দেখা গিয়েছে যে-নাটক এককালে দর্শকদেরকে তৃপ্তিদান করেনি, পরবর্তীকালে সেই নাটকই দর্শকদের অভিনন্দন পেয়েছে। এককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটকও পরবর্তীকালের দর্শকদেরকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর।

কম আশ্চর্যের কথা নয় যে, বাংলা 'শকুন্তলা' নাটক কোনদিনই জনপ্রিয় হয় নি। অশোককে নিয়ে তিনজন শক্তিমান নাট্যকার তিন যুগে তিনখানা নাটক লেখেন,—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ, এবং মন্মথ রায়। কিন্তু একখানাও জনপ্রিয় হয় না। ওই কারণে বৌদ্ধ-কাহিনী নিয়ে কোন নাটক রচনায় পরবর্তী কোন বাঙালী নাট্যকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধগাথা অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলির নৃত্য-নাট্য ক্রমশই অধিকতর জনপ্রিয় হচ্ছে। বলা অসঙ্গত নয় যে, নাট্যকারের সাফল্য-অসাফল্য ছাড়াও, অভিনয় ও প্রযোজনা ছাড়াও, নাটক জনপ্রিয় হবার মূলে আর একটা অপরিহার্য বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে দর্শক-রুচি। তাকে অস্বীকার করে, অগ্রাহ্য করে, নাটক অবশ্যই লেখা যায়—কিন্তু কেবল রচনার গুণেই বা অভিনয় ও প্রযোজনার গুণেই দর্শকগ্রাহ্য জনপ্রিয় নাটক করা যায় না। সমালোচকের বিচারে যা সার্থক সৃষ্টি,

দর্শকরা তাকে একেবারে ব্যর্থ-প্রয়াস বলে দর্শনের অযোগ্য মনে করে মুখ বাঁকিয়ে বসতেও পারেন। আবার এমন নাটক নিয়েও তাঁরা মত্ত হতে পারেন, সমালোচক যাকে এক-কথায় 'রাবিশ' বলে রায় দেন। তৃতীয়ত এমন নাটকও হয়, যা দর্শকরা আর সমালোচকরা একসঙ্গেই অনুপম বলে অভিনন্দন জানান।

দর্শকের রুচি উন্নতও করা যায়, অবনতও করা যায়। কিন্তু ঐতিহ্যের বিপরীত কিছু দিয়ে দর্শককে খুসি করা যায় না; শিক্ষিতদেরকে যদি বা যায়, অশিক্ষিতদেরকে আদৌ যায় না। দর্শক-সাধারণকে অবুঝ খাম-খেয়ালী মনে করা কিন্তু ভুল। তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ নাটক রসোত্তীর্ণ হবার ওপর নির্ভর করে, নাটকের আঙ্গিকের বা প্রযোজনার ওপর নয়। নাটক রস-ঘন হওয়া চাই, এবং সেই রস প্রবহমান থাকাও চাই। তাও আবার যে-কোন রস হলেই চলবে না, সিদ্ধ রস—যার পরিচয় তারা বার-বার পেয়েছে রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে; পেয়েছে গীতি-কাব্যের মাধ্যমে; পেয়েছে বাউলে, ভাটিয়ালীতে; পেয়েছে খেয়ালে, ধ্রুপদে। এ বড় বিস্ময়কর কথা, কিন্তু মিথ্যে কথা আদৌ নয়। সকলের কথা না হলেও অধিক-সংখ্যকের কথা। নূতনত্বে রুচির অভাব লক্ষ্য করা যায় আমাদের দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশের মনে। কয়েকখানি সামাজিক নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি।

মন্ত্রশক্তি অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ। অভিনীত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। বক্তব্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মনের গরমিল দূর হতে বাধ্য, মন্ত্রোচ্চারণ করে, অগ্নি স্পর্শ করে, শালগ্রাম সাক্ষী রেখে, বিবাহ হয়েছিল বলে। তখন কিন্তু দেশে নারীর অধিকার নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলছে, সাহিত্যে নারীর স্বাতন্ত্র্যের কথাও বড় হয়ে উঠেছে, সিভিল ম্যারেজও চালু হয়েছে। উপন্যাসখানি লেখা হয়েছিল অভিনীত হবার প্রায় সতের বছর আগে। উপন্যাস লিখিত হবার আর অভিনীত হবার ব্যবধানের মাঝে দেশের উপর দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন, বৈপ্লবিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষ করে গান্ধী আন্দোলন, অনেক ভাঙ্গ-চুর করেছে, নারীকুল এগিয়ে এসেছে মুক্তির আন্দোলনে। সেই দিনেও ওই মন্ত্রশক্তি নাটক অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই অপর মঞ্চে আমারই ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'ও অভূতপূর্ব সমর্থন্ পায় যাতে

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী সংসার ছাড়ে, সমাজ ছাড়ে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। দর্শকরা তখন বার বার করতালিধ্বনি দিয়ে নারীর ওই দাবীকে সমর্থন করেন। পোলিটিকাল বিষয়-বস্তুতে নারীর সমাজবন্ধন-লঙ্ঘন বাঙালী প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে, কিন্তু সামাজিক নাটকে তা করে নি।

মন্ত্রশক্তির সমসাময়িক রচনা 'শ্যামলী' উপন্যাস, বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা নেতৃস্থানীয়া লেখিকা নিরুপমা দেবীর রচনা। মন্ত্রশক্তির বক্তব্য আর শ্যামলীর বক্তব্য এক নয়—অন্তত মন্ত্রশক্তির অমোঘ প্রভাব প্রমাণিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ওই উপন্যাসখানি রচিত হয় নি। কিন্তু ওর নায়ক বলে—'প্রতিগৃহ্নামি' বলে মন্ত্র পড়ে যাকে গ্রহণ করিছি, তাকে ত্যাগ করব কেমন করে? যদিচ নায়ক পত্নীকে গ্রহণ করেছে, বিবাহকে স্বীকার করেছে, মানবতার দিকে ভেবে, নাটকে এমন ইঙ্গিতও আছে। তারপর উপন্যাসে এমন পরিণতি আছে, যা ওই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া অতিক্রম করেই ঘটেছে। ওই উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় উপন্যাস রচিত হবার প্রায় চল্লিশ বছর পরে, তিন-তিনটে আন্দোলনের প্লাবনের পরে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরে, নতুন বিবাহ-আইন পার্লামেণ্টে আলোচিত হবার সময়ে।

পার্লামেণ্টে নতুন আইন যাঁরা সমর্থন করলেন হিন্দু-বিবাহ-প্রথার পরিবর্তন সমাজের হিতকর পরিবর্তন স্বীকার করে, তাঁরাই 'শ্যামলী' নাটকের অভিনয়কে সমর্থন করলেন তাতে মন্ত্রশক্তির জয়, অর্থাৎ তাঁদের ভাষায় 'বঙ্গ-সংস্কৃতির' জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে। সাধারণ দর্শকরাও তাই সমর্থন করলেন, যার ফলে নাটকখানি একটানা পাঁচশত রাত্রি চল্ল। এখানেও দেখা গেল পার্লামেণ্টে বসে সমাজকে যাঁরা এক দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখেন, সমাজ-অঙ্গনে দাঁড়িয়ে সমাজকে তাঁরাই দেখেন অন্য দৃষ্টি-কোণ থেকে।

আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক মেবার-পতনে মেবারের সামন্ত গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণী যাঁকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে 'মহাব্বৎ খাঁ' উপাধি ভূষিত হয়ে মুঘল সেনাপতি হন বলে চিত্রিত হয়েছে। কল্যাণী সেই মহাব্বৎ খাঁ যে তাঁর স্বামী, তাই জেনে, পিতৃগৃহে থেকেই, উদ্দেশে তাঁর প্রতি স্ত্রীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন

করতে থাকেন। গোবিন্দ সিংহ তা সইতে পারেন না, কন্যাকে বিধর্মী স্বামীর স্মৃতি মুছে ফেলে দিতে বলেন। কন্যা কল্যাণী স্ত্রীর ধর্ম ও কর্তব্যের কথা পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ-কার্য সমর্থন করেন। এই বিষয় নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি চমৎকার দৃশ্য রচনা করেছেন। সমগ্র নাটকখানিতে গোবিন্দ সিংহ দর্শকদের অমিশ্র সহানুভূতিলাভ করলেও, কল্যাণী সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন না, যদিচ কল্যাণী ঘোষণা করেন স্ত্রীর স্ত্রীধর্ম তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের চেয়েও বড়। রাজনীতিক বিষয়ে যখন মানবতার আবেদন উপস্থিত করা হয়, বাঙালী দর্শক তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সামাজিক কোন ব্যাপারেই তা পারে না।

আমার 'এই স্বাধীনতা' নাটকে একটি উদ্বাস্তু হিন্দু তরুণীর সঙ্গে একটি মুসলমান শিক্ষিত তরুণের প্রণয় দেখিয়েছিলাম, এবং সেই প্রণয় কেন সমর্থনের অযোগ্য হবে সে প্রশ্নও তুলেছিলাম। শেষ-পর্যন্ত দেখিয়েছিলাম যে তরুণীটিই সংস্কারের জাল ছিঁড়তে পারল না। কিন্তু দর্শকরা তাতেই অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। সামাজিক বিষয়ে সে উদারতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেন, যা রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁরা হারান না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহকে আইন-সম্মত করান। বিদ্যাসাগরের সকল দান অধিকাংশ বাঙালী অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে, কেবল বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করবার ওই অধিকার দানের ব্যবস্থাটি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলে স্বীকার করে না। অনেক বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমান হিন্দুকুমারীকে অথবা হিন্দু-বিধবাকে বিবাহ করেছেন। বাঙালী তেমন অনেক মুসলমানকে প্রীতিও জানায়, শ্রদ্ধাও জানায়, তাঁদের নানা গুণের জন্য—কিন্তু সেই হিন্দু-নারীদেরকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে না, যাঁরা মুসলমানকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছেন। মুসলমানরা কি করেন আমার জানা নেই। এমন ঘটনাও আমার জানা নেই যেখানে মুসলমান কোন কুমারীকে অথবা কোন বিধবাকে কোন হিন্দু বিবাহ করেছেন। সে যাই হোক্, সমাজে বিধবা-বিবাহ মাঝে-মাঝে ঘটলেও, হিন্দু পুরুষের সঙ্গে মুসলমান নারীর বিবাহ কিছু-কিছু অনুষ্ঠিত হলেও, হিন্দুর সমাজ ও সাহিত্য বরাবরই প্রতিবাদ করে এসেছে। বিধবা বিবাহ যে

পরিণামে অশুভ হতে বাধ্য বঙ্কিম ও গিরিশ তা চিত্রিত করতে চেয়েছেন, এবং বিধবার শেষ আশ্রয় যে অধ্যাত্ম্য-সান্ত্বনা তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্র তা প্রচার করেন নি, কিন্তু বিধবার পুনরায় বিবাহ করবার অধিকার যে অস্বীকার করবার কারণ নেই, তাও বলেন নি। বলতে পারেন নি সমাজেরই জন্য। পল্লীসমাজ রমার জীবন যেমন করে ব্যর্থ করে দিল, এবং রমেশেরও,—তার চিত্র এঁকে তিনি ব্যথা প্রকাশ করলেন, কিন্তু আর এগুতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথও বেহারী-বিনোদিনীর বিবাহ দিতে পারলেন না 'চোখের বালি' উপন্যাসে। তিনি অবশ্য ওদেরকে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করে বিবাহ অপ্রয়োজনীয় বুঝিয়েছেন।

মুসলমান সম্রাটরা এবং রাজপুরুষরা হিন্দু-নারীদের বিবাহ করেছেন। তেমন কোন-কোন হিন্দু-নারীকে গৌরবও দেওয়া হয়েছে। হিন্দু পাঠকরা এবং নাটকের দর্শকরা তাতে আপত্তি করেন নি এই জেনে যে, তা সমাজের বাইরের ব্যাপার। আবার আয়েষা-মতিবিবিকে অনুপম করে সৃষ্টি করা হয়েছে স্থুল সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য। এই সব সমস্যাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া হয়েছে যে-সব চরিত্র অবলম্বন করে, তা বাসনা-কামনার দ্বারা পরিচালিত নর-নারীকে তাদের পরিণতিতে পৌছে দেবার জন্য আশ্রয় নিয়েছে হয় সন্ন্যাসের, নয় বাসনা-কামনার উর্ধ্বতরস্তরে ওঠবার প্রয়াসের।

নাটকের আরো মুস্কিল এই যে, সব চরিত্র সকলের সাম্নে, মঞ্চের উপরে বাস্তব-সদৃশ দেখাতে হয়। উপন্যাস, পাঠক বা পাঠিকা, শুধু একা-একাই পড়েন না, পড়েন নিভৃতে, নিরালায়। এই নিরালায় পড়া বিষয় মনের পটে যে চিত্র ফুটিয়ে তোলে, পাঠক বা পাঠিকার মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রেক্ষাগৃহে বহু দর্শকের সঙ্গে বসে তা মঞ্চে প্রতিফলিত দেখলে পৃথক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেক নাটক সম্বন্ধে বলা হয় পিতা-পুত্রী এক সঙ্গে বসে দেখতে পারেন না। নর-নারী সমস্যা সমাজের বড় সমস্যা। তাই সাহিত্যে তার প্রতিফলন প্রয়োজন। কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে অলঙ্ঘ্য বলে মেনে নেওয়া হয়, সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিন্দিত হয়। সেখানে ব্যক্তির বিদ্রোহকে তার লজিকাল পরিণতিতে পৌছে দিতে

গেলে তা বহুজন গ্রাহ্য হয় না। তাই আমাদের দেশের ন্যাশনাল লেখকরাও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে আদর্শের আশ্রয়ে টেনে তুলে, একান্ত অযৌক্তিক ভাবেও। সেই কারণেই বিদেশী বাস্তবতাবাদীরা, ব্যক্তিত্ববাদীরা, আমাদের উপন্যাস ও নাটককে দুর্বল বলে থাকেন। কিন্তু যে-সব চরিত্র সাহিত্যের চরিত্র-সৃষ্টি করেন, সেই সব চরিত্রেরও, অর্থাৎ লেখকেরও ত একটা চরিত্র থাকে, বিশেষ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আদর্শজাত প্রেরণাও থাকে। সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টি করবার সময় নিজেদের চরিত্রকে ও অভিজ্ঞতাকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সব সময়ে লোকরঞ্জনের কথা ভেবেই যে পারেন না, তা নয়—নিজেদের অন্তরের উপলব্ধির জন্যও পারেন না।

## ( ১০ )

## নাটক ও সমাজতন্ত্র

ভারতে সমাজতন্ত্র আজও প্রবল রয়েছে। সে সমাজতন্ত্র আদর্শ সমাজতন্ত্রও নয়, এবং আজ সোস্যালিজম বলতে যা বুঝি, তাও নয়। কিন্তু এই অপভ্রংশ সমাজতন্ত্র একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক সোস্যালিজম-এর ফলে, যার মূলে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মাঝে একটা আপোষ করা হয়েছিল। পরবশতার সময় ব্যবহারিক কাঠামোয় কত যায়গায় চির খেল, কত যায়গা তার ধ্বসে পড়ল, আধ্যাত্মিকতা কত রকমে আচ্ছন্ন হোলো ধর্মান্ধতার কুয়াসায়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে। তবু সমাজতন্ত্র টিঁকেই রইল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেল যখন, তখন যাঁরা আবির্ভূত হলেন, তাঁরা জরাজীর্ণ সমাজতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করলেন না, করবার মতো বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি তাঁদের হোল না, যেহেতু পুরাতন সমাজতন্ত্রে যে আধ্যাত্মিকতার সম্পদ ছিল, সেই সম্পদ নিয়েই সমাজকে তাঁরা পুনর্গঠন করবার কাজে লেগে গেলেন। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ সকলেই

তাই করে গেলেন। কেউ ব্যবহারিক প্রয়োজনকে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের চেয়ে, ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাকে সামাজিক প্রয়োজনের চেয়ে, বড় করে দেখলেন না; যদিচ সকলেই সমাজের সাধারণ সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। একা শ্রীঅরবিন্দ কেবল মানুষের দিব্যজন্মের উপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ভাগবত শক্তি-প্রাপ্ত মানুষের চেয়ে বড় নয় বলেছেন।

আবার এ কথাও নিশ্চিত বলা যায় যে, তাঁদের আত্ম-প্রকাশ ছিল জাতির অন্তরের আকুতির প্রকাশ। এই দেশেই তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল বলেই ওই রূপ ধরেই তাঁরা আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদেশে জন্মালে হয়ত তাঁদের প্রকাশ অন্যরূপ হোত। এই যে বিশেষ দেশের বিশেষ রূপ প্রকাশের অনিবার্যতা, এ হচ্ছে বিশেষ ঐতিহ্যের, বিশেষ সংস্কৃতির ফল। সমাজতন্ত্রকে এই দেশ মেনে চলেছে বলে, আপোষ করে চলেছে বলে, একেবারে চূর্ণ করে নতুন সমাজতন্ত্র গড়ে তোলেনি বলে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এ-দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়নি। এ-দেশে তাই ইবসেন হয়নি, A Doll's House তাই এ-দেশে এখনো মঞ্চস্থ হয়নি। আবার এ-দেশের যাঁরা জনগণের বাক্য ভগবানের বাক্য বলে প্রচার করেন, ইবসেনের An Enemy of the Peopleকে ভালো বলতে তাঁদেরও বাধে না। এদেশে কখনো ইবসেনের Heddagabler অভিনীত হবে কিনা, হলেও জন-সম্বর্ধনা পাবে কিনা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেমন কারণ আছে ইউজিন ও-নীলের Under The Elms অথবা Mourning Becomes Electra, বার্ণাড শ'র Mrs. Warren's Profession সম্বন্ধে। অভিনয়ের সম্ভাবনা ও সাফল্য সম্বন্ধে এই সন্দেহ করবার দুটো কারণ রয়েছে—(১) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আর (২) বুদ্ধিবৃত্তির সর্বভৌমত্ব স্বীকৃতির অভাব। শুধু ফর্মের জন্য, আঙ্গিকের জন্য, বুদ্ধি-নির্ভর পরিণতির জন্য, এদেশে নাটক-উপন্যাস কোনদিন রচিত হবে বলে আমার মনে হয় না। এক দেশের যন্ত্র অবিকল অপর আর এক দেশের যন্ত্রের মতো অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু এক দেশের কাব্য-উপন্যাস-নাটক ঠিকভাবে অনূদিতই হতে পারে না—মৌলিক

রচনা অবিকল একরকম ত হতেই পারে না। দুই দেশের লেখকদের মনই যে এক নয়। তাদের সৃষ্টি এক হবে কেমন করে?

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বিশ্বে এক-ধর্মী সাহিত্য-শিল্প কি কখনই গড়ে উঠবে না? নিশ্চিতই উঠবে। যে-যে বিষয়ে মানুষ একমত হবে এক-সংস্কৃতি সম্পন্ন হবে, সে-সব বিষয়ে সকল দেশে একই রকমের কাব্য-সাহিত্য হয়ত গড়ে উঠ্‌বে। তবুও তাদের পার্থক্যও বড় কম থাকবে না। যেমন ভরত-নাট্যে আর পিকিং অপেরায়, কি পূব-এশিয়ার পৃথক-পৃথক দেশের নাট্যরীতির মাঝে মিল আর অমিল দুই-ই দেখা যায়।

## (১১)
## আঙ্গিক ও আদর্শ

কাব্য-সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তু। সে বিশ্বজনীনতা নির্ভর করে না কাঠামোর উপর, রূপের উপর, আদর্শের উপর, সংস্কৃতির বা ঐতিহ্যের উপর। তা নির্ভর করে রস-সৃষ্টির উপর। কেবল সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধরসই সাহিত্যিক সৃষ্টিকে বিশ্বজনীন করতে পারে। সেই সিদ্ধরস পরিবেশন সেকস-পীয়ার যেমন করেছেন, মিল্টন তেমন করেন নি, ইবসেন তেমন করেন নি; শ' তেমন করেন নি। তাই বিশ্বে সেকসপীয়ার ওঁদের সকলের চেয়ে সর্বজনীন, কালিদাসের চেয়েও। কিন্তু এই রসও নানা দেশের বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকমে পরিবেশন করে থাকেন। ধরুন, বীর রস। দিগ্বিজয়ী বীররা যা করেন, তাও বীরত্ব, আবার যে-বীরত্ব প্রকাশ করে দেশ-প্রেমিকরা তাঁদের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করেন তাও বীরত্ব। এখন যে-দেশের লোকরা দিগ্বিজয় মানবতা-বিরোধী মনে করেন, তাঁরা দিগ্বিজয়-বর্ণনাত্মক কাব্য-নাটক দেখে বীর-রসে আপ্লুত হবেন না, হয়ত তাকে বীভৎস রস মনে করবেন, নয়ত বা করুণ-রসে অভিভূত হবেন। আবার এমনও হয় যে, দিগ্বিজয় অন্যায় অসঙ্গত মনে করেও কোন লোক কোন কারণে বীর-রসাত্মক কাব্য-নাটক সৃষ্টি করলেন।

তিনি কিন্তু তাই করবার সময় যুক্তি দিয়ে বীর-রসকে সমর্থন করবার চেষ্টা করবেন, কেবল-মাত্র স্বষ্ট-রসের নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না। তার কারণ, তাঁর নিজের মনে যে সন্দেহ রয়েছে, সংশয় রয়েছে, রস-সৃষ্টির সময়, যুক্তি দিয়ে, নজীর দিয়ে, তা দূর করবার চেষ্টা করবেন। নানা কাব্যে, নানা নাটকে, এই রকম ঝোঁক দেখা গেছে। খুব দক্ষ সমালোচকরা সেই ঝোঁকগুলি ত্রুটি বলে দেখিয়েছেন।

সমালোচনা লেখবার সময় সমালোচক যে-মন নিয়ে লেখেন, সৃষ্টিমূলক রচনার সময় সে-মন তিনি তেমন যুক্তির বশে রাখতে পারেন না। বার্ণাড শ' সমালোচক রূপে নাটকের যে-সব দোষ দেখিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, নিজের সব নাটককে তিনি সেই দোষ থেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তাঁর আবেগ তাঁরও বুদ্ধির সজাগ প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। সেকসপীয়ার-বার্ণাডশ'র দেশে অস্কারওয়াইলড জন্মেছেন, গলসওয়ার্দি জন্মেছেন; কিন্তু ইবসেন গ্যয়টে শিলার জন্মান নি; চেকভও নন, কালিদাসও নন। রাশিয়ায় পুস্কিন গোগল টলষ্টয় তুর্গেনেভ চেকভ গোর্কি জন্মেছেন; কিন্তু সেকসপীয়ার, শ', রবীন্দ্রনাথ জন্মান নি। জার্মেনীর গল্প নিয়ে মার্লো ফাউষ্ট লিখেছেন, আবার ইংল্যাণ্ড-প্রত্যাগত সেই গল্পই গ্যয়টের স্পর্শ পেয়ে মার্লোর প্রয়াসকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। ফাউষ্টের লেখকের হাত থেকে 'লীয়ার' 'হ্যামলেট' বেরোয়নি, বেরিয়েছে 'এগমণ্ট' যা অনন্যসাধারণ হবার দাবী করতে পারে না। নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ফরাসীরা সেকসপীয়ার গ্যয়টে পায় নি। সম্রাট নেপোলিয়ন যখন দেশের পর দেশ জয় করে চলেছেন, হৃদয়ের পর হৃদয় জয় করেছেন, তখন উইমারে গিয়ে গ্যয়টকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পারীতে, নাটককে নবরূপ দেবার জন্য। কিন্তু গ্যয়টের হৃদয় জয় করতে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন।

নাটকের আঙ্গিক আর বিষয়-বস্তু দুই-ই দুটি দেশে কখনো হুবহু এক হয় নি। সব কিছু এক করবার ঝোঁক যাঁদের বেশি, তাঁরা বুঝেছেন বিষয়-বস্তুকে এক করতে হলে সকল জাতির সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং দার্শনিক দৃষ্টি এক করতে হবে। তা করা সম্ভব নয়। তাই কেউ-কেউ বিষয়-বস্তুর

ওপর ঝোঁকটা তত না দিয়ে আঙ্গিকের ওপরই বেশি ঝোঁক দিলেন। আঙ্গিক অবশ্যই বড় কথা; শুধু নাটকের নয়, সকল আর্টেরই। কিন্তু কেন বড় কথা? বড়লোকরা বলেন বলেই কি? তা নয়। আর সত্যিকারের রসিকরা বাজে কথাই বা বলবেন কেন? বলেন যদি, তাহলেই বা বড় বলে গণ্য হবেন কেন? আঙ্গিকের কথা তোলা এবং বলা হয় অভিজ্ঞতা থেকে। দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকের সাহায্য নিয়ে আর্টের বিশেষ বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। এ কথাও বলা যায় যে, বিশেষ-বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্য আঙ্গিককেও বিশেষ রূপ দিতে হয়। কাজেই আঙ্গিকের ওপর ঝোঁক যাঁরা দেন, তাঁরাও মানেন বিষয়-বস্তু এবং নাটকত্ব কম কথা নয়। কিন্তু আঙ্গিক-সর্বস্ব লোকেরও অভাব ঘটল না। দৃশ্যপট নিয়ে, ষ্টেজের আসবাব-পত্র নিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে, চলা-ফেরা-কণ্ঠস্বর নিয়ে, আলো-ছায়া নিয়ে, সঙ্গীত-নৃত্য নিয়ে, নানা বিশেষজ্ঞ নানা মতবাদ সৃষ্টি করলেন।

দৃশ্যপট বাস্তব হবে, কি সাঙ্কেতিক হবে; পোষাক-পরিচ্ছদ ঐতিহাসিক যুগকে প্রতিফলিত করবে কি কাল্পনিক বা আধুনিক হবে; আসবাব-পত্রে নাটকে প্রতিফলিত কালের ছাপ কতটা থাকবে; চলা-ফেরা, অঙ্গ-সঞ্চালন, কণ্ঠস্বর কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে; গান, সুর, নাচ থাকবে কি থাকবে না; থাকলেও তাদেরকে কতটা দায়িত্ব দিতে হবে; আলো কখন কতটা থাকবে বা থাকবে না, মঞ্চ স্থিতিশীল হবে কি হবে না, মাইক্রোফোন আর লাউড-স্পীকার ব্যবহার করা হবে কি হবে না, এই সব নিয়ে মীমাংসা দাবী করে বিশেষজ্ঞরা, নাট্যশালাকে ও নাটককে আক্রমণ করলেন। সবাই হলেন অথরিটি, কেবল নাট্যকারের মতই রইল উপেক্ষিত। তাঁর কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য নানা বিশেষজ্ঞ কোমর বেঁধে এগিয়ে এলেন। যাঁর যত কেরামতি আছে, সবই প্রয়োগ করে নাটককে আজব করে তুল্লেন।

ছোট-খাট নাট্যকার ত তলিয়েই গেলেন, সেকসপীয়ারও অমৃত-লোক থেকে ব্যথায় বিরক্তিতে আবার মর্ত্যে নেমে আসতে চাইলেন। কিন্তু পথ পেলেন না। যে সোপান বয়ে তিনি অমৃত-লোকে উঠেছিলেন, সে সোপান তখন ধ্বসে পড়েচে। কেবল মর্ত্যের ইবসেনই সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে

বিশেষজ্ঞদের বিদায় দিয়ে নাট্যকারকে আবার থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা দিলেন ; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দমবার পাত্র নন। তাঁরা রিয়ালিজম্, রোমান্টিসিজম্, ইম্প্রেসনিজম্, এক্সপ্রেসনিজম্, ক্লাসিজিম্, ন্যাচুরালিজম্ প্রভৃতি বুলির বুলেট চালিয়ে চালিয়ে নাট্যকারদের ঘায়েল করতে চাইলেন, প্রাণে মারতে না চাইলেও। বহু নাট্যকার ঘায়েল হয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন, কিন্তু ইবসেন, বার্ণার্ড শ', ষ্ট্রীণ্ডবার্গ টোলারের মতো নাট্যকাররা পাল্টা শেল বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁরা অসাধারণ শক্তিমান বলেই আত্মরক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু ছোটরা আত্ম-সমর্পণ করলেন। ছোটদের নাটক জাত হারিয়ে স্কৃপ্টে পরিণত হোলো। তখন নানা বিশেষজ্ঞকে সংযত রাখবার জন্য সৃষ্টি হোলো ডিরেক্টর।

এই ডিরেক্টর সকলেই-কিছু সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। তাই তাঁদের অনেকেই নাটককে নানা মুখে নিয়ে গেলেন। গর্ডন ক্রেগ, এলেন টেরীর ছেলে হয়েও, বল্লেন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও, এবং লিখিত নাটক ছাড়াও, মঞ্চে নাটকের রূপ দেওয়া যায় ; পাপেট ড্রামা অথবা কার্টুন ড্রামা হবে সত্যিকারের শিল্প-সৃষ্টি। রাইনহার্ড এলেন আর একজন ডিক্টেটর-ডিরেক্টর। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন জার্মান, সেই হেতু তাঁর ডিক্টেটরশিপ হলো যেমন নিখুঁত, তেমন সর্ব-পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীতে থিয়েটার যত রূপে প্রকাশ পেয়েছে, সব রূপের ভিতর দিয়ে তিনি নাটককে ফুটিয়ে তুল্লেন। পৃথিবী অবাক হয়ে তাঁর সৃষ্টি দেখতে লাগল। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হোল না। পুরাতনের মাঝে যে নব-সৃষ্টির বীজ আছে, লোকে তা ভাবতে শুরু করল। ইবসেন যে-বেড়া ভাঙ্গাকেই নাটকের সার্থকতা বলেছিলেন, তার নতুন একটা অর্থ নাটুকেদের মনে উদিত হোলো। রাইনহার্ড নাটকে ও থিয়েটারে জীবন-রসের বান বহিয়ে দিলেন। অভিনয়ের আর্টকে তিনি ফুটিয়ে তুল্লেন নতুন রকমে। তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা ইউরোপে-আমেরিকায়, মঞ্চে ও পর্দায়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ত্রুটি তাঁদেরও ধরা পড়ল। এলেন স্ট্যানিস্লাভস্কি নতুন বাণী নিয়ে, আর্টের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে। তাতে রইল না একদেশদর্শিতার দোষ। তাঁর পরিচালনায় মস্কৌ আর্ট থিয়েটার বিশ্বের নাট্যামোদীদেরকে বিস্ময়ে

অভিভূত করে দিল। একদা মঞ্চে ব্যর্থ হয়েছিল চেকভের যে সি-গাল্, তাকেই তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য দিয়ে মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিজয়-বৈজয়ন্তী করে তুল্লেন। সি-গাল্ হোলো মস্কৌ আর্ট থিয়েটারের প্রতীক। কিন্তু গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স' একই সঙ্গে তাঁর মনোযোগ পেল, এবং তাকে সি-গাল্-এর চেয়ে কম মনোরম করে তুল্লেন না তিনি। তাঁর সহযোগী আর শিষ্যরা সকলেই তাঁর মনের দৃষ্টি দিয়ে নাট্যশিল্পকে দেখতে রাজী হলেন না। তাঁরা নতুন পথে পা বাড়ালেন। তাঁদের মাঝে মায়ারহোল্ড সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত হোলো সোবিয়েৎ রিপাবলিক। ইউরোপের নাট্যশালা ভেঙে গেল। নাটকের প্রাচীন আদর্শ চূর্ণ হয়ে গেল। ইউরোপে-আমেরিকায় চাহিদা হলো যুদ্ধের সময়কার জীবনের নাটক। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের চিত্র মোপাসাঁর গল্পে যে-রূপ পেয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক সেই রূপ প্রতিফলিত করতে পারল না, গল্প-উপন্যাসও না। রেমারেকও মোপাসাঁ হতে পারলেন না।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই আর একটা ধ্বংসাত্মক প্রকাশ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার চেয়ে ভিন্ন রকমের সংঘাত, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের সূচনা, জনগণের সুপ্তিভঙ্গ। সোবিয়েৎ গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে জনগণের কথাই বড় হয়ে উঠ্‌ল। কমিউনিজম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করল, এবং মানবের যৌথ-প্রয়াসকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চাইল। সোবিয়েৎ সরকার মানব-সংস্কৃতিকে তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চাইলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করা হলো, থিয়েটারও রাষ্ট্রায়ত্তীকৃত হোলো। বলা হোলো সব কিছু দেখতে হবে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়ে, সঙ্ঘ-শক্তিকে স্বীকার করে। চেকভের নাটক বর্জন করা হোলো। স্ট্যানিস্লাভস্কিকে বলা হোলো মস্কৌ আর্ট থিয়েটারকে নতুন প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য নিয়োগ করতে। সোবিয়েতের প্রথম সাংস্কৃতিক মন্ত্রী লুনাচারস্কি, যিনি নিজেও নাট্যকার ছিলেন, স্ট্যানিস্লাভস্কিকে নাটকের পর নাটক এক্সপেরিমেন্ট করবার অবসর দিলেন। বার বার তিন-বার সেই অনুপম নাট্য-শিল্পী নূতন নূতন নাটকের যে রূপ দিলেন, সোবিয়েৎ সরকারের তা পছন্দ

হোলো না। স্ট্যানিস্লাভস্কি নাট্যশালা থেকে অবসর নিলেন ; কিছুদিন পরে পৃথিবী থেকেই। সোবিয়েৎ সরকার কোনদিন তাঁর অসম্মান করেন নি। কিন্তু নাটককে তাঁরা নতুন রূপ দিতে চাইলেন। পুস্কিন, গোগল, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি, টুর্গেনেভ রইলেন কীর্তি হিসেবে, প্রেরণা হিসেবে নয়। দেশে-দেশে ওর নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কোথাও নাটুকেরা কমিউনিজম প্রভাবান্বিত হলেন, কোথাও তাঁরা নাটকে বস্তুতান্ত্রিক বিষয় অবাঞ্ছনীয় মনে করে নাটককে পুনরায় কাব্যধর্মী করতে চাইলেন। কিন্তু সাধারণত সর্বদেশের নাটুকেরা বস্তুতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বেশি। যুদ্ধ, অভাব, দৈন্য, জনগণের নানা দুর্বলতা হয়ে উঠল নাটকের বিষয়বস্তু। বরাবরই ওসব কিছু-কিছু ছিল ; কিন্তু তা ছিল অধিকাংশই ব্যতিক্রম হিসেবে। সাধারণ নাটুকেরা প্রথম যুদ্ধের পর থেকে বাস্তববাদী হয়ে উঠলেন। না হয়ে উপায়ও ছিল না। কিন্তু ওর প্রতিবাদ করবার মতো নাটুকেরও অভাব হয়নি। কার্লকাপেক, ইয়েটস্, ও-কেসি, টি এস এলিয়ট, জঁা ককতো, জঁা পল সাত্রে প্রভৃতি অতীতকে নতুন রূপ দিতে লাগলেন।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে আজকার এই বিংশ শতকের মধ্যাংশ অতিক্রম করেও নাটক নানা অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েও, নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেও, আজও রোমান্টিসিজমকে সমগ্রভাবে বর্জন করতে পারে নি। তা যেমন পারেনি, তেমনি ভারতের ও পূব-এশিয়ার প্রাচীন নাটক যে জন-সংস্রব স্থাপন করতে পেরেছিল, তাতেও সফল হয়নি।

মলেয়ার, রেসিন, কর্নেইল, ছোট-ডুমা, ব্যালজাক, জোলা যে-শ্রেণীকে সচেতন করবার জন্য নাটক লিখতেন—আজ পৃথিবীতে সেই শ্রেণীর নায়কত্ব নড়বড়ে হয়ে গেছে। এই লেখকরা যে সম্রাটদেরকে খুসি করবার জন্যই, অভিজাতদের আনন্দ দেবার জন্যই নাটক লিখতেন, এমন কথা সত্য নয়। গ্যয়টে রাজকর্মচারী ছিলেন, কিন্তু আত্মবিক্রয় করেন নি। মলেয়ার, জোলা, ব্যালজাক ফরাসী আকাদেমীর সদস্য হবার লোভে নিজেদেরকে খর্ব করেননি। অস্কারওয়াইল্ড তাঁর সমাজের কাছ থেকে বায়রণের অনুরূপই ব্যবহার পেয়েছিলেন, টোলার দেশত্যাগ করেও প্রাণ বাঁচাতে পারেন নি।

কাজেই একথা নিশ্চিত করে বলা চলে যাঁদের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা নাটক লিখে-ছিলেন, কেবল তাদেরকে খুসি করবার জন্যই নাটক তাঁরা লেখেন নি। তাঁরা নাটককে মর্যাদা দেবারই চেষ্টা করেছেন এবং দিয়েছিলেনও তা। বার্ণার্ড শ' ত স্পষ্টই বলেছেন যে, ইচ্ছে করেই তিনি কতকগুলি অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন যেগুলিকে তিনি Plays Unpleasant বলে পরিবেশন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দর্শকদের কেবল খুসি রাখাই নাট্যকারের কাজ নয়; ব্যথা দিয়ে তাদেরকে সমাজ-সচেতন আত্ম-সচেতন করাও নাট্যকারের অন্যতর কাজ। জোলা, ইবসেন আগেই ও-কাজ করে গেছেন। পরবর্তীরাও করেছেন, এখনও করছেন। দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিকরা যত তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন, নাটকের ভিতর দিয়ে মানুষকে প্রতিফলিত করে তাও ইউরোপের নাট্যকাররা পরখ করে দেখেছেন—বার্গস˚, রুশো, ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন, কারু মত বাদ যায়নি। উনবিংশ শতকের নাটক একদিকে নাট্যকারদের স্বাধীনতার যেমন পরম প্রকাশ, তেমন ডিরেক্টর-ডিক্টেটরদের, য়্যাক্টর-ম্যানেজারদের, ডিজাইনার ও কম্পোজারদের, আর্কিটেক্‌ট্‌দের, পেইণ্টারদের, এবং আলো ও শব্দ-বিজ্ঞানীদেরও নাট্যশালায় আধিপত্য স্থাপনেরও পরিচয়। কিন্তু সব করেও রাজধানীর ওই নাটক, অভিজাতদের আর শহুরেদের ওই নাটক, কোনমতেই গণনাট্য হয়ে উঠল না; শিক্ষিতদের, অর্ধশিক্ষিতদেরই নাটক হয়ে রইল।

সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ষ্টানিস্লাভস্কি, চেকভ আর গোর্কি দিয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন শুধু রাশিয়াতেই নয়, সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায়। তখনকার সেই অভ্যর্থনা নাটককে কতটুকু দেওয়া হয়েছিল, আর কতখানি দেওয়া হয়েছিল ষ্টানিস্লাভস্কির অনুপম শিল্প-শৈলীকে আর অভিনেতৃদের অভূতপূর্ব অভিনয়কে, তা ঠিক করে আজ বলা শক্ত। সোবিয়েৎ প্রতিষ্ঠার পর ষ্ট্যানিস্লাভস্কিও তাঁর আগেকার শিল্প-শৈলী দিয়ে আসর জমাতে পারলেন না।

## নাটক ও জনসংশ্রব

আমাদের দেশে জাতিভেদ ছিল, অচ্ছুৎ ছিল, সংস্কৃত ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য ছিল না। আমাদের নাটকও রাজসভাতে প্রতিপালিত হয়েছিল, এবং রাজা-রাজড়াদের বিলাসের চিত্র প্রতিফলনে বিশেষ একটা রূপও পরিগ্রহ করেছিল। লিখিত নাটকের কথাই বলছি আমি। কিন্তু এই লিখিত নাটকগুলি রাজপুরীতে লালিত পালিত ও বর্ধিত হলেও যে-রসকে অবলম্বন করত, তা সর্বজনীন, যেমন সর্বজনীন ছিল পরবর্তী কালের ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের রাজসভায় লালিত পালিত ও বর্ধিত নাটকগুলি।

প্রাচীন ভারতীয় নাটক সংস্কৃতে রচিত হলেও তাতে প্রাকৃতকেও স্থান দেওয়া হোতো। বলা হয়, নারী আর শূদ্রকে ভারতবাসী দেব-ভাষা ব্যবহারের অযোগ্য মনে করত বলেই নাটকের ওই চরিত্রগুলির মুখে প্রাকৃত ভাষা দেওয়া হোতো। কিন্তু গার্গী-মৈত্রেয়ী এবং বেদ-রচয়িত্রীদের কথা নাট্যকাররা জানতেন। নাটকেই নাট্যবিচারের ভার নারীকেই দেওয়া হয়েছে, তারও দৃষ্টান্তে রয়েছে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে। ভারতে তখন বৌদ্ধ-বিপ্লবও বয়ে গেছে। প্রাকৃতে গল্প কাব্য দর্শন বিজ্ঞান নাটক প্রকাশ পেয়েছে। তারপরও নারীকে আর শূদ্রকে হীন বোঝাবার জন্যই সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের সাহায্যে ওই চরিত্রগুলি রূপায়িত করা হয়েছে মেনে নিতে বাধে। হয়ত সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠতর ভাষা, তাই বোঝাবার, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই প্রধান চরিত্রগুলির মুখে সংস্কৃত ভাষা দেওয়া হোতো; নয়ত হোতো দেবভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও নাটকের সঙ্গে জন-সংশ্রব স্থাপন করবার প্রচ্ছন্ন অভিলাষের ফলে। কিন্তু প্রধানত নিরক্ষর দেশে লিখিত-নাটক জন-মনে প্রভাব বিস্তারের বিশেষ অবসর পেয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। দৃশ্য-নাট্য তা করেছে। আর তা করেছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কাব্য ও চরিত্র নিয়ে। বুদ্ধের ও বৌদ্ধ-কাহিনী নিয়ে প্রাকৃতে লেখা নাটক যে কোন কাজই করেনি, এমন কথা মনে করবারও কোন কারণ নেই।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও দর্শন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরে কি করে প্রসার লাভ করল? দুটি জবাব আপনি থেকেই মনে আসে। তা হচ্ছে (১) ধর্মের, আর (২) নাটকের মাধ্যমে। তা হলে মানতে হয় জাতিভেদ এ-দেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই ধর্মাচরণের অধিকার দেয়নি, অথবা ব্রাহ্মণের ধর্মকে অব্রাহ্মণের ধর্মের চেয়ে, নারীর ধর্মকে নরের ধর্মের চেয়ে পৃথক করেনি। অচ্ছুৎ ছিল, এখনও আছে। এই অচ্ছুৎরাও ধর্মানুষ্ঠান পালন করত। সে ধর্মানুষ্ঠানেও পৌরোহিত্য করতেন এবং এখনও করেন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাঁদেরকে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণরা অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। কিন্তু ওই অচ্ছুৎদের ধর্মানুষ্ঠান বর্ণ-হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠান থেকে পৃথক যদি হয়, তাহলে ধর্মের মাধ্যমে যে সর্বস্তরে সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে, তাও মেনে নেওয়া যায় না। তাহলে বাকি থাকে নাটকের মাধ্যম।

নাটকের বাহন নট-নটীরা মন্দিরে যখন অভিনয় করতেন, তখন তাঁরা অচ্ছুৎ ছিলেন না এ-কথা মেনে নেওয়া চলে। তাঁদের মাঝে ব্রাহ্মণও ছিলেন, অব্রাহ্মণও ছিলেন। এলিজাবেদীয় আমলেও ইংলণ্ডের অভিনেতৃরা শহরের সীমানায় স্বাধীনভাবে বাস করবার অধিকার পেতেন না, কোন অভিজাতের চরণাশ্রিত থাকতে হোতো। তার আগে গীর্জায় যে অভিনয় হোতো, তাতে অংশগ্রহণ করতেন যাজক-পুরোহিতেরা। পথের চৌ-মাথায় পরবর্তীকালে যে-অভিনয় হোতো, তা পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হোত না। তার অভিনেতৃরা নানা গিল্ডের ব্যবসায়ীরা, সমাজে অপাংক্তেয় থাকতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের মন্দিরে যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরা জীবন উৎসর্গ করে দিতেন দেবতার পায়ে। নাট্যানুষ্ঠানই ছিল তাঁদের জীবনের ধর্ম। বাইরে যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরাও একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হতেন, জীবিকার জন্য তাঁরা জমি-জমা পেতেন। নাট্যাভিনয় তাঁদের ছিল স্বধর্ম। পল্লীতে-পল্লীতে হাটে-বাটে যে শিল্পীরা একক বা দলবদ্ধভাবে অভিনয় করে বেড়াতেন, তাঁরা সকলেই সমাজের শ্রদ্ধা পেতেন। পরবর্তীকালের আউল-বাউল-উদাসীরা শুধু স্বীকৃতিই পেতেন না, গৃহস্থদের সেবাও পেতেন। তার কারণ তাঁরা সকলেই অভিনয়-শিল্পকে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ধর্ম করে নিয়েছিলেন। আর তাঁদের সে শিল্প ছিল মূলত মানবধর্মী। তাঁরা যে নাটক অভিনয় করতেন, তার বিষয়-বস্তু রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী

থেকেই নেওয়া হোতো। রামায়ণ-মহাভারত হিন্দুধর্ম প্রচার করেনি। হিন্দুর ধর্ম রামায়ণ-মহাভারত থেকে আদর্শ আহরণ করে যে সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে, সেই সংস্কৃতিই ছিল মানবধর্মী। সেই মানবতার ধর্ম উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে যেমন বুদ্ধের মানবতার মুক্তির বাণীতে, তেমন হাজার বছরের সংঘাতের ও সমন্বয়ের ফলে। স্বর্গ নিয়ে, মর্ত্য নিয়ে, পরলোক নিয়ে, ইহলোক নিয়ে, মানুষের ও মানবাত্মার মুক্তি নিয়ে, হাজার বছরকাল নানা মতবাদের যে সংঘাত ভারতবর্ষে হয়েছে, তার ফলে ধর্মান্ধতা থেকে, রিলিজিয়সিটি থেকে, ভারতবর্ষ অপরের তুলনায় অনেক বেশি মুক্তি পেয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানের বাধ্য-বাধকতা পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কম। চার্চের বাধ্যবাধকতা ভারতবর্ষে নেই। পূজা করা না করা, মন্দিরে যাওয়া না যাওয়া, চিরদিনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ব্যষ্টির অভিপ্রায়ের উপর। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মের রঙ দেওয়া হয়েছে ধর্মের কথা ভেবে নয়, সমাজেরই কথা ভেবে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বুদ্ধ নিজে বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দুই ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন বৈদিক ধর্মে ব্রাহ্মণরা যে কলুষ সঞ্চয়িত করেছিলেন তারই বিরুদ্ধে, মানুষের মন ঘোলাটে করে ফেলবার জন্য যে আচার-নিয়মের জঞ্জাল জড়ো করে তুলেছিলেন, তারই যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে। জ্ঞান যে শুধু অন্ধ মানুষকে আলো দেবে তাই-নয়, মাকড়সার মত নিজে জাল বুনে সেই জালে আবদ্ধ থাকবার দুর্বুদ্ধি থেকে মানুষকে মুক্তিও দেবে, এবং শক্তিও যোগাবে। পরখ করবার, যাচাই করবার, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার সাধনাই ছিল বুদ্ধের সাধনা। তা কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতি থেকে পৃথক নয়। তাই পরবর্তী গোঁড়া-বৌদ্ধরা তাকে বল্লেন হীনযান, আর বুদ্ধের দেবত্বকে করলেন মহাযান। কিন্তু বুদ্ধের সাধনালব্ধ জ্ঞানকে হিন্দু যেমন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অভিন্ন না দেখে তাকে গ্রহণ করে নিল, তেমন বুদ্ধকে অবতার রূপে স্বীকার করে নিয়ে মহাযানকেও স্বীকার করে নিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতে লুপ্ত হোল না; বিদ্রোহী গৌতমকে, তাঁর বিদ্রোহকে, স্বীকার করে নিয়ে ভারতবর্ষ নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুললো। বিদ্রোহের অধিকারও তাই স্বীকৃতি পেল। আর সেই স্বীকৃতিই হিন্দুকে মৃত্যুঞ্জয় করল। পুত্রের যৌবন পেয়ে প্রাচীন-ভারত নব-যৌবনের স্বজন-

সামর্থ্য দিয়ে নব-নব দর্শন সৃষ্টি করল; কাব্য, শিল্প, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবতার প্রচারণা ভারতের নৈতিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ দলে দলে বিকশিত করল। ভারতের বিশাল জন-সমুদ্র, হিন্দু ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী, সহস্র বর্ষের মন্থনের ফলে অমৃতের উৎস বলে প্রমাণিত হোলো।

তখনই সন্ধান পাওয়া গেল জ্ঞানামৃত কেবল মন্দিরের-প্রাসাদের অধিবাসীদের পুঁথিতে সঞ্চিত ছিল না, নিরক্ষরদের মনে-মনে বিন্দু-বিন্দু করে তা জমে উঠে ভাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। বৌদ্ধ প্লাবনের পরবর্তীকালের পল্লী-গীতি, গাথা, সাধু-সন্ত, আউল-বাউলের রচনা থেকেই তা বোঝা যায়।

অনেকে মনে করেন পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন না করলে কাব্য-নাটক বোধগম্য হয় না। তাঁরাই কিন্তু আবার বেদকে অপৌরুষেয় বলেন যাঁরা, তাঁদেরকে উপহাস করেন। পুঁথিগত বিদ্যা যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা, এ-কথা বলেন গ্রন্থকীটরা, বিদ্যা-ব্যবসায়ীরা; মানবজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকেরা তা বলেন না। বাল্মীকি তুলসীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন না। তাঁরা ভাষা সৃষ্টি করেছেন, কাব্য সৃষ্টি করেছেন। কবীর, নানক, দাদু, ঠাকুর রামকৃষ্ণ টোল-চতুষ্পাঠীতে ন্যায়-দর্শন পড়েননি, কিন্তু জীবন-দর্শনে এবং তার বিশ্লেষণে ভুল কোথাও করেননি। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় জ্ঞান পুঁথির পাতায় অঙ্কুরিত হয় না। পুঁথি জ্ঞানকে সঞ্চয় করে রাখে, টীকা করে, ভাষ্য করে; অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতও করে। শিক্ষিত আর জ্ঞানী, প্রমোদ-অন্বেষী আর রসিক, এক কথা নয়।

জ্ঞানের অঙ্কুর মানুষের সহজাত বস্তু। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে বিকশিত করে। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-দারিদ্র্য, অধিকার-অনধিকার, প্রতিষ্ঠা-সর্বরিক্ততা, পথ-পাথেয়, মত-অমত, সাফল্য-ব্যর্থতা মানুষের মনে মনে অবিরত যে সংঘাত সৃষ্টি করে, তাই হচ্ছে জীবনের অভিজ্ঞতা। সেই সংঘাত যে আবেগ সৃষ্টি করে তাই থেকে উৎপন্ন হয় ভাষা, কাব্য, সংগীত—মিথুনরত ক্রৌঞ্চযুগলকে নিষাদাক্রান্ত দেখে বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে যা বেরিয়েছিল। যে-মানুষ প্রথম গান গেয়েছিল, যে-মানুষ প্রথম নেচে উঠেছিল, বর্শার ডগা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে যে মানুষ প্রথম

চিত্র অঙ্কন করেছিল, সে-মানুষ শিক্ষিত ছিল না। লিখিত না হয়েও যে ব্যালাড লোকের মুখে-মুখে ফিরত, যুগে-যুগে নিরক্ষর ঠাকুমারা কেবল কথা দিয়ে রূপকথার যে মায়ালোক সৃষ্টি করতেন, পাহাড়ের উপত্যকায়, পল্লীর ক্ষেতে-খামারে, গৃহস্থদের পাল-পার্বণে যে-নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হোতো, নদীর বাঁকে-বাঁকে মাঝি-মাল্লার কণ্ঠ-নিঃসৃত যে সঙ্গীত কূল-অকূল এক করে দিত, উদাসী আউল-বাউল যে-গান দিয়ে আকাশ-মৃত্তিকার পার্থক্য ভুলিয়ে দিত, তাই থেকেই হয়েছে সাহিত্য কাব্য শিল্পের সৃষ্টি। সর্বোত্তম সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আজকার লেখকরা তারই সন্ধানে রত। সেই সাধারণ মানুষের সাহিত্য ও শিল্প, যুক্তিবাদের ও মতবাদের সাহিত্য ও শিল্পের চেয়ে, আজকার সাহিত্যিকদের ও শিল্পীদের মন আকর্ষণ করেছে বেশি। নাটকেও তাই।

চারশ বছর রোমান্টিসিজম, রিয়ালিজম, একসপ্রেসনজিম, ইমপ্রেশনিজম, সিমবলিজম, সার-রিয়ালিজম প্রভৃতি অসংখ্য ইজম-এর ভিতর দিয়ে ইউরোপের নাটক, আমেরিকার নাটক, আজ আবার কাব্যধর্মী হতে চাইছে। কোন-ইজম তাকে স্যাশনাল করতে পারেনি। আমেরিকানরা বলছে নাটক 'ফোক্‌সি' হওয়া চাই। জার্মান বারটলট ব্রেকট এপিক থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কল্পনার পরশ না পেলে রিয়ালিটি মোহনও হয় না, মহানও হয় না। তিনি তাই নানা-যুগের 'ইজম' থিয়েটারকে যে শিল্প ও শিল্পী দিয়ে গেছে তাও নিজস্ব করে নিতে চেয়েছিলেন, আবার বর্তমান যুগেরও দাবী মিটিয়ে নব-নাটকও গড়ে তুলেছিলেন। নাটকে তিনি ফিল্‌ম্‌, পোষ্টার, ষ্ট্যাটিসটিকাল চার্ট, নাচ, গান সবই ব্যবহার করতেন। ফরাসী নাট্যকার জাঁ পল সাত্রে মানুষের মনের রূপান্তরের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নাটক মোটের উপর রোমান্টিসিজমকে বর্জন করতে পারেনি। অবশ্য নাটুকেরা বলছেন তাঁরা নিও-রোমান্টিসিজম বলে এমন এক রীতি আবিষ্কার করেছেন, যা কল্পনার আলো ঢেলে বাস্তবকে এমন রূপ দেবে যা সমগ্র মানবকে কেবল আনন্দই দেবে না, এগিয়েও দেবে।

আমরা যাত্রার পালা দেখতে অভ্যস্ত, কীর্তনের পালা শুনতে অভ্যস্ত, কবি দলের দ্বৈত-নাটক, কথক অভিনীত একক-নাটক শুনতেও অভ্যস্ত। আমরা

ও-সব শুনি কানে, দেখি কল্পনায়। আমাদের জনগণও তাই করে। নাটক আর সিনেমা আমরা দেখি-শুনি, কল্পনাকে কাজে লাগাই কম। আমাদের পালা-যাত্রায় সংলাপ থাকে, নাচ-গানও থাকে; কীর্তনে একই লোক সকল-চরিত্রের সংলাপ বলে, গানও সেই গায়, সমবেত গানও হয়; কীর্তনীয়া একাই ট্রাজিক কমিক অভিনয় করেন, নৃত্যও করেন। আমাদের কথকতায় কথকের সঙ্গে কেউ থাকে না। একাই তিনি অভিনয় করেন বিভিন্ন নর-নারীর ভূমিকা, রাজা-রাণীর, সেনাপতি-সৈনিকের, প্রভু-ভৃত্যের, সকল চরিত্র। সব গান এবং সকলের গান তিনি একাই গেয়ে থাকেন। মঞ্চ কারুরই আবশ্যক হয় না, কেবল যাত্রায় পোষাক ব্যবহৃত হয়, কীর্তন-কথকতায় তাও হয় না। জনগণ সবই বুঝতে পারে। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে পারে, ক্লাসিকাল গানও বুঝতে পারে, পরিবেশও কল্পনা করতে পারে। তারা হাসে, আনন্দ পায়, মনকে কলুষমুক্ত করে।

আমরা যে-সব পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাটক লিখি, নানা পল্লীতে-পল্লীতে সৌখীন নাটুকে দলরা সেগুলি অভিনয় করেন, যাত্রার দলগুলিও আমাদের কোন-কোন নাটক সর্বত্র বিনা মঞ্চে, বিনা দৃশ্যপটে, অভিনয় করে ফেরেন। শহরের লোকেরা যেমন অভিভূত হন, পল্লীর নিরক্ষর নিঃস্ব লোকেরাও তেমনই অভিভূত হন। এ-থেকে বলা যায় আমাদের থিয়েটার আর কিছু না-হোক ন্যাশনাল হয়েছে, এবং কিছু-কিছু বিদেশী যখন আমাদের নাটক ও তার অভিনয় দেখে আনন্দ পেয়েছেন, তখন বাইরের লোকের মন অভিষিক্ত করবার মতো রস আমাদের নাটুকেরা অবশ্যই সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আমরা অনেক বিষয়ে পিছিয়ে থাকলেও জন-সংযোগ হারাইনি, যদিও আমরা তথা-কথিত ফোক-প্লে লিখিনি, থিয়েটারের জন্যই নাটক লিখিচি। আর সে-সব নাটক জনগণেরই চিত্তে সাড়া দিয়েছে।

নাটকের জন-সংশ্রবের দায়িত্ব সম্বন্ধে রোমারোলাঁ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি পিপ্‌লস্ থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পিপ্‌লস্ থিয়েটারের স্বধর্ম প্রধানত এই হওয়া চাই :—

(ক) দর্শকের চিত্তরঞ্জন। সাধারণ দর্শকের চিত্তরঞ্জন করবার জন্য

নাটকের বৈদগ্ধগুণ যদি কিছু ক্ষুণ্ণ করতে হয়, পিপ্‌লস থিয়েটারকে তাও করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই, তিনি বলেন, আর্টিষ্টের দৃষ্টিই একমাত্র কথা নয়, দর্শকদের দৃষ্টিও আর একটা কথা। পিপলস্ থিয়েটারের নাটক স্ফুর্তিকার-জনক নিশ্চিতই হবে না, কিন্তু প্রমোদ-ধর্মী অবশ্যই হবে।

(খ) পিপ্‌লস্ থিয়েটারের দ্বিতীয় প্রয়োজন প্রাণবত্তা। দর্শকদেরকে তাতাতে হবে, মাতাতে হবে, অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রায় একশ বছর আগে থেকে ইউরোপের নানা শিল্পী লক্ষ্য করেছেন আর্ট পরিবেশনের নাম করে নাট্যশালার অভিনয়কে একঘেয়ে, বৈচিত্র্যবিহীন এবং যন্ত্রবৎ করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে রেডিও আর সবাক চিত্র এই ত্রুটি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। নাট্য-শালা এদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়ে তার বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পিপ্‌লস্ থিয়েটারকে যেমন নাটকে প্রাণসঞ্চার করতে হবে, তেমন নাট্য-শালাতেও প্রাণবত্তা এনে দিতে হবে।

(গ) পিপ্‌লস্ থিয়েটারকে শ্রোতৃদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে কাজে এবং চিন্তায়। আর্ট উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না, এমন অসার উক্তি পিপল্‌স্ থিয়েটারকে অগ্রাহ্য করতে হবে। মানুষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা-সম্পন্ন করে উর্দ্ধতর স্তরে তুলে দেওয়াই পিপলস্ থিয়েটারের কাজ।

আধুনিকতম নাট্য-প্রযোজক বার্টোল্ট ব্রেক্‌টও মনে করতেন মানুষকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করাই আধুনিক থিয়েটারের কাজ—

The main thing is to teach the spectator to reach a verdict.

বিখ্যাত নাট্য সমালোচক এরিক বেণ্টলি রোলাঁ আর ব্রেক্টের মত উদ্ধৃত করে বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলেছেন :—

The political theatre is not solely of political interest. It is through politics that the modern theatre occasionally becomes a Peoples' Theatre. The political shade of the message is a matter for a political discussion. What is

of more interest here is the fact that political theatre can, by touching the spectator's everyday interests, rouse him from his torpor till he becomes alert, inquisitive, and then pleased, angry, contemptuous, or whatever, according to plan.

বেণ্টলী তাঁর বক্তব্য বোঝাতে শুধু নাটকে রাজনীতির স্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু আসলে সকল নীতির কথাই বলতে চেয়েছেন। নাটকে যাঁরা রাজনীতিকে বা সমাজনীতিকে বা অধ্যাত্মনীতিকে স্থান দেন, তারা নিজেরা রাজনীতিক বা সামাজিক বা আধ্যাত্মিক নায়ক হতে চান না; মিনিষ্টার, আইন সভার সদস্য হবার অভিপ্রায়েও তাঁরা তা করেন না। তাঁরা শুধু চান, ব্রেক্ট-এর কথায়,—to teach the spectator to teach a verdict. বাংলা থিয়েটার এত দিন এই কাজই করে এসেছে। গিরিশ থিয়েটারকে এই পথে তুলে দিয়েছেন, যদিচ আজ এমন সব রাষ্ট্রনায়ক উদ্ভূত হয়েছেন, যাঁরা পিপ্‌লস্‌ থিয়েটার শব্দ শুনলেই আঁতকে ওঠেন, এবং মনে করেন ওই থিয়েটারের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে পারলেই জাতির হিত হবে। ইতিহাস যুগে যুগে এত মূর্খ আর মূঢ় লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অপব্যবহার করতে দেখেছে যে, আজকার দিনে সে তাদেরকে উপেক্ষা করে পিপলস্‌ থিয়েটারকেই প্রয়োজনের ও গৌরবের স্থান দিয়েছে।

নাটক এবং সাহিত্য যখন মানুষের চিত্তজয়ে ব্যর্থ হচ্ছিল জোলা তখনই বলেছিলেন নাটককে ন্যাচুরালিজম-এর আশ্রয় নিতে হবে, উপন্যাসকেও। এই ন্যাচুরালিজম কিন্তু রিয়ালিজম নয়, ফটোগ্রাফ নয়—এতে নাট্যকারের অংশ অবশ্যই থাকবে। এই ন্যাচুরালিজম সকল বড় নাট্যকারের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। ছোটরা একেই খর্ব করেছেন রোমান্টিক অথবা মেলোড্রামাটিক করে।

বিগত জুলাই মাসে সোবিয়েতে গিয়ে অনেকগুলো অপেরা দেখে এসেছি। সেগুলোর মাঝে বায়রণের গল্প, ভিক্টর হুগোর গল্প, আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের

গল্পও আছে। প্রচারণার প্রয়াস নেই। স্বপ্ন আছে, মায়া আছে, মোহ আছে। যে অপেরাগুলি দেখেছি, তা বোলশয়-থিয়েটারের শিল্পীদের অভিনীত নয়। সে থিয়েটার তখন মফঃস্বলে বেরিয়ে গেছে। আমরা দেখেছি মফঃস্বলের দলের অভিনয়। অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি, বিষয়-বস্তুতে নয়। মুগ্ধ হয়েছি সমবেত প্রয়াসের পরমাশ্চর্য ফল দেখে। সব সময়েই দেখেছি দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ ঠাসা। বোলশয় থিয়েটারের অতবড় বাড়িটিও রোজই পরিপূর্ণ দেখেছি। দর্শকরা যে উপভোগ করছেন, তাও বুঝতে পারলাম। শুনলাম দর্শকদের অধিকাংশই শ্রমিক, বেশ-ভূষা দেখে অবশ্য তা অনুমান করা যায় না। অপেরা দেখবার সৌভাগ্য বিপ্লবের আগেকার শ্রমিকদের ছিল না। বোলশয় থিয়েটারে জারদের আর তাদের পরিবারের ও সম্পর্কের ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী ছাড়া কারু ঢোকবারই অধিকার ছিল না। সোবিয়েৎ থিয়েটারে নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগ পাইনি বলে দুঃখিত। তা যে আমাদের দেখানো হয়নি ইচ্ছে করে তা নয়—নাট্যাভিনয় ও-সময়ে বন্ধ থাকে, শিল্পীরা শহরে থাকেন না।

নাট্যাভিনয় দেখিনি, কিন্তু অপেরা দেখে এ আশা আমার মনে জেগেছে যে, আমরা যে রোমান্টিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক লিখি এবং আমাদের শিল্পীরা যে অভিনয় করেন, তা দেখিয়ে যে-দর্শকরা ওই অপেরা দেখে খুসি হন, সেই দর্শকদেরকে আমরাও খুসি করতে পারি, যদিচ ওঁদের অনুপম প্রয়োগ-নৈপুণ্য আমরা অর্জন করতে পারি নি, অথবা করা যে একান্তই আবশ্যক তাও সত্যি করে অনুভব করি নি। আমরা যাত্রার পালা দেখতে অভ্যস্ত, কীর্তনের পালা-নাটক শুনতে অভ্যস্ত, কবিদলের দ্বৈত-নাটক শুনতে অভ্যস্ত, কথক অভিনীত একক-নাটক শুনতে অভ্যস্ত।

মাইকেল-দীনবন্ধু বাংলা নাটককে মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং শহুরে শিক্ষিতরা নাটককে যেমন কল্পনা করতেন, তেমন নাটকই রচনা করেছিলেন। তাঁদের আবির্ভাব না ঘটলে গিরিশেরও উদ্ভব হতো না। 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' এবং 'শর্মিষ্ঠা' রচিত না হলে, 'সধবার একাদশী' আর 'নীলদর্পণ' ; 'লীলাবতী' না এলে, রামনারাণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'নববিবাহ'

অভিনীত না হলে গিরিশ নাটককে গ্যাশনাল করবার সব হদিস পেতেন না। ওসব নাটকের ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ ছিল না, এলিজাবেদিয়ান সৃজনধর্মী যুগের ঐতিহ্যের সঙ্গেও না। 'নীলদর্পণ' নীল চাষীদের বিদ্রোহ নিয়ে শুরু হয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল দীনবন্ধু সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন বলেই নয়, তিনি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের ব্যথাটাকেই বেশি করে অনুভব করেছিলেন বলে। বাংলার তাঁতীদের বিদ্রোহ, নীল চাষীদের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহের প্রয়াস সেদিনকার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালীদেরকে অন্তরে অন্তরে বিচলিত করেনি, যেমন করেনি সিরাজ-মীরকাসিমের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবার, ইংরেজের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন বিফল করে দেবার প্রয়াস অথবা সিপাহী বিদ্রোহের প্রয়াস। দীনবন্ধু বঙ্কিমের সুহৃৎ ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের গ্যাশনালিজম-এর আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেন নি। গিরিশ করেছিলেন। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, বড় করবার জন্য, যে বিদ্রোহের আবশ্যক আছে, বিপ্লবের প্রয়োজন আছে, এ-কথা বঙ্কিমের মতো গিরিশও বুঝেছিলেন। 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সৎনামী' প্রভৃতি তারই পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনে মাইকেলের মতোই গিরিশ জাত-বিদ্রোহী ছিলেন। ব্যক্তিগত পরবশতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অথচ আশ্চর্যের কথা তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র হতে দেখা গেছে, সামাজিক নাটকে তা দেখা যায় নি। সামাজিক নাটকে তিনিও সমাজতন্ত্রকে চূর্ণ না করে সমাজের মানুষের রূপান্তর কল্পনা করেছেন। সমাজতন্ত্রের এই প্রভাবের কথা আগেই লিখেছি।

## গুণেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ

গিরিশের নাটকে ও নাট্যশালায় যে ত্রুটি ছিল, ঠাকুরবাড়ীর সাধকরা সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সে নাট্যশালা বেশিদিন টিঁকে থাকে না। তার কতকগুলি দানের কথা আগে লিখেছি। কিন্তু সেই নাটাশালার অস্তিত্ব লোপ পেলেও ঠাকুরবাড়ীর সাধকদের নাট্যসাধনা লোপ পেল না। ঠাকুরবাড়ীর সেই সাধকরা গুণেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে যে মর্যাদা দিয়ে গেছেন, রচনা করে, অভিনয় করে, এবং প্রযোজনার মানোন্নয়ন করে, তাই-ই বাংলা নাটককে বিশ্বের দরবারে স্থান করে দিয়েছে, এ-কথা সকলেই জানেন। ওঁরা সকলেই নাটক না লিখলেও সকলেই কিন্তু বাল্যকাল থেকে অভিনয় করে এসেছেন।

ওঁদের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা গোপাল উড়ের যাত্রা থেকেই এসেছিল এ কথা মনে রাখবার মতো কথা। শুরুতেই ওঁরা শুধু নাটককেই ন্যাশনাল করবার কথা ভাবেন নি, নাট্যশালাকেও ন্যাশনাল করবার কথা ভেবেছিলেন। ওঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে ছিল না, পূবের দিকেই ছিল; পশ্চিমের জানালাটা অবশ্য সম্পূর্ণ খোলাই রেখেছিলেন। ওঁদের সাহিত্যে, ওঁদের সঙ্গীতে, ওঁদের চিত্রে যে পরিচয় পাওয়া যায়, ওঁদের নাটকেও তাই-ই পাওয়া যায়। ওঁরা যেমন খাঁটি বাঙালী, তেমন খাঁটি ভারতীয়, তেমনই খাঁটি বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী, মহামানবতায় আস্থাবান। রামমোহন বিদ্যাসাগর যে রকম বাঙালী ছিলেন, ওঁরা সকলেই সেই রকম বাঙালী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ওঁদের ওই রকম গড়ে তুলেছিলেন বলায় হয়ত সব বলা হবে না, কিন্তু প্রেরণা যে ওঁরা মহর্ষির জীবন থেকে এবং উপদেশ থেকে পেয়েছিলেন এমন কথা ওঁরাই বলে গেছেন।

একা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বত্রিশখানা নাটক-প্রহসন বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দিয়ে

গেছেন। পনেরোখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক তিনি অনুবাদ করে গেছেন। জুলিয়াস সীজারও তিনি অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রহসন ও সামাজিক নাটকগুলির কয়েকখানি মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এতগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের এবং প্রহসনের, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের, বিষয়-বস্তু বিচার করলে বোঝা যায় যে, নাটক রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন বাংলার এবং ভারতেরও চিত্র মনে রেখে। তাঁর প্রথম নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন (১৮৭২), দ্বিতীয় নাটক পুরুবিক্রম (১৮৭৪) সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ (১৮৭৫) অশ্রুমতী (১৮৭৯) অলীকবাবু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। সবই বাংলার এবং ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা। সংস্কৃত নাটকগুলি তিনি অনুবাদ করেন ১৮৯৯—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। বোধকরি বাংলা নাট্যশালার সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করবার কল্পনা তাঁর মনে এসেছিল। জুলিয়াস সীজার তিনি অনুবাদ করেন সব শেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার দিনে তিনি আগে সেকসপীয়ারে হাত দেননি কেন, তা নিশ্চিতই ভাববার কথা। শুধু ওই থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, যাত্রা দেখে তাঁর মনে জাতীয় নাট্যশালা গড়বার যে কল্পনা দানা বেঁধেছিল, তা-ই তাঁর দৃষ্টিকে দেশের বর্তমানের দিকেই প্রথমে আকৃষ্ট করে। পরে তা দূর-অতীতে যখন প্রসারিত হয়, তখনই সংস্কৃত নাটকে তিনি হাত দেন, এবং দূর বর্তমানের দিকে তাকিয়ে তিনি জুলিয়াস সীজারই দেখতে পান, হ্যামলেট ম্যাকবেথ ওথেলো নয়। এও কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি।

আমি ইচ্ছে করেই এই পরিবারের এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা আগে উত্থাপন করি নি। কেননা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর এই পরিবারের শিল্পীরা কেমন করে দেশীয় নাট্যধারা ও ও বিদেশী নাট্যধারার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন।

গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে গুণেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র নাট্যশালা গড়বার কল্পনা করেন—সে কথা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনই স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে নাটক লেখেন, তা হচ্ছে শুধু গানের পালা; সুতরাং সম্পূর্ণ স্বদেশী; গোপাল উড়ের যাত্রা যেমন ছিল পুরো স্বদেশী। কিন্তু যেহেতু গোপাল

উড়ের সংস্কৃতি আর রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি এক নয়, সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা', বিদ্যাসুন্দরের পুনরাবৃত্তি নয়। এই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন শহরে-শিক্ষিতদেরকে, যারা বাল্মীকিকে জানতে চায়নি, রামায়ণ ভুলেছিল, মনে-প্রাণে চেয়েছিল ইংরেজ হতে, সাহিত্য-শিল্প সবই গড়ে তুলতে চেয়েছিল ইংরেজের ধাঁচে। বাল্মীকির এই প্রতিভাকে, ভারতের এই প্রতিভাকে, প্রকাশ করে তিনি তাদেরই ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, যারা মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছিল যে প্রতিভা শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশেই গজায়, পোড়া প্রাচ্যে নয়। সেদিন তেমন শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল না। শুধু গানে যে নাটক হয়, এ-কথা তখনকার শিক্ষিত বাঙালী প্রায় ভুলে বসেছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' মুষ্টিমেয় লোকের মনকে খুসি করেছিল। আর তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি। সে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

ওর নয় বছর পরে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথ এমন একখানি নাটক লেখেন, যা তখনকার বাঙালীরা নাটক বলতে যা বুঝত, সেই রূপ নিয়েই গঠিত। সেই নাটকখানির নাম 'রাজা ও রাণী'। সেক্‌সপীয়ারের রূপারোপ পদ্ধতি তিনি ও-নাটকে অবলম্বন করেছিলেন, যদিচ সুর ও ধ্বনি, এবং অনুভূতি পুরো ভারতীয়। রাজা ও রাণীতে গল্প আছে, চরিত্র বিশ্লেষণ আছে, পরম-পরিণতি আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রবীন্দ্রনাথ নাটকে প্রথম ব্যবহার করেন এই 'রাজা ও রাণী'তে ; গদ্যও ব্যবহার করেছেন। 'রাজা ও রাণী' ট্রাজেডি কিন্তু রোমান্টিক। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী, বাংলা-নাটকে প্রথম ট্রাজেডি, রচিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ রাজা ও রাণী রচনার ত্রিশ বছর আগে। কৃষ্ণকুমারীতে মাইকেল পদ্য ছন্দ ব্যবহার করেন নি। তিনি 'পদ্মাবতী'তে কিছু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন—কিন্তু বেশির ভাগই গদ্য। মাইকেল ও-সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখেছিলেন :—

I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.

গীতি-কাব্যের দেশে নাটকের ভাষা গদ্যের চেয়ে পদ্যে বেশি চিত্তাকর্ষক হবে বলেই মাইকেল বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তবুও তিনি মনে করতেন মিত্রাক্ষরে নাটক রচনা সম্ভব নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতাই নাটকে প্রয়োজন; কিন্তু তাও চালু করতে হবে ধীরে ধীরে, 'পদ্মাবতী'তে যা তিনি করেছিলেন। 'পদ্মাবতী' তিনি রচনা করেন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার এক বছর আগে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। পদ্মাবতীর গান আছে ছয়টি। রচনায় বিদ্যাসুন্দরের পালা-গানের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সুর যথারীতি সবই ক্লাসিকাল। কৃষ্ণকুমারী পরে রচিত হলেও সম্পূর্ণই গদ্য-রচনা। গান, তিনখানা। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ওই গান বেঁধে দিয়েছিলেন। মাইকেল তাঁকে কিন্তু মহারাজ বলে বর্ণনা না করে শেঠ যতীন্দ্রবাবু বলে পরিচয় দিয়েছেন, এবং লিখেছেন :—

I have requested set Jatinder Baboo to write the songs. He is sure to do justice to the play.

"শর্মিষ্ঠা" রচিত হয় কৃষ্ণকুমারী রচনারও দুই বছর আগে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

নাটুকে রামনারায়ণ মাইকেলকে সংস্কৃত নাটক রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করতে অনুরোধ করেছিলেন। মাইকেল তা অগ্রাহ্য করে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখেন :—

I am aware, my dear fellow, that—there will in all likelihood, be something of a foreign air about my drama. Remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit. I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. Dont let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits.

শর্মিষ্ঠা সবটাই গদ্যে লেখা। ওতেও খান পাঁচেক গান আছে। তাঁর নাটক সম্বন্ধে মাইকেল নিজে বলেছেন :—

This Sharmistha has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture.

কিন্তু ওই সব নয়। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা হচ্ছে এই :—

In Sharmistha I often stepped out of the path of the Dramatist for that of a mere poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.

শর্মিষ্ঠা আর কৃষ্ণকুমারী নাটক দু'খানিতে তিনি পদ্য-ছন্দ ব্যবহার না করলেও শর্মিষ্ঠায় কাব্য-প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছিলেন, এ-কথা নিজেই তিনি স্বীকার করেছেন এবং কৃষ্ণকুমারীতে সতর্ক হতে চেয়েছেন, পেরেছেন কিনা সে আলোচনা এখানে করব না। শর্মিষ্ঠা গদ্যে লিখেও তিনি যে কাব্যকে দূরে রাখতে পারেন নি, তা নিজেই বলেছেন। আবার এ-কথাও বলেছেন যে, বাঙলা নাটককে উন্নত করতে হলে অমিত্রাক্ষর পদ্য-ছন্দের সহায়তা নিতেই হবে। তাঁর কথা এই :—

No real improvement in the Bengali Drama could be expected until Blank Verse was introduced to it.

যে ব্ল্যাঙ্কভার্স গঠন তিনি করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :—

I even go to the length of believing that our Blank Verse thrashes the Englisher's, as an American would say! But

jokings apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other?

কিন্তু তা জেনে বুঝেও একমাত্র পদ্মাবতী নাটক শ'-দুই লাইন ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সে রচনা করা ছাড়া, তিনি নাটকে তা ব্যবহার করেন নি। কেন করেন নি তা স্পষ্ট করে বলেন নি; শুধু বলেছেন ক্রমশ ওর প্রচলনে মন দিতে হবে, একেবারে ওর আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাঁর শর্মিষ্ঠার গদ্য-কাব্যও সকলে বুঝতে পারে নি, এ-কথাও তিনি বলেছেন, যদিচ আশা প্রকাশ করে গেছেন ভবিষ্যতে যখন বাংলা ভাষাকে লোকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, তখন ঠিক বুঝতে পারবে। বাংলা গদ্যও ত আধুনিক সাহিত্যের ভাষা হয়েছে মাত্র বছর কয়েক আগে, বিদ্যাসাগরের প্রতিভার ফলে ১৮৪৭-১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

যে-বছরে তিনি 'পদ্মাবতী' লেখেন, সেই বছরেই 'তিলোত্তমা কাব্য' লেখেন অমিত্রাক্ষরে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', আর 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন দুখানিও ওই এক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। যে গদ্য অথবা কাব্যময় গদ্য তিনি 'শর্মিষ্ঠা'য়, 'পদ্মাবতী'তে এমন কি 'কৃষ্ণকুমারী'তে লিখেছিলেন, প্রহসন দু'খানিতে সে গদ্যের লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই, একেবারে বাঙালীর মুখের ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের, শর্মিষ্ঠা নাটকের কাব্যাত্মক আলঙ্কারিক শব্দ-ঝঙ্কার ও-দুখানির কোথাও নেই। সমসাময়িক দীনবন্ধুর গদ্যের মতোই তা খাঁটি বাঙালীর ভাষা। মনে রাখা দরকার 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তুলনায় 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'নীল দর্পণ', 'লীলাবতী', 'সধবার একাদশী' কম সাহিত্যিক গুণ সম্পন্ন নয়।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটকই 'নীল দর্পণ', ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। ওর ছয় বছর পরে তিনি 'সধবার একাদশী' লেখেন। 'নীল দর্পণের' ভাষার চেয়ে 'সধবার একাদশী'র ভাষার যেমন পার্থক্য আছে, তেমন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র সঙ্গে 'একেই কি বলে সভ্য'তার ভাষারও পার্থক্য আছে। 'সধবার একাদশী' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা' দু'খানির ভাষা কিছুটা মার্জিত, কিন্তু বিস্ময়কর সরল, সাবলীল।

খুব আশ্চর্যের কথা যে দীনবন্ধু বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও নাটকে বঙ্কিমের গদ্য-রীতি অনুসরণ করেন নি।

গিরিশ তাঁর পূর্বাচার্য দুজনার কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটকে আনতে হবে, মাইকেলের এ-কথা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু শর্মিষ্ঠার অনুকরণে তিনি তাঁর নাটকের গদ্যকে কাব্যময় করলেন না। সামাজিক নাটকে তিনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'লীলাবতী', 'সধবার একাদশী'র ভাষাই নিলেন। দীনবন্ধু কবিতায় কোন নাটক লেখেন নি। গিরিশের প্রথম নাটক 'আনন্দ রহো', ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। হলদীঘাটের পরের ঘটনা। সম্রাট আকবর ও মানসিংহের পারস্পরিক হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিণতি; ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, গদ্য রচনা; গান আছে। ওই বছরেই তিনি 'রাবণবধও' লেখেন কবিতায়। যে ছন্দ তিনি ব্যবহার করেন তা মিত্রাক্ষর নয়, কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকেও একেবারে পৃথক। সংস্কৃত শব্দ অত্যন্ত বিরল, যুক্ত-অক্ষর পর্যন্ত পরিমিত ব্যবহৃত। অভিনয়কালীন আবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে মাত্রাবিরামের ব্যবস্থা, মিলও অমিল নয়। মাইকেল বলেছিলেন অমিত্রাক্ষরের প্রচলন ক্রমশ করতে হবে। গিরিশ কালক্ষেপ করতে পারলেন না। ন্যাশনাল থিয়েটারে (দ্বিতীয়বারের) নাটকের পর নাটক দিতে হবে; শুধু গদ্যে দিলেই চলবে না, পদ্যেও দিতে হবে। তাই তিনি এক নূতন ছন্দে নাটক লেখা শুরু করলেন। 'রাবণবধ', 'সীতাহরণ' থেকে শুরু করে তিনি ক্রমশ ওই ছন্দ ব্যবহার করতে লাগলেন পৌরাণিক নাটকে এবং কিছু-কিছু ঐতিহাসিক নাটকেও। মাইকেলের ছন্দ দেশের সাধারণ লোকের কাছে পৌছে দেবার কোন উপায় ছিল না ছাপা-বইয়ের মাধ্যম ছাড়া। তা ছাড়া গোঁড়া-পণ্ডিতরাও মাইকেলের ছন্দের বিরুদ্ধে একটা বিরাগ জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু গিরিশ তাঁর ছন্দকে অভিনয়ের মাধ্যমে লোক-গ্রাহ্য করে নিলেন।

ছন্দের যাদুকর রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে কাব্যের মায়াজালে বুনে চলেছিলেন, এবং নাটককেও তারই মাধ্যমে রূপায়িত করলেন। সে নাটক 'রাজা ও রাণী'। তার তিনবছর আগে (১৮৮৭) গিরিশ 'বিল্বমঙ্গল' লেখেন, এবং তিন বছর পরে

( ১৮৯৩ ) করেন 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ। রাবণ বধে যে ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন, তারই পরিণতি দেখতে পাই ম্যাকবেথে। গিরিশ যে ছন্দ ম্যাকবেথে ব্যবহার করেছেন, তাও কিন্তু সেকসপীয়ারের ছন্দ নয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়। দুই ভাষার ছন্দ স্বাভাবিকভাবে এক হয় না ; জোর করে এক ধাঁচের করা যে যায় না তা নয়। তা হয়ত করা যায়, কিন্তু কাব্য-নাটকে স্বাভাবিক আবেগ ব্যক্ত করতে হলে তা বাধার সৃষ্টি করে। ম্যাকবেথে গিরিশ সেকসপীয়ারত্ব বজায় করে রাখবার প্রবল চেষ্টা করেছেন। আর তারই জন্য তা সর্বত্র সুখপাঠ্য, সুবোধ্য ও শ্রুতিমধুর হয় নি। কোন-কোন অংশের অর্থোদ্ধার করতে বাঙালী পাঠককেও বার-বার করে পড়তে হয়। বলা বাহুল্য ভাষার পক্ষে তা প্রশংসনীয় নয়।

রাজা ও রাণী রচনার পরের বছরেই রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন ( ১৮৯১ ) রচনা করেন। বিসর্জনও রাজা ও রাণীর মতোই যে ছন্দে লেখা তা যেমন পৃথক মাইকেলের ছন্দ থেকে, তেমন পৃথক গিরিশের ছন্দ থেকে—অথচ সে ছন্দও অমিত্রাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর সবক্ষেত্রেই এক নয়, বহু রকমে তা প্রকাশ পেয়েছে। তাতে গিরিশের ছন্দের মতো মিলও রয়েছে, কোথাও কোথাও পয়ার ত্রিপদীরও প্রভাব রয়েছে। ছন্দকে যে স্বাধীনতা মাইকেল দিয়েছেন, গিরিশ দিয়েছেন তারও চেয়ে বেশি ; কিন্তু সর্বদাই অভিনয়ের কথা ভেবেই তা দিয়েছেন। মাইকেলের ছন্দ সাধারণ পাঠকরা যতি-বিরাম ঠিক করতে পারেন না। তাঁদের আবৃত্তি ভুল হয়। গিরিশের ছন্দে যে পয়ারের ঝোঁক আছে, যে দমকের দাবী আছে, তাও সাধারণ পাঠকদের শ্রুতিসুখকর হয় না। কিন্তু অভিনেতৃদের মারফত যখন তা প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন তা নানা আবেগ সৃষ্টির উপযোগী হয়ে ওঠে তা প্রমাণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রকাশ-পথের সকল বাধা যেমন চূর্ণ করেছেন, তেমন তাকে একেবারে স্বদেশীও করেছেন। তিনি তা করতে পেরেছেন এই জন্যই যে, তিনি মাইকেলের মতো কোন চ্যালেঞ্জ নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অবলম্বন করেন নি। আবার গিরিশের মতো কেবল মাত্র অভিনয়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই ওই ছন্দের রূপ দেননি। তিনি বাঙলা ভাষার উৎপত্তি থেকে তার গতি ও

ঝোঁক বিচার করে দেখেছেন, নিজের রচনায় পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করেছেন। বিদেশের যা স্বদেশী করা সম্ভব নয় বলে বুঝেছেন, তাকে জোর করে স্বদেশী সাহিত্যে স্থান করে দিতে তিনি চান নি, যা কিছু জীর্ণ হবে বলে বুঝেছেন তাই পরমাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' রচনা করেও কিন্তু তিনি যে-আদর্শ সামে রেখে 'বাল্মীকির প্রতিভা' রচনা করেছিলেন, সেই ভারতীয় নাট্যরূপ বর্জন করেন নি। বিসর্জনের পরে তিনি 'মালিনী' রচনা করেন প্রাচীন রীতি অনুযায়ী। অবশ্য রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনে তিনি যে আঙ্গিকেরই সহায়তা নিয়ে থাকুন, নাটকীয় সংঘাতকে তিনি আদর্শের সংঘাতই করেই রেখেছেন, এবং বাইরের স্থূল-সংঘাতকে নাটকে বড় করে তোলেননি। সর্বোপরি নাটকের পরিণতি ঘটিয়েছেন আত্মবলির শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করবার আবেদন সৃষ্টি করে। রাজা ও রাণীর 'সুমিত্রা' এবং বিসর্জনের 'জয়সিংহ' দুজনাই তাই করেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি হ্যামলেট ওথেলো লিখতেন, তাহলে তাদের পরিণতি সেকসপীয়ার যে পরিণতিতে নাটক শেষ করেছিলেন, তা থেকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র হোতো। ভল্‌তেয়ার হ্যামলেট এবং ওথেলোকে সার্থক ট্রাজেডি বলে স্বীকার করেন নি। ভলতেয়ারও ফরাসী নাটককে নবরূপ দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ান ভলতেয়ারের নাটকের অংশবিশেষ পরিবর্তন করিয়ে অভিনয় করাতেন। তিনি মনে করতেন ভলতেয়ার একটা নির্দিষ্ট সীমা-রেখা অতিক্রম করে এগুতে পারেননি। সে যাই হোক, ভলতেরার বলে গেছেন হ্যামলেট নাটককে এমনই বড় করতে চাইলেন সেকসপীয়ার যে, শেষ অবধি নাটকের একটি চরিত্রকেও তিনি জীবিত রাখতে পারলেন না। নাটক যাদের নিয়ে গড়ে তোলা হোলো, তাদের সবাইকে হত্যা করে নাট্যকার কোন্ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিলেন, ভলতেয়ার তাই জানতে চেয়েছিলেন। ওথেলো সম্বন্ধেও জানতে চেয়েছিলেন দেস-দিমোনার যখন গলা টিপে ধরা হোলো, তখনও দেসদিমোনা যে নিজের জীবন-রক্ষার এতটুকু চেষ্টা না করে প্রভুর অযোগ্য ও অনুচিত কাজের বিস্ময় নিয়েই মৃত্যুকে বরণ করে নিল, সেই ব্যাপারটাই বা কতটুকু স্বাভাবিক হোলো ? ভলতে-য়ারের সমালোচনা অযৌক্তিক বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই

থেকে ইংরেজের ও ফরাসীর মনোবৃত্তির ও রসানুভূতির পার্থক্যও বোঝা যায়। সেকস্‌পীয়ার কিন্তু জানতেন হত্যায় সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। ম্যাকবেথের মুখ দিয়ে তিনি তা বলিয়েছেন যখন রাজ-হত্যা উচিত হবে কি অনুচিত হবে, তাই নিয়ে তার অন্তরে ঝড় উঠেছিল। সেকস্‌পীয়ার জান্তেন যে হত্যা দ্বারাই যে লোক সকল সমস্যার সমাধান করতে চায়, শেষ পর্যন্ত তাকেও হত হতে হয়। হ্যামলেটে ম্যাকবেথে ওথেলোয় তিনি তা দেখিয়েছেন; কিন্তু হত্যাছাড়া আদর্শের সংঘাতে আর কি করে সমন্বয় করা যায়? ভারতীয় নাট্যকাররা তা দেখিয়েছেন। তা হচ্ছে আত্ম-ত্যাগ। তার ফলে প্রিয়জনের রূপান্তর হয়—সংঘাতের, বলাৎকারের, প্রবৃত্তি আর থাকে না। সুমিত্রা তাই করেছিলেন। বিসর্জনের জয়সিংহও তাই করেছিলেন। কিন্তু সব সময়ে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত অগ্রসর হতে হয় না। ইমোশনকে বুদ্ধির দ্বারা শাসন করে আত্ম-স্বার্থ বর্জন করেও সৎ-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অপরের মনের এবং নিজেরও মনের পরিবর্তন আনা যায়। সংস্কৃত নাটকে কালিদাসের নাটকেও এমন চরিত্র বহু রয়েছে। অবশ্য সে-সব নাটকে সংঘাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রণয় নিয়ে, স্ত্রীর অধিকার নিয়ে, নারীর অধিকার নিয়ে। কদাচ সে সংঘাতকে মৃত্যু পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুকে সংস্কৃত নাট্যকাররা এড়িয়ে চলতে চাইতেন। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন, সর্বস্বার্থ-ত্যাগ, এবং ভবিতব্যের বিধান অনিবার্যজ্ঞানে আত্ম-সমর্পণ, অথবা মনের রূপান্তর সংঘাতের পরিণতি রূপে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করতেন। নাটক হতো অন্তরের সংঘাত নিয়ে রচিত। কিন্তু সেই সংঘাতও ব্যক্ত করা হতো মধুর অথবা শৃঙ্গার রসের সাহায্যে। ভাষাকে অযথা তিক্ত, সংলাপকে তীক্ষ্ণ ও অমানুষিক কদাচ করা হোতো। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, প্রেমাস্পদকে একান্ত করে পাবার জন্য নানা ছল-চাতুরি ও ষড়যন্ত্র থাকত, কিন্তু নর-নারীর স্বাভাবিকতাকে সীমা-রেখা অতিক্রম করতে দেওয়া হোত না। সে-সব ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বজায় করে রেখে কেমন করে সংঘাতে সমন্বয় আনতে পারেন, তাই ছিল বড় কথা।

স্বামী-স্ত্রীর আদর্শের অথবা প্রণয়ের সংঘাত নিয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। সেই সব নাটক প্রায়ই বিচ্ছেদে শেষ হয়েছে। কিন্তু

সমস্যার অবতারণা যখন করা হলো, তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে সমন্বয় করাই ত বড় কথা। বিচ্ছেদ ঘটালে ত সংঘাতের সমন্বয় হোল না। সংঘাত রয়েই গেল অপর স্বামী-স্ত্রীর জীবনে। বিচ্ছিন্ন হলো যে স্বামী-স্ত্রী তাদেরও মনের সংঘাত রয়েই গেল, শুধু সম্বন্ধটাই গেল ছিঁড়ে। ধরুন, ইবসেনের A Doll's Houseএ নোরা চাইল স্বামী আর স্ত্রীর পারস্পরিক স্বীকৃতি ওপর প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় ঘর। স্বামীর প্রচণ্ড স্বার্থপরতা তার চপল মনকে সহসা কঠিন করে তুল্‌ল। সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিঁড়ে গেল, দাম্পত্য অধিকার ত প্রতিষ্ঠা পেল না। সংঘাত হয়ত তাদের জীবনে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আরো বহু স্বামী-স্ত্রীর জীবনে তা রয়ে গেল। কাজেই নোরা হেলমারের আর ডাক্তার হেলমারের দাম্পত্য-জীবনের অবসান সমাজে একটা ব্যতিক্রম হয়েই রইল, সমাজের প্রতি স্বামী-স্ত্রীর নিজ-নিজ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির ফলে স্বাধিকার সম্পন্ন দাম্পত্য-জীবনের পুতুল-ঘর অক্ষয় প্রেমের-দেউল হয়ে উঠল না। দাম্পত্য-জীবনের বাইরে তাদের জীবন কোন পথ ধরে চলবে, তা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় হয়ে রইল। ঘরও ভাঙল, সংঘাত রয়েই গেল; শুধু দুটি জীবন ভেসে গেল দুই দিকে। নাটক কার কি উপকার করল ?

বলা হয়, ঘর-ভাঙা অনিবার্য বুঝে সমাজের স্বামীরা ডাক্তার হেলমারের মতো ব্যবহার আর করবে না, স্ত্রীর অধিকার স্ত্রীর দৌর্বল্য স্বীকার করে নেবে, স্ত্রীকে পুতুল করে রাখবে না। এ' হচ্ছে অনুমান। সব স্বামী ডাক্তার হেলমারের মনোবৃত্তির অধিকারী হবেন না। কেউ বা স্ত্রীকে জোর করে ধরে রাখতে চাইবেন, কেউ বা পুলিশের সাহায্য নেবেন, আইনের সাহায্য নেবেন; ডলস-হাউস ডিটেনশন-হাউস হয়ে থাকবে। আবার সব স্ত্রী নোরা হেল-মারের মতো না হয়ে বার্ণার্ড শ'র ক্যানডিডার মতোও হতে পারে। প্রেমের আদর্শও নয়, সাধ্বী-গৃহিণীর কর্তব্যও নয়, শুধুই ফুলের মতো ফুটে থাকবার জন্য একান্ত স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করে প্রেমিকের এবং স্বামীর, উভয়েরই প্রীতি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও পূজা গ্রহণ করা। পুতুলের ঘরও ভাঙবে না, অপর ঘরও গড়বে না। দুখানি নাটকই এক সমস্যা সমাধান না করে, অপর সমস্যা সৃষ্টির উপকরণ যুগিয়েছে। সংস্কৃত নাটক এ-কাজ করেনি। সংস্কৃত নাটকে

সংঘাতের সমন্বয় করা হয়েছে নাটক সম্পূর্ণ করবার মুখেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বিচার নিয়ে কম নাটক সংস্কৃতে লেখা হয়নি। সব নাটকে সব স্ত্রীই দাসী নন, স্বাধীন মতাবলম্বিনী তেজস্বিনী স্ত্রীও আছেন, বিলাসিনী কামিনীও কম নেই, ভক্তিমতী নিষ্ঠাবতী নিঃস্বার্থ স্ত্রী আছেন অনেক। স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের নানা সংঘাত তাতে আছে, দাবী-দাওয়ার দ্বন্দ্বও বড় কম নেই। কিন্তু সকল সংঘাতের সমন্বয় যেখানে দেখানো হয়েছে, সেখানে স্বার্থ-ত্যাগ, স্ত্রীত্বকে নারীত্বে অথবা মাতৃত্বে রূপান্তর, অথবা বিধি-নির্বন্ধ অলঙ্ঘ্যজ্ঞানে আত্ম-সমর্পণ সংঘাত-অবসানের হেতু করা হয়েছে।

সংস্কৃত নাটককে যাঁরা সেকেলে বলে উপেক্ষা করেন, তাঁরা বলেন ওগুলো সব অবাস্তব। রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে, বাসনা-কামনা নিয়ে, যে নর-নারী সংঘাতে প্রবৃত্ত হবে, তারা সংঘাত করবে বিজয়ী হতে, বা জয়ী হবার জন্য হত্যা করে, নয়ত যা ন্যায়সঙ্গত, যা শুভ, যা স্বাভাবিক, তারই প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়ে। কিন্তু বিচার, বিবেচনা, সংযম, ত্যাগ, আত্মসমর্পণও ত মানুষ পদে-পদেই করে থাকে। 'পাউণ্ড অব ফ্লেস' আদায় করবার জন্য সবাই কিছু এক-রোখা হয়ে ওঠে না। সুতরাং সংস্কৃত নাট্যকাররা যা করেছেন, তাকে ন্যাচুরালিজম-বিরোধী বলবার হেতু নেই। তেমনই হিংসা, দ্বেষ, স্বাধিকারচ্যুত হবার বেদনাও মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অবশ্যই করে ফেলতে পারে, এবং সে অবস্থায় সে কোনরূপ আপোষের কথা না ভেবে চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যবস্থা নিশ্চিতই অবলম্বন করতে পারে। সে তখন সব কিছু ভাঙবার জন্য অধীর হয়ে উঠতে পারে, এবং হত্যাও করতে পারে। তার সে-কাজও ন্যাচুরালিজম-বিরোধী নাও হতে পারে। হ্যামলেটের আর ওথেলোর হত্যাকাণ্ড ওই যুক্তি দিয়ে অনেকে স্বাভাবিক বলে থাকেন। কিন্তু তা যাঁরা করেন, তাঁরা ম্যাকবেথের হত্যাকাণ্ডকে স্বাভাবিক বলেন না ম্যাকবেথের সিংহাসন অধিকার করবার এবং সেই সিংহাসনে নিরঙ্কুশ অধিষ্ঠিত থাকবার দুর্বার লোভের জন্য। কিন্তু লোভই একমাত্র রিপু নয় যা মানুষকে অমানুষ করে,—হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহও মানুষের অনেক অকল্যাণ করে। কাজেই ম্যাকবেথকে দানব বল্লে ওথে-

লোকেও মানবত্বের মর্যাদা দেবার কোন মানে থাকে না। ম্যাকবেথের তবুও পরিণতির পথেই রূপান্তর ঘটেছিল, তার পরিচয় কেবল 'আউট ব্রিফ ক্যাণ্ডল'ই নয়, নাটকের শেষের দিকে ছত্রে-ছত্রে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যকাররা হলে ম্যাকবেথের মনের শেষের দিককার ওই পরিচয় দেবার পর আর ম্যাকডাফের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ম্যাকবেথ-বধ করাতেন না; তাকে দিয়ে সিংহাসন ও সংসার ত্যাগ করাতেন। ইতিহাসে এক ম্যাকবেথের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি শেষ জীবনে পোপের পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেকসপীয়ার ইতিহাসের সে ম্যাকবেথকে নেননি, নিয়েছেন হলিনসেড বর্ণিত, প্রবাদরূপে প্রচারিত, ম্যাকবেথকে। পরশুরাম দ্বাদশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, এবং নিজের জননীকেও হত্যা করেছিলেন পিতৃ-আদেশে। পিতার প্রতি অবিচার করা হয়েছিল, বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হয়েছিল বলে হ্যামলেট তাই প্রাসাদের সকলের উপর প্রতিশোধ নিলেন হত্যার পর হত্যা করে, এমন কি নিজেকেও তিনি মার্জনা করতে পারলেন না। মায়ের স্নেহ, ওফিলিয়ার প্রেম, তাঁকে শান্ত করতে পারল না। একে কিন্তু পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার হত্যার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কেননা পরশু-রামের জীবনের একটা লক্ষ্য ছিল, বীর্যবত্তা ছিল। কিন্তু হ্যামলেট নাটকে না পাওয়া যায় তার জীবনের লক্ষ্য, না পাওয়া যায় পুরুষোচিত বীর্যের পরিচয়। যে পরিবেশে হ্যামলেটকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেখানে ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিংহাসন অধিকার, অথবা বিধবা-মাতার বিবাহ অশ্রুতপূর্ব ঘটনা নয়। অবশ্য তাই বলে আমি বলতে চাই না যে এমন কোন মানুষ সেখানে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, যার সূক্ষ্মানুভূতি ওতে আহত হবে না। হ্যামলেট সে-রকম একজন অবশ্যই হতে পারত। কিন্তু তাহলে সেই সূক্ষ্মানুভূতিই তাকে নিবৃত্ত রাখত হত্যার উৎসব থেকে। সূক্ষ্ম অনুভূতি নয়, কু-সংস্কারই হ্যামলেটকে উন্মত্তবৎ করেছিল। পিতার 'অশরীরী-মূর্তি' এবং নিজের কল্পনায় অনুমিত 'পিতৃ-বাক্য' তাকে উতলা করেছিল, যেমন করেছিল ব্যাঙ্কোর কল্পিত-উপস্থিতি ম্যাকবেথকে উতলা। ম্যাকবেথের উতলা হবার যে কারণ ছিল, হ্যামলেটের তা ছিল না। সূক্ষ্মানুভূতি মনকে কেমন করে প্রশান্তিতে ভরে দেয়, তার

পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী' সংবাদে, বলা চলে সংস্কৃত-কাব্যে। সংসারের বিরুদ্ধে, কুন্তীর বিরুদ্ধে, কর্ণের অভিযোগের কারণ কম গুরুতর ছিল না। পিতা দিবাকরকে কর্ণ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং রূপে প্রত্যক্ষ করতেন, পূজা করতেন, বিদেহী প্রতিশোধ-পরায়ণ-প্রেতমূর্তিরূপে অনুমান করতেন না। তাই মন তাঁর দিব্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। মায়ের মুখে সকল অবিচারের, সকল বঞ্চনার, বিবরণ শুনেও তিনি হ্যামলেট হলেন না। যা পাননি, তা ত্যাগ করেই মনকে পরম শান্তিতে ভরে নিলেন। সংসারের অনেক মানুষ তাই করে। সংসারে হ্যামলেট হওয়াই কেবল স্বাভাবিক হতে পারে, কর্ণ হওয়া আদৌ স্বাভাবিক হতে পারে না, এমন কথা সত্য নয়। নাটকে অবশ্য দুই-ই প্রতিফলিত হতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত অথবা ভারতীয় কাব্য-নাটকে সেই চরিত্রই চিত্রিত করা হোত, সেই আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হোত, যা সংঘাতকে সমাজ-কল্যাণের, জন-কল্যাণের, হেতু ক'রে তুলত, কেবল নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার দিকে দৃষ্টি রেখেই নাটুকেপনার প্রশ্রয় দেওয়া হোত না। দেসদিমোনাকে হত্যা করবার পর ওথেলোর বিলাপ ও আত্ম-বিনাশ নাটকের পরম মুহূর্ত নয়, একান্তই নাটুকেপনা।

রাজা ও রাণী নাটকে সুমিত্রা স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গেলেন স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নয়। সুমিত্রা স্ত্রীর কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অধিকারেরও অতিরিক্ত এত কিছু তিনি পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছে যে, তিনি বুঝতে পারলেন স্বামী মোহাচ্ছন্ন হয়ে রাজার কর্তব্য পালন করছেন না, যার ফলে প্রজাদের অভাব ও অশান্তি দুই-ই যেমন বেড়ে যাচ্ছে, তেমন সিংহাসনও টলে উঠেছে। অমঙ্গল নিবারণ করবার জন্যই তিনি স্বামীর সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে গেলেন; ভাবলেন তাঁর মোহজাল থেকে মুক্তি পেলে তাঁর স্বামী প্রজার কল্যাণে, রাজ্যের মঙ্গলে, মন দেবেন। কিন্তু কার্যত তা হলো না। রাজা আত্মাভিমানে আঘাত পেলেন। মোহ তাঁকে আগেই সংযমহারা করেছিল। সুমিত্রা দূরে চলে যেতে সেই মোহ আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। বল-প্রয়োগে স্ত্রীর উপর তাঁর অধিকার পুনরর্জনের প্রবৃত্তির ফলে অনাচারী হয়ে উঠলেন তিনি। সুমিত্রা জানতেন তিনি আত্ম-সমর্পণ

করলে রাজার মোহ-মুক্তি হবে না। অথচ রাজাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে না পারলে কেবল তাঁর রাণীর কর্তব্যই অপূর্ণ থাকবে না, স্ত্রীর কর্তব্যও অপূর্ণ থাকবে। তিনি আত্ম-বিসর্জন করলেন। রাজার চৈতন্যোদয় হলো। সুমিত্রার দৃষ্টি, বিচার, বিশ্বাস, কাজ, সবই ভারতীয়।

বিসর্জন নাটকে জয়সিংহ গুরুকেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না, আবার নিজের অন্তরের উপলব্ধিকেও অস্বীকার করতে পারেন না। গুরুর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। সকল যুক্তি যখন গুরু উপেক্ষা করলেন, তখন জয়সিংহ বুঝলেন, একমাত্র তাঁর আত্ম-বিসর্জনই গুরুর চৈতন্যোদয়ে সহায়তা করবে। মতের অমিল, দৃষ্টির পার্থক্য সত্বেও, গুরুদ্রোহ তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না, ক্রোধে অথবা অভিমানে গুরুকে তিনি ভুলও বুঝলেন না। তিনি ছিলেন যৌবনের অধিকারী, গুরু বৃদ্ধ। বৃদ্ধের মতকে তিনি স্তব্ধ করে দিতে পারতেন গলা টিপে মেরে ফেলে, হ্যামলেটরা যা করতেন ; আবার গোঁড়া-ভক্তের মতো আপন-উপলব্ধিকে অগ্রাহ্য করে গুরুর পদতলে পড়ে গুরুভক্তির পরিচয়ও দিতে পারতেন। কিন্তু দুটির কোনটিই তিনি করলেন না, আত্ম-বিসর্জন করলেন মতের স্বাধীনতাকে অজেয় রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে। অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি এই যুবক জয়সিংহ। ভারতীয় কাব্যে এমন যুবকের ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

কিন্তু রঘুপতিরা রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তার পাত্র হয়েই রইল। আচারসর্বস্ব অথচ সত্যিকারের সন্ন্যাস ধর্মে সুদৃঢ়, বিচিত্র চরিত্রের এই অসাধারণ মানুষগুলির প্রকৃতি-বিরোধী আচার-নিষ্ঠার কি কোথাও শেষ নেই ? রবীন্দ্রনাথের চার-অধ্যায় উপন্যাসে নব-যুগের রঘুপতির দেখা পাই, দেখা পাই জয়সিংহকে হ্যামলেটরূপে। রবীন্দ্রনাথ যুগ-যুগান্তরের রঘুপতিদের মুক্তির উপায় জানতেন, জানতেন মানবতাই তাদেরকে মুক্তি দেবে। তাই তিনি লিখেছিলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

এই মানবতার প্রতিষ্ঠা তাঁকে যেমন 'অচলায়তন' লিখতে প্রেরণা দিল, তেমন তাঁকে দিয়ে 'ডাকঘর'ও লেখাল। শাস্ত্রের, নিয়মের, নিগড়, বয়স্কদের অজ্ঞানতার পাপ, বংশধরদেরকে সৃষ্টিধরদেরকে কেমন শুকিয়ে মারে,

শতদলের মতো বিকশিত হতে বাধা দেয়, অচলায়তনে এবং ডাকঘরে তিনি তা দেখিয়েছেন। এই অপরাধকে তিনি কেবল অচলায়তনের পরিকল্পয়িতাদেরকেই অপরাধী করেন নি, বর্তমান অভিভাবকদেরকেও অপরাধী করেছেন। তাঁর শৈশব স্মৃতির অনেক অনুভূতি ডাকঘরে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিংশ শতকের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন গড়ে তোলবার মানুষের নির্বুদ্ধিতাকে অতীত-আবহে ফুটিয়ে তুলে তাঁর যুগের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। আজ অর্ধ শতক উত্তীর্ণ হবার পর, পঞ্চশীল স্বীকৃতি পাবার পর, আনবিক বোমার ভীতি সৃষ্টির পর, সেই অচলায়তনের দেয়াল কি ধ্বসে পড়চে? পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে চেয়ে দেখা আজই কি নিষিদ্ধ নেই? যারা তা দেখে তাদেরকে আজ কি আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না? বাইরের প্রাচীর অবশ্য ধ্বসে পড়চে; কিন্তু অন্তরের যে সঙ্কীর্ণতা থেকে অচলায়তনের উদ্ভব হয়েছিল, সে সঙ্কীর্ণতা থেকে সকল দেশের সব মানুষ আজও সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি। দেখার বাধা আজ অপসারিত হয়েছে সত্য, কিন্তু কোন্ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, অচলায়তন যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের সৃষ্টিধররা সে সম্বন্ধে শাসন-অনুশাসন কম কড়া করে রাখেন নি। পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, অতীতে একদল অচলায়তন গড়েছিলেন, একদল সেই অচলায়তনের অভ্যন্তরে থেকেই তা ভাঙতে চেয়েছিলেন; আর আজ ভাঙবার জন্য যারা শাবল-কোদাল হাতে তুলে নিয়েছেন, তাঁরাও আর একটা অচলায়তনের ভিত গড়বার ভুল করছেন। অচলায়তনে আর ডাকঘরে যে সঙ্কীর্ণতা, যে হৃদয়হীন নিয়ম-নিষ্ঠা, মানুষকে নিয়মের দাস অর্থাৎ যন্ত্রবৎ করবার যে অকল্যাণকর প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ প্রতিফলিত করেছিলেন, তার বিস্তারিত কুক্রিয়া সারা বিশ্বের মানুষের কী অনিষ্ট সাধন করছে, এবং মানুষের পরিত্রাণের কী উপায় রয়েছে, তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন তিনি রক্তকরবীতে আর মুক্ত-ধারায়। বলা হয়ে থাকে ও-দুখানা সিম্বলিক নাটক; অর্থাৎ, বাইরে যে-রূপ দেখা যায়, সেইটেই নাটকের আসল রূপ নয়। বাইরের এই রূপ যা প্রকাশ করে, নাট্যকারের মনে তা থেকে পৃথক কিছু কল্পনা আছে। কিন্তু কেবল তাই হলেই একখানা

নাটক সিমবলিক হয় না। তাকে প্রকট করবার মাধ্যম, অর্থাৎ অভিনয়ও, বাইরের রূপ, দৃশ্যপটের, পোষাক-পরিচ্ছদের রূপ, সবই অবাস্তব হওয়া অথচ অন্তর্নিহিত বিষয়ের নিগূঢ় সম্পর্ক প্রকাশক হওয়াও প্রয়োজন। কথাকলিতে এবং পিকিং অপেরায় রকম-বিশেষ সিমবলের পরিচয় পেয়েছি। মেটারলিঙ্কের ব্লু-বার্ডে আর কার্লকাপেকের আর-ইউ-আর নাটকে ভিন্ন এক রকম সিমবলিক প্রকাশ দেখিচি। 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারায়' যে ভাষা পাওয়া যায়, তাকে অভিনয় দ্বারা অর্থবাহক করতে হলে কোন প্রকার সাঙ্কেতিক অভিনয় বা মুদ্রা ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। শ্রমিকদের বা ধনিকদের বা পণ্ডিতের অথবা বিশু ও নন্দিনীর বাইরের রূপকে যদি বিশেষ কোন যুগের পরিচয় বহন করে এমন কোন রূপ না দিয়ে কথাকলির বা পিকিং অপেরার অভিনেতাদের রূপের মতো কোন-কালেরই-নয় এমন কোন রূপ দিই, যদি ওই সব চরিত্রের চুল, দাড়ী, ভ্রূ, গায়ের রঙ বিশেষ অর্থবহ করে সৃষ্টি করি, আর তাদের মুখে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়েছেন, যে-গান দিয়েছেন, তাই অপরিবর্তিত রাখি, তাহলে তা কি শোভন হবে, না সহ্য করা যাবে? যতক্ষণ না কোন প্রয়োগ-কর্তা নাটকখানিকে সেই ভাবে উপস্থাপিত করে তার সার্থকতা প্রমাণিত করছেন, ততক্ষণ ওর সিম্‌বলিক রূপ স্বীকার করে নিতে বাধবে। পরিষ্কার ধনতান্ত্রিক যুগকে ব্যক্ত করা হয়েছে রক্তকরবীতে। জনগণের সমবেত প্রয়াস যে সার্থক হতে বাধ্য, তাও প্রতিফলিত করা হয়েছে যেমন ওতে, তেমনই মুক্তধারায়। বাণীর মাঝে কোন আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতা কোথাও নেই, জীবনের গান আছে, যৌবনের জয়-যাত্রার নির্দেশ আছে, বিচার আছে, বিশ্লেষণ আছে, সর্বোপরি আছে সমন্বয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ। ওর রঙ লাল, কিন্তু সে লালিমা রক্তের নয়, আফিম-ফুলের নয়, রক্তকরবীর, মানব-অনুরাগের। বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনীত রক্তকরবী নাটকের অভিনয় দেখে কোন জার্মান দর্শক নাকি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে বলেছিলেন—শুনেছিলাম রক্তকরবী সিম্‌বলিক নাটক। কিন্তু অভিনয়ে তা ত দেখতে পেলাম না। সিম্‌বলিক নাটকের অভিনয় রিয়ালিষ্টিক কেন?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি কোন নির্দেশ রেখে গেছেন যাতে করে মেনে

নিতেই হবে নাটকখানি সিম্‌বলিক? তিনি তা বলেন নি, বলেছেন কোন-কোন সমালোচক। সিম্‌বলিক মানে যদি হয় রূপক, তাহলে বলা যেতে পারে সব নাটকই সিম্‌বলিক। আসলে সব নাটকই রূপক বা উপরূপক। ভরত তাই বলে গেছেন। বস্তুর রূপ মঞ্চে বাস্তবরূপে দেখালেই তা নাটক হয় না, ফটোগ্রাফ যেমন আর্ট হয় না। নাটকে বস্তুকে নিতে হয়, আর তাই নিয়ে নাট্যকারের মনের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে নিতে হয়। কিন্তু ততটুকু রঙই দিতে হয়, যাতে করে বস্তু বিকৃত রূপে প্রকাশ না পায়। অভিনয় ও প্রযোজনার প্রয়োজন হয় নাট্যকার যে রঙ দিয়েছেন, তাকে এমন মায়াময় করে তোলা, যাতে করে দর্শকরা নাটকে প্রতিফলিত বিষয় থেকে বস্তুটির পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা করে নিতে পারে। সেই পরিপূর্ণ রূপ বস্তুটির বাস্তব আকৃতিতে ব্যক্ত হয় না। নাটক বস্তুর বাস্তব প্রতিফলন নয়, বস্তুর ধর্মের প্রতিফলন। সকল আর্টেরই তাই। তাই সকল আর্টই রূপক। তাই সকল আর্ট-বিচারেই সচরাচর-শোনা 'ইজম'গুলি স্থান পেয়েছে। সিম্‌বলিজমও এই রূপকেরই একটা রূপ।

অচলায়তনে অতীত যুগের বিশেষ একটা আবহ সৃষ্টি করে রচনাকালের বিধি-নিষেধের নানা কুসংস্কারকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে বিংশ শতকে। তাই অচলায়তনকে সিম্‌বলিক বলতেও পারি। কিন্তু ডাকঘরে সেই অচলায়তনের শিশুকেই শুকিয়ে মারবার আর এক ব্যবস্থা যা অচলায়তনের ব্যবস্থার মতো অতটা স্থূল নয়, বর্তমানের আবহ, চরিত্রগুলি বর্তমানকালেরই। তারা বর্তমানকালেরই কথা বলে, তাদের চিন্তাও বর্তমানকালের। তাই ডাকঘরকে সিম্‌বলিক বলে ভাবি না, রিয়ালিষ্টিক বলেই মানি, যেমন রিয়ালিষ্টিক বলে মানি শোধবোধকে, যাতে বর্তমানের সমাজের এমন কতকগুলি দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয়েছে যাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে সতীশরা, নেলীরা, নন্দীরা কেমন করে ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক হবার চেষ্টায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজকে মেরুদণ্ড বিহীন করে ফেলে। 'তাসের দেশ'কে সিম্‌বলিক বলতে আদৌ বাধে না। যেহেতু ও একটা চিরন্তন কালের মানুষের নানা অভিমানের, নানা কল্পনার, নানা মোহের, নানা নির্বুদ্ধিতার অথচ চিরন্তন আত্ম-প্রসারের বিশেষ দৃষ্টি থেকে দেখা একটি মনোহর চিত্র।

কিন্তু রক্তকরবী ত তা নয়। ওর শ্রমিকরা সত্যিই শ্রমিক, ধনিকরা ধনিক, পণ্ডিতরা পণ্ডিত, শাসকরা শাসক। সংশয় জাগে ওর নন্দিনী, রঞ্জন, বিশুকে নিয়ে; আর সংশয় জাগে ওর রাজাকে নিয়ে। কিন্তু ওরা কেউ ত এমন কথা বলে না, যে-কথা আজকার রঞ্জন-নন্দিনীরা বলে না বা ভাবে না। যদি নাই বলত, নাই ভাবত, তাহলে ইন্‌ডাস্ট্রী কি আজ আর্ট হয়ে উঠতে পারত? বিজ্ঞানও যে আজ আর্ট হতে চাইছে ওদেরই মনের রঙের পরশ পাওয়া নবীন বিজ্ঞানীদের মানবতার চেতনা থেকে। ওই রঞ্জন-নন্দিনী বিশুই ত যুগে যুগে সকল দেশের সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে আত্ম-প্রকাশ করেছে। ওরাই যুগে যুগে ফুলের মতো ফুটে ওঠে। ওরাই যুগে যুগে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে থরে থরে মানব-ফুল ফুটিয়ে তোলে। ওরা কল্পনা নয়, ওরা বাস্তব। মানুষের যে-কোন আন্দোলনে ওদেরকে দলে দলে দেখা যায়। ওরা সত্য না হলে মানুষের কোন প্রয়াস সফল হয় না। যে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওদেরকে আমাদের দেখিয়েছেন, ওদের সে রূপ আমাদের সকলের চোখে ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না বলেই ত রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে কেবল রক্তকরবীতে আর মুক্ত-ধারাতেই নয়, তাঁর বহু নাটকে আমাদের ওদেরকে বার বার বিভিন্ন সাজে দেখিয়েছেন; সর্বদাই দেখিয়েছেন মুক্তির দূত রূপে। রক্তকরবীতে রঞ্জনকে আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু সমগ্র নাটকখানি তারই চিত্তরাগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নন্দিনীর মর্ম-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে। এই রঞ্জনের প্রতিষ্ঠা কামনা করে নন্দিনী-বিশু; মিথ্যার মর্ত্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা। সেই সত্য প্রথম প্রভাতের আলোর মতো। তার প্রকাশের মাধ্যম কাব্য। যে কাব্যের আশ্রয় নিয়েছিল ঋক্‌বেদ। কাব্যের মাধ্যমে এই আলোকে প্রতিফলিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দশখানি নাটকীয় রূপকে, অর্থাৎ নাটকে। সবগুলি সম্বন্ধে বলা হয় না যে, সেগুলি সিম্‌বলিক; কিন্তু রক্তকরবী আর মুক্তধারা সম্বন্ধে ও-কথা জোর দিয়েই বলা হয়। তার একটা কারণ বোধ করি বর্তমানের বাস্তবরূপের নির্মমতা আমরা এখনো স্বীকার করে নেবার মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি নি। এখনো আমরা ধনিকের, বণিকের, শাসকের, শোষণকে, বঞ্চনাকে, স্বেচ্ছা-চারকে মনে-প্রাণে অস্বীকার করতে পারি নি। আমাদের মনের অনেকখানি

যায়গা জুড়ে এখনো ভুল ধারণা রয়েছে যে, সমাজের কল্যাণ-কারণে ধনিকের বণিকের শাসকের প্রভুত্বের প্রয়োজন অনেক বেশি রয়েছে,—মানুষের মুক্তির চেয়ে, মানবতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে !

আমরা পিছু-হটে এগিয়ে যেতে চাইছি বলে মূল বিষয়টি দেখতে পারছি না। যখনই কোন রূপকের সাহায্যে তা আমাদের চোখের সামে বাস্তব রূপে দেখানো হচ্ছে, তখনই বলছি যা দেখানো হচ্ছে তা আসল বিষয় নয়, আসলের নকল রূপ, সিম্‌বল। ওই সিম্‌বল দেখে জানতে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে, যে আসল বিষয় ধর্ম-তত্ত্বের মতো গুহাতেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে ! রবীন্দ্রনাথ বার বার করে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, আমাদের বলে গিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টিকে যেন আমরা গুহায় নিহিত তত্ত্বের মতোই দুর্বোধ্য করে না রাখি আমাদের ঘোলাটে বুদ্ধির কুযুক্তি প্রয়োগ করে। তিনি যে কাব্যের সহায়তায় চিরন্তন মানবেরই মর্ম-শতদল বিকশিত করে গেছেন, সে-কথা আমরা ভাবতে চাই না। ভাবতে চাই না যে, সত্য-বস্তু না হলেও একমাত্র সত্যকেই প্রকাশ করে কাব্য কাব্য হয়। বেদ ওই করেই কাব্য হয়েছিল, সৃষ্টি-স্থিতির প্রেরণা হয়েছিল। মেঘদূত ছিল কল্পনা, কিন্তু যক্ষের বিরহ ছিল সত্য। তাই মেঘদূত কাব্য হলো। মানুষের ওই বিরহ চিরন্তন সত্য ; অগস্ত্যের পিপাসার মত ওর পিপাসার নিবৃত্তি হয় কাল-পারাবার সমগ্রভাবে পান করবার আগে নয়। ওই পিপাসার নিবৃত্তি হয় কেবলমাত্র মহাপরিনির্বাণে, জীবন-মৃত্যু অতিক্রান্ত পরম মুক্তির মাঝে।

যুগে যুগে মানুষ এই মুক্তি পেতে চেয়েছে ; সব-কিছু ছেড়ে একেই একমাত্র সত্য বলে বুঝে এর স্বাদ আস্বাদ করতে চেয়েছে। কিন্তু তাও আবার মানুষের নানা বন্ধনেরই কারণ হয়েছে। বুদ্ধ চেয়েছিলেন মানুষের মনকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ; সুখ-দুঃখের, শোক-হর্ষের, এমন কি জীবন-মৃত্যুর প্রভাব থেকেও মুক্ত করতে। মানুষের মন যাতে সেই ভাবে গড়ে ওঠে, তার জন্য তিনি অনেক নিয়ম-আচারের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন কথ্য-ভাষায়, প্রাকৃতে রূপ দিয়ে। তাঁর অনেক আগে বেদ এবং ব্রাহ্মণও তাই করেছিলেন। কিন্তু আগেকার নিয়ম-আচার যেমন শৃঙ্খল হয়ে উঠল, বুদ্ধের

নিয়ম-আচারও তেমনই শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল। শৃঙ্খল আবার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকেই জাগিয়ে তোলে। অশোক যখন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এই শৃঙ্খল খুলে দিলেন, যখন অহিংসাকে অজেয় বলে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন, শাসককে যখন মানবের সর্বকল্যাণের আকর করে তুল্লেন, তখন শৃঙ্খল-মুক্ত থেকেও মানুষ আবার মাকড়সার মতো জাল বুনে-বুনে নিজেকে তাতেই জড়িয়ে ফেল্ল। বুদ্ধ রাজত্ব ছেড়ে এসেছিলেন যে-মানুষকে মুক্তি দিতে, অশোকের সু-শাসিত সাম্রাজ্য, সংঘাত-বিবর্জিত অহিংসা-ধর্মের রাজচক্রবর্তীত্ব, সেই মানুষকেই আবার এতটা ক্লিষ্ট, এমনই পঙ্গু, এতই দুর্বল করে ফেল্ল যে, তাদের মাঝে এমন একজন মানুষের সৃষ্টি হলো না, যে অশোকের সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত। অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য-সৌধও ভেঙে পড়ল, আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁরও সাম্রাজ্য যেমন ভেঙে গিয়েছিল। বুদ্ধ যা চেয়েছিলেন, অশোক তা করেন নি। বুদ্ধ চেয়েছিলেন, মানুষকে সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় করতে। অশোক সাম্রাজ্যকে মানুষের চেয়ে বড় করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের মানুষ দীর্ঘকাল সশস্ত্র, নিরস্ত্র, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সংঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে বুদ্ধের বাণীকে, বেদ-ব্রাহ্মণের বাণীকে, নিজেদের অন্তরের আলোকে একদা এমনই উদ্‌ভাসিত, প্রকট, দেখতে পেল যে, সেদিনকার ভারতীয় মানুষ সংঘাতকে, মত-বিরোধকে, আর জিইয়ে রাখবার সার্থকতা খুঁজে পেল না, সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, অধীর হয়ে উঠল দিকে দিকে এই বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য যে, মানুষের অনন্ত আত্ম-প্রকাশের অধিকার স্বীকৃতির মাঝে, মানুষের অনন্ত স্বাধীনতাকে মানুষের জন্মগত অধিকার রূপে বরণ করে নেবার মাঝেই রয়েছে মানুষের পরম-পরিণতির সম্ভাবনা। ভারতের মানুষ নব-জন্মলাভ করল। সৃষ্টি হলো নব-নব কাব্য, নূতন-নূতন দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান। শুরু হোলো দিকে দিকে ভারতীয় পরিব্রাজকদের মানব-স্বাধীনতার বাণী প্রচারের অভিযান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। সর্ব পূর্ব এশিয়ায় শুরু হোলো প্রবল এক আলোড়ন। প্রাচীর ভেঙে গেল, খুলে গেল সকল রুদ্ধ-দ্বার। দলে দলে তীর্থ-যাত্রী যুগে যুগে যাওয়া-আসা করতে লাগল দেশ-দেশান্তরে—দিবে আর নিবে, মিলিবে

মিলাবে যাবে না ফিরে, এই হোলো মানব জীবনের ধ্যান, ধারণা ও সাধনা। রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিরন্তন যাত্রার এই রূপ দেখেছিলেন। ঠিক এমন করে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্বের আর কোন কবি কালের যাত্রার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন কিনা, নিশ্চিত করে তা আমার জানা নেই। তবে অপরাজেয়, অজেয়, প্রাণ-প্রাচুর্যে শক্তিমান, মানব, প্রকৃতি, জীবন, মরণ, মানুষের পরম পরিণতির দিক থেকে দেখবার দিব্যজ্ঞান বাংলা নাটকের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ যে রূপায়িত করেছেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি তার কাব্য উপন্যাসে যা করেছেন, তাঁর নাটকে তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন কালের যাত্রায় মানুষের মহান দান। সমসাময়িক সমস্যা ও সংঘাত অতীতের সমস্যা ও সংঘাত থেকে পৃথক হলেও মূলতঃ বন্ধন ও মুক্তির, আঁধারের ও আলোর, মিথ্যার ও সত্যের প্রতিষ্ঠার সংঘাত হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপ পেয়েছে। জাগ্রত জীবন্ত মানুষের চিন্তা ওতে রূপ পেয়েছে বলেই মানুষের ভাষা হয়েছে ওর মাধ্যম, কাব্য হয়েছে ওর প্রাণ। ওর মুদ্রা হয় না, ওর সিমবলিক অভিনয় সম্ভব নয়। ও একান্ত করেই বর্তমানের—কবির দৃষ্টিতে দেখা, সত্যাশ্রয়ী ঋষির দৃষ্টিতে দেখা, বর্তমানের। ওকে তাই দেখতে হবে যে-ভাবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সেই ভাবেই। কিন্তু সে দৃষ্টি আমাদের নেই। তাই যে ভাষাকে, যে সঙ্গীতকে, যে নৃত্যকে উনি মাধ্যম করেছেন, তাই থেকেই ওর রূপ পরিকল্পনা করতে হবে। ওকে সিম্‌বল বলে ধরে সিমবলিক অভিনয় দ্বারা ওর রূপ প্রকট করবার চেষ্টা হাস্যকর হবে—অন্তত রক্তকবরী মুক্তধারার ত বটেই। আধুনিক নাটকের ব্যাকরণের বিচারে ওর যে দোষ ধরা পড়বে, তাকে নাটকের আধুনিক ব্যাকরণ সম্মত করবার চেষ্টা করলেও তা আধুনিক হবে না। অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে ও-নাটক মানুষের চিরন্তন জীবন-নাট্য।

ও-সব নাটকে যে রাজা দেখতে পাই, সে রাজা সভরেণ নয়, য়্যাব্‌সলিউট মনার্ক নয়, ভগবানের প্রতিনিধিও নয়; সে রাজা মানুষ। মানুষের শক্তি, মানুষের দুর্বলতা নিয়েই সে গড়া; মানুষের লোভ, মানুষের দম্ভ তাকেও স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, মানুষের অন্তরের সংঘাতের মতো সংঘাত তারও অন্তর

ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়,—আবার মানুষের ত্যাগের মহিমা দেখে, বীর্যের পরিচয় পেয়ে, সাধনার নিষ্ঠা দেখে, মুক্তির আনন্দ লক্ষ্য করে, সিংহাসন দুর্গ প্রাসাদ প্রাকার তুচ্ছ মনে করে মানুষের চলার পথে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, যেমন অচলায়তনে এসেছিল, বিলম্বে হলেও নিশ্চিত করে এসেছিল তপতীতে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর আবির্ভাব অরূপ-রতনের রাজার। রাণী রাজাকে কখনো চোখে দেখতে পান না, শুধু বাণীই শোনেন, নির্দেশই পান। তাঁর মন তাতে ভরে ওঠে না। তিনি অনুরোধ করেন, অভিমান করেন, বিরক্ত হন, রাগও করেন। রাজার কিন্তু সেই একই বাণী—সময় হলেই দেখা দেবেন; সেই একই বাণী যা সন্ন্যাসী উপগুপ্ত শুনিয়েছিলেন নগরের নটী বাসবদত্তাকে। আসে এক নকল রাজা। রাণী তাকেই রাজা বলে স্বীকার করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু নকল রাজার সকল চাতুরী প্রকাশ পেতে বিলম্ব হয় না। রাজ্য যায়, গ্লানিতে রাণীর বুক জ্বলে ওঠে। রাণী প্রাসাদ থেকে পথে বেরিয়ে পড়েন। চোখের জলের ভিতর দিয়ে তিনি পথ দেখতে পান না, জন-কোলাহলে শুনতে পান না কানে; লক্ষ্যহারা, দিশাহারা তিনি, কোন্ দিকে যাবেন, কি করবেন, বুঝতে না পেরে হৃদয়-রাজের উদ্দেশে অন্তরের শেষ আবেদন নিবেদন করেন। বেজে ওঠে রাজকণ্ঠের অভয়-বাণী, পরম মুক্তির বাণী। বন্ধন থেকে মুক্তি পান রাণী।

এই যে রাজাকে রবীন্দ্রনাথ নাটকে-নাটকে রূপ দিয়েছেন, এ হচ্ছে মানুষ-রাজা। মানুষের মতোই এই রাজারাও মোহ-জাল বোনেন, কিন্তু সংঘাত থাকে বলেই রাজাও থাকেন, মানুষও থাকেন; শুধুই রাজা হন না। শুধু রাজা হয়ে থাকতে দেয় না অচলায়তনের ডাকঘরের শিশুরা, দেয় না রঞ্জন-নন্দিনীরা, দেয় না তপতীরা, মালিনীরা, দেয় না বিশুরা, বাউলরা, ধনঞ্জয়রা, দাদা-ঠাকুররা। এদের ডাকেও রাজাদের মাঝেকার মানুষ জেগে ওঠে না, এমন রাজাও থাকে। মুক্তধারায় সে থাকে অক্ষমের মতো। আত্মত্যাগের মুক্তধারা সে রোধ করতে পারে না। তাসের দেশে তার কাণ্ডকারখানা হয় শিশুদেরও হাসির উপকরণ। এরা, আগেই বলেছি, অবাস্তব নয়। যুগে-যুগে এদের আবির্ভাব, এদের প্রভাব, মানুষ দেখেছে। কিন্তু নাটকে এরা কল্পনা।

নাটকের সব চরিত্রই কল্পনা, ঐতিহাসিক চরিত্রও। এমন কি নাটকের অষ্টম হেনরীও, হয়ত এলিজাবেদের পিতা বলেই, বাস্তবরূপে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হননি। চারিত্রিক বাস্তবতায় ওথেলো-ইয়াগোর সংমিশ্রণ ছিলেন তিনি, যদিচ প্রজারা তাঁকে বলত 'গুড্ কিং হ্যারি!'

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক তাঁর গল্প কবিতার নাট্যরূপ, তাঁর নিজেরই দেওয়া, এবং অনেকগুলি মৌলিক। তাঁর গল্প কবিতা যেমন বাংলা সাহিত্যকে বিদেশে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাঁর মৌলিক নাটকগুলিও তাই দিয়েছে। সেই মৌলিক নাটকের রূপ শুধু বাংলা নাটকেরই রূপ নয়, শুধু ভারতীয় নাটকেরই রূপ নয়, বিশ্ব-নাট্যেরও রূপ; যদিচ ইউরোপ-আমেরিকার নাট্যরূপের সঙ্গে তাদের মিলও যতখানি, অমিলও ততখানি।

## ( ১৩ )

## বঙ্কিম, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ

মাইকেল দীনবন্ধুর বাংলা নাটককে যে রূপ দিয়েছিলেন, সে রূপকে রবীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গসুন্দর করেছেন সামাজিক নাটক শোধবোধে, কমেডি অব ম্যানার্স 'চিরকুমার সভায়', কমেডি অব এরারস 'শেষ রক্ষায়'। কিন্তু সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-নাট্যকে তিনি ভারতীয় রূপ দিতে চেয়েছেন গৃহপ্রবেশ নাটকে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বাস্তব-সংঘাত ঘটিয়ে। যে পাত্রকে অবলম্বন করে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই পাত্রকে ইচ্ছে করেই তিনি মেটিরিয়াল প্লেন থেকে বেছে নিয়েছিলেন। স্পিরিচুয়াল চেতনা ছিল না বলেই পাত্র সংঘাতে ভেঙে পড়ল। সে হোলো ফ্রাস্ট্রেশনের অমোঘ ফল। তাই রূপান্তর ঘটল না, নাটকেরও কোন বাণী রইল না। অভারতীয় হোলো। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ দ্বিতীয় চরিত্র নিয়ে আর নাটক লিখলেন না।

রবীন্দ্রনাথ যে বছরে রাজা ও রাণী লেখেন, সেই বছরেই গিরিশ লেখেন প্রফুল্ল। গিরিশ জনা লেখেন মালিনী রচিত হবার এক বছর আগে ১৮৯৪

খ্রীষ্টাব্দে, ম্যাকবেথের অনুবাদ করেন বিসর্জন আর মালিনী রচিত হবার মধ্যবর্তী সময়ে। এ-কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সমসাময়িক দুই নাট্যকারের নাটকের রচনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টি আর গদ্য ও পদ্য ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনার সুবিধা হবে বলে।

কর্মের দিক দিয়ে রাজা ও রাণীকে এবং বিসর্জনকে জনা, প্রফুল্ল, আর ম্যাকবেথকে যদি মোটামুটি এলিজাবেদীয় যুগের রীতি অনুসৃত বলি, তাহলে অন্যায় বলা হয় না মনে করি। ভাষার দিক দিয়ে রাজা ও রাণীর ভাষার চেয়ে জনার ভাষা অথবা রাজা ও রাণীর গদ্য ভাষার তুলনায় প্রফুল্লর ভাষা, সম্পদে, শক্তিতে বা বাঙালীত্বে দীন ও শ্রীহীন বলবার কারণ নেই। বিসর্জনের পদ্য জনার পদ্যের চেয়ে বেশি লালিত্যপূর্ণ, এবং সেই কারণে বেশি বাঙালী। রবীন্দ্রনাথ নিজে রাজা ও রাণীর কাঠামো ও ভাষার পরিবর্তন করে-ছিলেন এবং নাটকেরও নাম দিয়েছিলেন তপতী। কিন্তু তপতী গঠনে রবীন্দ্রনাথ অধিকতর পাশ্চাত্ত্য রীতি অর্থাৎ অধিকতর আলোচনা-বহুল করেও নাটককে 'রাজা ও রাণী'র চেয়ে বেশি জনপ্রিয় করতে পারেন নি। 'রাজা ও রাণী' বেশ জনপ্রিয় ছিল, এবং প্রফেশনাল মঞ্চে অর্থাৎ ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, শিশিরকুমারেরও আবির্ভাবের আগে। শিশিরকুমার তপতী মঞ্চস্থ করেছিলেন। কিন্তু তপতী জনপ্রিয় হয় না। গিরিশের ম্যাকবেথও জনপ্রিয় হয় না; কিন্তু অভিনীত যখন হয়, তখন অনুবাদের ও অভিনয়ের প্রচুর সুখ্যাতি হয়। প্রফুল্ল ও জনা শুধু কোলকাতায় নয়, সারা বাংলা দেশে প্রচুর জন-সমর্থন পেয়েছিল। জনা প্রধানত শোকোচ্ছ্বাস, সুতরাং বাঙালীর ভালো লাগবেই। আর প্রফুল্ল কোলকাতায় জনপ্রিয় হয় তিনটি কারণে। প্রথম কারণ কোলকাতায় তখন কায়স্থরা সমাজপতি। মুৎসুদ্দিদের আর্থিক নেতৃত্ব ক্রমশ উকিল ব্যারিষ্টাররা, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা, কেড়ে নিচ্ছে; কায়স্থ যৌথ-পরিবারে ভাঙ্গন ধরেছে, উকিলী দুষ্টবুদ্ধি তার সহায়তা করছে, যার জন্য গিরিশ যোগেশকে দিয়ে বলিয়েছেন, উকিল কী চীজ রে, বাবা। (আজকার পিপলস্ ডেমোক্রেসীগুলি উকিলকে ব্যক্তিগতভাবে প্রোফেশন করতে দেয় না, সমাজ-ব্যবস্থা পরি-

বর্তিত হওয়ায় দরকারও হয় না।) তৃতীয় কারণ মদ্যপান তখন সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছে এবং সুরেশের মতো তরুণরাও দালালদের প্ররোচনায় বারাঙ্গনা-সংস্রবে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য সমাজের ও ব্যক্তির নৈতিক মানদণ্ড উন্নত করবার জন্য শিক্ষিতরা তখন ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে তুলেছেন, ব্রাহ্মণরা বঙ্কিমের আদর্শে সমাজ পুনর্গঠনের জন্য নব্য-বাবুদের সঙ্গে (হিন্দু ও ব্রাহ্ম) থেকে থেকে সংগ্রাম করে চলেছেন। কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়া সংগঠনের সত্যিকারের প্রয়াস বড় কেউ করছেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে, স্বামীজির উদাত্ত আহ্বান দিকে দিকে পাঞ্চজন্যের মতো বেজে উঠ্‌ছে। তবুও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী ভেসে বেড়ানোই প্রগ্রেস বলে ধরে নিয়েছে। এই ভেসে বেড়াবার আনন্দ পাবার জন্য অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছে, ব্রাহ্ম হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরে ধর্ণা দিয়েছে, পানাসক্ত হয়েছে, দুর্নীতি-পরায়ণ হয়েছে। তাই দেখা যায় তখনকার সামাজিক উপন্যাসের ও নাটকের প্রায় সব নায়কই নেগেটিভ; সংঘাতে স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, ভেসে যায়। বঙ্কিমের নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল, ব্রজেশ্বর, নবকুমার, মহেন্দ্র, ভবানন্দ, এমন কি জীবানন্দও তাই। চন্দ্রশেখরের চন্দ্রশেখর ঠিক তা নয়। কিন্তু গিরিশের যোগেশ তাই, করুণাময় তাই, প্রসন্নও তাই। অথচ সকলেরই বিবেক, বিচারবুদ্ধি, কারু কারু কর্মশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতই ওদের কেউ দুর্নীতিপরায়ণ নয়। ওই সব চরিত্র দুর্বল বলে নিন্দিত হয় নি, বিদ্রোহ করবার প্রবৃত্তি পায় নি প্রধানতঃ অদৃষ্টবাদী বলে, এবং দ্বিতীয়ত প্রচলিত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে। বিধবা বিবাহ সমাজ সমর্থন করেছে জেনেই এবং জানিয়েই নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করেন। হরলাল বলেছিল সে ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করে রোহিণীকে বিবাহ করবে। তাতে সে খারাপ লোক বলে নিন্দিত হোলো। গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীর প্রেমে আত্মহারা হয়েও রোহিণীকে রাসবিহারীর আসক্ত জেনে তাকে হত্যা করে শুধু সমাজের দণ্ড থেকেই নয়, আদালতের দণ্ড থেকেও অব্যাহতিও পেল; এবং কয়েক বছর পরে সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে এসে মৃত-পত্নীকে স্মরণ করে 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' বলে যখন অনুশোচনা ব্যক্ত করল, তখন পাঠকদের সহানুভূতি পেল। ব্রজেশ্বর পিতার

আদেশে দেবী-প্রফুল্লকে ত্যাগ করল, চুরি-ডাকাতি করে খেতে স্ত্রীকে আদেশ করল, আরো দুটো বিয়ে করল, তারপরও দেবী-রাণীর 'পতি পরমগুরু' হয়েই রইল।

এমনই অধিকাংশ বঙ্কিম-চরিত্রে প্রতিবাদ থাকলেও সমাজতন্ত্রের সামে আত্মসমর্পণ আছে। সংঘাত সৃষ্টির আয়োজন আছে, কিন্তু চরিত্র অধিকাংশই মেরুদণ্ড বিহীন বলে সে সংঘাত বজ্র সৃষ্টি করে নি; কিছু তর্জন-গর্জন শুধু প্রকাশ পেয়েছে। এ তখনকার বাঙালী চরিত্র। ওই চরিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়েই তখনকার বাঙালী-সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু স্ত্রী চরিত্রগুলি ঠিক ওরকম নয়। তখনকার বাঙালী স্ত্রীলোকরা পুরুষের মতো ভেসে বেড়ায় নি। তারা সংসারকে আঁকড়ে ধরে থাকত, সৃষ্টিধরদের লালন-পালন করত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা রেখে। তাদের মাঝে যারা বিদ্রোহ করত, তারা সমাজে স্থান যেমন পেত না, তেমন স্থান করে নিতেও চাইত না। অন্যায় অবিচার তারা সইত, কিন্তু সহের সীমা অতিক্রান্ত হলে তারা বিদ্রোহ করত, আপোস করত না। তাদের বিদ্রোহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল আত্ম-বিসর্জন,—এক রকম নয়, অনেক রকম। তুলনা করলে দেখা যাবে বাঙালী সাহিত্যিকদের হাতে স্ত্রী-চরিত্র পুরুষ চরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত, অনেক বেশি বর্ণবহুল, এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বিদেশী সাহিত্যে পুরুষ চরিত্র তুলনায় কম দৃঢ়, কম বর্ণবহুল, কম চিত্তাকর্ষক নয়। এর কারণ বিদেশে স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা সম-অধিকার সম্পন্ন হতে চেয়েছে, আর বাঙালী সমাজের বোঝা বেশির ভাগ বহন করেছে স্ত্রীলোক, মায় বাঙালীর ধর্মকর্ম, স্বপ্ন-আদর্শ, বংশের প্রদীপদেরকে ত বটেই। সংসারে সমাজে যে দুঃখ, দাহ, বঞ্চনা, বন্ধন বাঙালী স্ত্রীলোকদেরকে সইতে হতো—তার ব্যথা, তার জ্বালা, তার গ্লানি সহানুভূতিশীল লেখকরা অপনোদন করতে চাইতেন, তাদের নারীত্ব, মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, তাদের ব্যথা, জ্বালা, গ্লানি, বঞ্চনা, সাহিত্যে গৌরবদীপ্ত করে তুলে ধরে! আদর্শের কথা, আত্মদানের কথা, পুণ্যসঞ্চয়ের কথা নারীর সম্বন্ধে লেখকেরা যত প্রয়োগ করেছেন, পুরুষ সম্বন্ধে তত করেন নি। তার জন্য পুরুষ-পরিচালিত সমাজের দোষ-স্খালনের কিছুটা চেষ্টা যেমন আছে, যেমন

আছে লেখকদের মনের রোমান্টিক আইডিয়া, তেমন নিঃসন্দেহে আছে বাঙালী-নারীর সত্যিকারের দৃঢ়তা, সার্থোর্দ্ধ-সেবাপরায়ণতা, সর্বোপরি ক্ষমা করবার অনুপম উদারতা। স্নেহ মায়া মমতার কথা বলছি না এই জন্যে যে, ও-সব প্রায় সর্বত্রই নরের চেয়ে নারীতেই বেশি দেখা যায়।

গিরিশের প্রফুল্ল এমনই একটি নারী-প্রদীপ যাকে বাঙালী নারীর প্রতীক বলে মনে করতে বাধে না। গিরিশ নাটকের নাম দিয়েছেন প্রফুল্ল, যোগেশ দেন নি, সংসারও দেন নি। নাটকে প্রফুল্লর অংশ আকারে বড় নয়, কিন্তু উজ্জ্বলতায়, দৃঢ়তায়, দানে সবচেয়ে বড়। একমাত্র প্রফুল্লই ভাসে নি। যোগেশ ত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েইছে, রমেশ-সুরেশও তাই। উমাসুন্দরীর প্রতিরোধ করবার শক্তি কোথা থেকে আসবে! তিনি ত কাশী যাবার জন্য পা বাড়িয়েই ছিলেন। জ্ঞানদা কিছু চেষ্টা করেছিলেন ভেসে-চলা স্বামীকে ধরে রাখতে। কিন্তু তিনিও অসহায়া হয়ে পড়লেন যখন শেষ সম্বল গয়নার বাক্সও গেল। কেবল প্রফুল্লই ভাসল না। মাটির প্রদীপের মতো সে সংসারের ঘন অন্ধকারে স্নিগ্ধ আলো জ্বেলে রাখল। ঝড়-ঝাপ্টায় সে দীপ নির্বাপিত হোল না, স্বামীর ছলনাময় আবেদনে তা ম্লান হলো না, তার ক্রোধের দমকা হাওয়ায় তা নিভে গেল না। কিন্তু সেই মৃদু আলো দেখে ভয় পেয়ে মৃত্যু সরে গেল যেমন তার সাম্নে থেকে, তেমনই যে আলোটুকু সে তার হৃদয়ের স্নেহ ঢেলে জ্বালিয়ে রাখতে চেয়েছিল, বংশের প্রদীপ সেই যাদবেরও সাম্নে থেকেও। খাঁটি ভারতীয় নাটক হলে এই কথাটি বলবার জন্য এত বাইরের ঘটনা এনে ফেলতে হোত না। পুলিশ, কাঙালীচরণ, জগমণি, মদনঘোষ কিছুই আনতে হোত না। কিন্তু গিরিশ পাশ্চাত্ত্য নাটকের গঠন নিয়েছিলেন। হত্যা অথবা হত্যার ষড়যন্ত্র, মানুষের সংযম বিহীন একটানা অধঃপতনের চিত্র নাটকীয়তা সৃষ্টির পক্ষে যে-যুগে অপরিহার্য ছিল, যে-যুগে ইংরেজ জাতি সারা পৃথিবীতে হত্যার উৎসব করে ফিরত, সেই এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যরীতিকেই তিনি যে রূপান্তরিত করে ন্যাশনাল করতে চেয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল, তখনকার সাধারণ বাঙালী চরিত্রের ভেসে যাবার প্রবৃত্তি। তা সত্ত্বেও গিরিশ যে সম্পূর্ণ সমাজ-সচেতন ছিলেন, প্রফুল্ল, বলিদান ও শাস্তি কি শান্তি, তার প্রমাণ বহন করে। সমাজ-

সচেতন ছিলেন বলেই তিনি হয়ত ডিকেন্সের দৃষ্টি-কোণ থেকেও সমাজকে দেখেছিলেন। কাঙালীচরণ জগমণি ধরনের চরিত্র দেখে তাই মনে হয়। তিনি নাটক লেখবার আগে ইবসেন (১৮৫০-১৮৯০) নাট্যজগৎকে তার দানে সমৃদ্ধ করে অমৃতলোকে চলে গেছেন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে ছাড়া তখন বাঙলা নাট্যজগতের পরিচয় একমাত্র মলেয়ার ছাড়া আর কারুর সাথেই হয় নি। গিরিশকে যে ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্যের ইউনিভার্সিটে উইট্সরা আকৃষ্ট করেন নি, (সম্ভবত কোন বিদেশীকেই করে নি) রেষ্টোরেসন যুগের ইংরেজী নাটকও করে নি (করবার কথাও নয়) অস্কার ওয়াইল্ড করেন নি, এমন কি সমসাময়িক ভিক্টোরিয়ান নাট্যকাররাও করেন নি, তা তাঁর সামাজিক নাটকের বিষয়-বস্তু ও জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। গিরিশ যদি সেই দিনে পিনেরো প্রমুখ নাট্যকাররা যে নাটক লিখে গিয়েছেন, সেই ধরনেরই নাটক লিখতেন তা হলে বাঙালী জাতি যে বেশি উপকৃত হোতো, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই।

প্রফুল্ল লেখা হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, বলিদান ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, শাস্তি কি শান্তি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, গৃহলক্ষ্মী গিরিশ সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। নাটকখানি সমাপ্ত করেন দেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙবাবু), যিনি 'ওথেলো' অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটকখানি অভিনীত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লেখেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ওইখানিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। কপালকুণ্ডলা লেখেন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, মৃণালিনী লেখেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক যে-বছরে বাগবাজারের দল ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বছরে। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দ মঠ প্রভৃতি বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাস বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ উপন্যাস সীতারাম প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

গিরিশের সামাজিক নাটকে সমাজ-প্রতিফলন বেশি সার্থক হয়েছে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের চেয়েও। চরিত্র হিসেবে গিরিশের সামাজিক নাটকের চরিত্রগুলি বঙ্কিমের চরিত্রের তুলনায় কম রোমাণ্টিক এবং বেশি বাস্তব।

বঙ্কিম ভাষাকে যে সরসতা ও সারল্য দিয়েছিলেন, গিরিশের সামাজিক নাটকে তা আরো সরস, আরো সরল হয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলির সংলাপে মাঝে-মাঝে যে উচ্ছ্বাস-প্রাচুর্য রয়েছে, (যেমন, রোহিণীকে গোবিন্দলাল যখন ভৎর্সনা করছে, অথবা প্রতাপ যেখানে শৈবলিনীকে তিরস্কার করছে) সে উচ্ছ্বাস গিরিশের নাটকে নেই। চরিত্রের দৃঢ়তায় এবং বৈচিত্র্যে গিরিশের নাট্য-সাহিত্য বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যের চেয়ে দীন নয়, যদিচ নাটকীয়তা সম্বন্ধে তখনকার দিনের ধারণার জন্য, আকস্মিক কতগুলি ঘটনা সৃষ্টির জন্য; কোথাও কোথাও দুর্বল হয়ে পড়েচে।

যোগেশ, করুণাময়, প্রসন্ন শুধু যে অভিনয়ের গুণেই 'সৃষ্টি' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তা নয়, চরিত্রগত সম্পদের জন্যও অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তারা সকলেই সংগ্রাম করেছে, যদিচ ভেঙ্গে পড়েছে, অথবা পরাজয় স্বীকার করে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। গিরিশ রোমান্টিক চরিত্র সৃষ্টি করতে চাইলে তা করতেন না। তখনকার বাস্তব জীবন প্রতিফলিত করবার জন্য আর কিছু করা অশোভন হোতো, অসঙ্গত হোতো। চরিত্র-সৃষ্টিতে গিরিশের উপর বঙ্কিমের প্রভাব বিশেষ দেখি না।

বঙ্কিমের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আবার রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে দাদাঠাকুর, ধনঞ্জয়, বিশু-পাগলা, বাউলদের আকস্মিক দেখা পাই, তাদেরই যেন পূর্ববর্তীদের দেখা পাই অবধূত হিসেবে, আনন্দেরহো হিসেবে, মদন ঘোষ হিসেবে, বিদূষক হিসেবে, কঞ্চুকি হিসেবে। সংস্কৃত নাটকেও ওদের দেখা পাওয়া যায়। যাত্রার পালায় ওরা ত অপরিহার্য। নাটকের ভাবগত ইউনিটি বজায় করে রাখতে ওই চরিত্রগুলি সংস্কৃত নাটককেও সাহায্য করেছে, যাত্রার নাট্যকারদেরও সাহায্য করেছে, সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথকেও।

ভিক্টোরিয়া যুগের মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলালের দান এই জাতির পক্ষে ওই যুগের ইংরিজি নাটকের তুলনায় নগণ্য নয়। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ওই যুগের ইংরেজী নাট্যশালা অবশ্য অনেক অগ্রসর ছিল। ওই যুগ (১৮৩০-১৮৯০) ইংরেজের নাটকের অবনতির যুগ। কিন্তু ইবসেনের প্রতিষ্ঠা

হয় ওই যুগে ( ১৮৫০-১৯০১ )। গিরিশ-অমৃতলালে ইবসেনের কোন প্রভাব আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে অবশ্যই আছে, যদিচ তিনি তাকে ভারতীয় করে নিয়েছেন, এবং তাতে করে তিনি বাংলা নাটকের মান অবনত করেন নি। জর্জ বার্ণার্ড শ' ভিক্টোরিয়া যুগোত্তীর্ণ হবার পর নাটক রচনা শুরু করেন; রবীন্দ্রনাথের যুগ, গিরিশের যুগ, তাঁর বিকাশের যুগ। তাঁর প্রভাব গিরিশে নেই, অমৃতলালে কিছু থাকতেও পারে, রবীন্দ্রনাথেও আছে বলে মনে হয়। গ্যয়টের আর রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে এক প্রণালী বয়ে চলেছে তা দেখি ফাউষ্টের Prologue for the; Theatre আর রবীন্দ্রনাথের নটরাজ-কবি-রাজার নানা সংলাপে।

তাদের দেখা পাই 'নবীনে', 'শেষ-বর্ষণে', 'শারদোৎসবে', 'ফাল্গুনী'তে। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতির বিশেষ একটা রূপ মেটারলিঙ্ক-গ্যয়টের পরশ নিয়েও ভারতীয় এবং একই সঙ্গে সর্বজনীন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ঐ নাটকগুলিতে তা দেখা যায়। তার কিছু দৃষ্টান্ত দিই:

রাজা: পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ: কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতটাকে তো কেউ ধরে ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস। তারপর জগতে তার মত অদরকারী আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে, তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা: পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বল। পালালো কেন?

নটরাজ: পাছে মহারাজ বলে বসেন ভাব, অর্থ, সুর, তান, লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড় ভীতু।

রাজা: তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ: ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালায়নি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে-মেঘে রঙ ছড়িয়ে আছে।

রাজা : তুমি বুঝি সেই মেঘ ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড় সাদা।

নটরাজ : ভয় নেই মহারাজ। এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা : আমাকে বোঝাবে কে ?

নটরাজ : সে ভার আমার উপর। ইসারায় বুঝিয়ে দেবো।

রাজা : পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে ?

নটরাজ : বর্ষাকে আহ্বান করে।

রাজা : এই আশ্বিন মাসে ?

নটরাজ : কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ, তারপরে আলো।

রাজা : ওহে নটরাজ, রস জিনিষটা স্পষ্ট নয়, রাগিনী জিনিষটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা নাই পাই, রাগিনীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলে, তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ : মহারাজ, গাঁটছড়ার বাঁধন কি বাঁধন ? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়ে উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয়ে একাত্ম।

এখন গ্যয়টে থেকে কিছু দেখা যাক্ :

Manager

For to be plain, I love to see the throngs,
As to our booth the living tide progresses ;
Still in broad daylight, ere the clock strikes four,
With blows their way towards the box they take ;
And, as for bread in famine, at the baker's door,
For tickets are content their necks to break.
Such various minds the bard alone can sway,
My friend, oh work this miracle today !

Poet

Oh of the motley throng speak not before me,
At whose aspect the spirit wings its flight !
Conceal the surging concourse, I implore thee,
Whose vortex draws us with resistless might.
No, to some peaceful heavenly nook restore me,
Where only for the bard blooms pure delight,
Where love and friendship yield their choicest blessing,
Our heart's true bliss with god-like hand caressing.
What in the spirit's depths was there created,
What shyly there the lip shaped forth in sound ;
A failure now, with words now fitly mated,
In the wild tumult of the hour is drowne'd ;
Full oft the poet's thought for years hath waited
Until at length with perfect form 'tis crowned ;
What dazzels, for the moment born, must perish ;
What genuine is posterity will cherish.

Merryman

This cant about posterity I hate ;
About posterity were I to prate,
Who then the living would amuse ? For they
Will have diversion, ay, and 'tis their due.

*   *   *   *   *

To work, then ! Give me a masterpiece, my friend ;
Bring fancy with her choral trains before us,

Sense, reason, feeling, passion, but attend !
Let folly also swell the tragic chorus.

Manager

You give a piece, abroad in pieces send it !
'Tis a ragout—success must needs attend it ;
'Tis easy to serve up, as easy to invent,
A finish'd whole what boots it to present !
Full soon the public will in pieces rend it.

Poet

How mean such handicraft as this you cannot feel !
How it revolts the genuine artist's mind !
The sorry trash in which these coxcombs deal,
Is here approved on principle, I find.

Manager

Such a reproof disturbs me not a whit !
Who on efficient work is bent,
Must choose the fittest instrument.

*   *   *   *   *

What dreams beguile you on your poet's height ?
What puts a full house in a merry mood ?
More closely view your patrons of the night !
The half are cold, the half are rude.
One, the play over, craves a game of cards ;
Another a wild night in wanton joy would spend.

Poor fools the muses' fair regards.
Why court for such a paltry end ?

Poet

Depart ! elsewhere another servant choose
What ! shall the bard his godlike power abuse ?
Man's loftiest right, kind nature's high bequest ;
For your mean purpose basely sport away ?

তারপর কবি তাঁর অন্তরের কথা বলেন, তাঁর স্বধর্মের কথা শোনান। কিন্তু ভবি ভোলবার নয় ; ম্যানেজার আর কমিক-অ্যাক্টর তাঁদের দাবি ছাড়েন না। কবি তখন তাঁর মর্মবাণী প্রকাশ করেন :—

Then give me back youth's golden prime,
When my own spirit too was growing,
When from my heart th' unbidden rhyme
Gush'd forth, a fount for ever flowing ;
Then shadowy mist the world conceal'd,
And every bud sweet promise made,
Of wonders yet to be revealed,
As through the vales, with blooms inlaid,
Culling a thousand flowers I stray'd.
Naught had I, yet a rich profusion !
The thirst for truth, joy in each fond illusion.
Give me unequall'd those impulses to prove ;—
Rapture so deep, its ecstasy was pain,
The power of hate, the energy of love,
Give me, oh give me back my youth again !

অন্যায়, অসঙ্গত দাবি পূর্ণ করতে হলে কবি যে মর্মপীড়া অনুভব করেন,

তা রবীন্দ্রনাথ আর গ্যয়টে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তাতেও কী পার্থক্য! জার্মান কবির খেদ ও প্রতিবাদ, উপরে উদ্ধৃত Prologue থেকে যা জানা যায়, তাতে প্রকাশ পায় তরুণ-মনের অসহিষ্ণু প্রতিবাদ। সংশয় তখনো রয়েছে। ইমোশন তখনও সত্যের স্পর্শে রূপান্তরিত হয়নি, Sublime হতে পারেনি। আর রবীন্দ্রনাথ শেষ বর্ষণে, শারদোৎসবে, বসন্তে, নবীনে নটরাজ-রাজা-কবি সংবাদ যা শুনিয়েছেন, তাতে যেমন রয়েছে শিল্পী-মনের প্রত্যয়, তেমন পরিণত বুদ্ধির সত্যোপলব্ধি। নটরাজ বলছেন :—

জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়।

নটরাজ বলছেন :—

বোঝাবার ভার আমার উপর। ইসারায় বুঝিয়ে দোব।

শুধু রাজারা, মন্ত্রীরাই, কবিকে প্রশ্ন করেন না ; নারীরাও প্রশ্ন করেন, সৈনিকরাও প্রশ্ন করেন। পুরোহিত বলেন :

পুরোহিত : তখন যদি রথ আর একবার অচল হয় বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি : নিতান্ত ঠাট্টা নয়, পুরুতঠাকুর। রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েচে বারে বারে। কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌছতে।

পুরোহিত : রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বল।

কবি : গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।

সৈনিক : তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে। ওদিকে যে লাগল আগুন।

কবি : যুগাবসানে লাগেই ত আগুন। যা ছাই হবার, তা ছাই হয় ; যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নব যুগের।

সৈনিক : তুমি কি করবে কবি ?

কবি : আমি তাল রেখে গান গাব।

এই প্রত্যয়, এই স্থিরপ্রজ্ঞা গ্যয়টের কবি পাননি। সে কবি অধীর, অসহিষ্ণু, অনেকটা স্বপ্নমুক্ত-নির্ঝরের মতো। গ্যয়েটে ফাউষ্ট লেখেন ১৭৯০-

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ওই সময়কার জার্মান নাট্যকারের ও নাট্যশালার পরিচয় উদ্ধৃত Prologue থেকে কিছু বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসব এবং অন্যান্য আধুনিক নাটক লেখেন বিংশ শতকের শুরু থেকে। উনবিংশ শতকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে তিনি কেবল বাল্মীকি-প্রতিভা, রুদ্রচণ্ড, কাল-মৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকগুলিই রচনা করেন।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের পার্থক্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অনাবশ্যক জোর দিয়েই সব-কিছু বলবার ঝোঁক দেখা যায়। সেই ঝোঁককে তিনি অর্বাচীনতার লক্ষণ বলেছেন। বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সেই অর্বাচীনতার পরিচয় নেই। উদ্ধৃত দুই মহাকবির রচনাও তাই-ই প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনা করবার সময় কেবল পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে মিল দেখাবার চেষ্টা করাই সঙ্গত হবে না; অমিল কোথায় তাও দেখতে হবে, এবং শেষ-বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, ফাল্গুনী, শাপমোচন প্রভৃতিকে নাটক নয় বলে বাদ দিলেও ভুল করা হবে। শেষ নাটক পৃথিবীর কোথাও রচিত হয় নি। নাটক রচনা কোন কালেই শেষ হবে না। নাটকের রূপ-বিচার নাটকের সঙ্গে তুলনা করে সাব্যস্ত করায় তার সব মূল্য দেওয়া হবে না—মূল্য দিতে হলে মানুষ অন্তরে অন্তরে তার কী রূপ ধরতে পেরেছে তাই জেনে নিতে হবে। ফাল্গুনীতে পাই।

—কবি তাহলে প্রস্তুত হওগে।

—না, মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য চাপা পড়ে।

—চিত্রপট ?

—চিত্রপটের প্রয়োজন নেই—আমাদের দরকার চিত্তপট। সেখানেই শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাবো।

ভারতীয় নাটকের এই ছিল আদর্শ। বিংশ-শতকের খর-রিয়ালিটির উত্তাপে থেকেও, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের আর্তনাদ কানে নিয়েও, রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন এই ফাল্গুনী নাটক, পুরো ভারতীয় নাটক।

বঙ্কিমের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গোড়ার গদ্যে যেমন পাওয়া যায়, নাটকের সংলাপে কিন্তু তেমন পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের উপন্যাসের সংলাপে যে সরলতা আছে, গিরিশ-অমৃতলালের সংলাপ তারও চেয়ে সরল এবং বাঙালীর কথ্য বাক্য-রচনার অনুরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ সর্বত্র সরল নয়, অধিকাংশ নাটকে বেশ জড়িয়ে তোলা, ফলিয়ে বলা। ও-ভাবে বাক্য-বিন্যাস বাঙালীর পরিচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ জনতার মুখে যে ভাষা দিয়েছেন, তাঁর আগেকার বা সমসাময়িক বাঙালী কোন নাট্যকার, কোন জনতার, কি পল্লীবাসীর, কি শ্রমিকের মুখে দেন নি। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের জনতার দৃশ্য খুবই জমাটি হয়। রবীন্দ্রনাথ, মনে হয়, ভাষার ইউনিটিকে নাটকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করতেন। সংস্কৃত নাট্যকাররা তা করতেন না; মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, অমৃতলালও না। তাঁরা শিক্ষিতদের ভাষা অশিক্ষিতদের ভাষা থেকে পৃথকই রেখেছেন।

আগেই বলিছি [গিরিশ নাটককে আর নাট্যশালাকে ন্যাশনাল করেছেন। সে ন্যাশনাইলিজেশনের অর্থ বলতে আমি এই বলতে চাই যে, তখনকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত জন-মনে স্থান করে দিয়েছেন, যদিচ সামাজিক নাটকে বুর্জোয়া-ট্রাজেডিই তিনি সৃষ্টি করেছেন।] রবীন্দ্রনাথ নাটককে ভারতীয় করেছেন, আবার র‍্যাশনালও করতে চেয়েছেন পূব আর পশ্চিমের সিনথেসিসের সহায়তায়, বঙ্কিম যা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ দুজনাই সিনথেসিস দ্বারা ভারতীয় জীবন-দর্শনকেই পুষ্ট করতে চেয়েছেন, এবং র‍্যাশনালাইজেশনে ঝোঁক দিয়ে নাটক-উপন্যাসের কাব্যকে শিক্ষিতদের অনুভূতির বিষয় করে তুলেছেন। তার ফলে মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, অমৃতলাল শিক্ষিতদের কাছ থেকে সে সমর্থন পেলেন না, যা তাঁদের প্রাপ্য ছিল। সাহিত্য জন-সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোলো।

গিরিশের অনুবর্তীরা গিরিশের ছন্দ গ্রহণ করলেন না, তাঁর গদ্যও বর্জন করলেন, বিষয়বস্তুও; বিশেষ করে, পৌরাণিক বিষয় সেকেলে বলে মনে করতে লাগলেন, যদিচ নাটক রচনার বেলায় দর্শকদের কথা মনে রেখে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে কেউ কেউ নাটক লিখেই চল্লেন। কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের যে রূপ দিলেন, তার ফলে ভিক্টোরিয়া যুগে ইংলণ্ডে কাব্য-উপন্যাসের যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তেমনটি কি এ-দেশে হোলো ? আজই কি হয়েছে ? কবিদের মধ্যে নাম পাই টেনিসন, ব্রাউনিং, রসেটি, সুইনবার্ণ, ফিটজগেরাল্ড, আরও অগণ্য, কিন্তু নগণ্য নয়, নর ও নারী কবি। উপন্যাসকারদের মাঝে পাই চার্লস ডিকেন্স, চার্লস কিংসলি, চার্লস রীড, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, জর্জ মেরিডিথ, টমাস হার্ডি, হেনরী উড্, ব্রণ্টে-ভগ্নিরা, মিসেস গ্যাসকেল, এবং আরো অনেকে। এই অভ্যুদয়ের কারণ, ওদেশের সমালোচকরা বলেন, নেপোলিয়ানিক যুদ্ধাবসানের ফলে সমগ্র ইউরোপে এবং বিশেষ করে ইংলণ্ডে যে নব-জীবনের জোয়ার এলো, তা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে আরো প্রবল করে তুলতে চাইল না, জন-জাগরণ এনে দিল ; সাধারণ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং কাজ শুরু হোলো। উইলিয়াম ক্যাবট আর ফ্রান্সিস প্লেস নামক দুইটি অজানা ও অচেনা লোক, একজন কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিদার, আর একজন দর্জি-ব্যবসায়ী ডেমোক্র্যাট, জনতাকে শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে এমন করে তুলে ধরলেন যে, শিক্ষিতরা শুধু নূতন করেই তাদেরকে দেখতে পেলেন না, নব-সমাজ গঠনের ও পুরাতন ব্যবস্থার রদ-বদল করবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলেন। কত আইন পরিবর্তিত হোলো, সংবিধানের কত ধারা সংশোধিত হোলো, কত কুসংস্কার, কত মানবতা-বিরোধী কাজ, বে-আইনী বলে বিঘোষিত হোলো। কবি-উপন্যাসকারদের সামনে এক নূতন জগৎ উদ্ভাসিত হলো ; কলেক্‌টিভিজম আর ইণ্ডিভিডুয়ালিজম বিচারের, বিশ্লেষণের, বিবেচনার, বিষয় হয়ে উঠল। ইংরিজি উপন্যাসের এই যুগকে বলা হয়, ইংলণ্ডের সুবর্ণ যুগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সে-যুগের ইংরেজ-নাট্যকারদের দৃষ্টি খুলে গেল না কেন ? নাট্যশালায় এই জন-জাগরণের পরিচয় উপস্থিত করতে অস্বীকার করল তাদের মালিকরা, তাদের ম্যানেজাররা, ব্যক্তি-স্বার্থের সমর্থকরা। নাট্যশালার সেই দুর্দিনে নাট্যশালাকে ঋণগ্রস্ত এবং হীন করেও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করে স্যার হয়েছিলেন, ডেম হয়েছিলেন, অর্থ উপার্জন করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বার্ণার্ড শ' সবিস্তারে

তা বর্ণনা করেছেন। ইংরিজি নাটকের সে-দিনের দৈন্য দূর করতে টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ সবাই চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলেন না। শুধু 'হেরেড' রচয়িতা স্টফেন ফিলিপস স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের নাট্যশালার বন্ধনমুক্তি ঘটল ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন চার্লস চ্যারিংটন ইবসেনের 'এ ডল্স হাউস' খুলে ইংলণ্ডকে চমকে দিলেন, ক্ষেপিয়ে দিলেন 'ঘোস্ট' আর 'হেড্ডা গ্যাবলার' অভিনয় করিয়ে। বিদ্রোহের এই বাণী জাগিয়ে রাখলেন যেমন উইলিয়াম আর্চার এবং বার্ণার্ড শ', তেমনই রাখলেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার, স্টেজ সোসাইটি, কোর্ট থিয়েটার। এটা কিন্তু মনে রাখবার মতো কথা। নাট্যকারের চেষ্টায় নয়, নাট্যশালারই চেষ্টায় ইংলণ্ডের নাট্যস্রোতে জোয়ার এসেছিল।

আবার ফিরে আসা যাক বঙ্কিম-গিরিশ-রবীন্দ্র প্রসঙ্গে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮০-৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেন। সমগ্র জাতি এই দেশ-বিভাগের প্রতিবাদ করে। শুধু প্রতিবাদ করেই শান্ত হয় না, প্রতিজ্ঞা করে বিভক্ত মাতৃভূমিকে পুনরায় তাঁরা সংযুক্ত করবে। বঙ্কিমের আনন্দমঠে ছিল বন্দেমাতরম্ গান। বাঙালী এই গানের মাঝেই যেন মুক্তির সন্ধান পেল ; বন্দেমাতরমকে মুক্তির মন্ত্র করে নিল। পরবর্তীকালে এই গান কণ্ঠে নিয়ে কত দেশপ্রেমিক কত দুঃসাধ্য কাজ করেছে, কত বিপ্লবী অন্ধকার-কারাগারের দুঃসহ দিনগুলি আনন্দময় করে নিয়েছে, কত শহীদ ফাঁসি-মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের হাতে নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছে! শুধু এই গানই নয়, সমগ্র আনন্দমঠ উপন্যাসখানিই জাতির জীবন-বেদ হয়ে উঠল।

আগেই বলিছি, ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক বুদ্ধি জাগ্রত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সংগঠনের বুদ্ধি জাগ্রত হয়। দেশ-বিভাগ রহিত করবার জন্য প্রাণপণ রাখতে হবে এই বুদ্ধি যখনই জাগ্রত হোলো, তখনই প্রকাশ পেল স্বদেশী-সমাজ, স্বদেশী-শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য, এবং সর্বোপরি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। দেশ-বিভাগের প্রতিবাদের জন্য যে-আন্দোলন শুরু হোলো, তাই নাম পেল স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলন উগ্র হয়ে উঠে বিপ্লবের আন্দোলনে

এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হোলো বিভক্ত দেশ পুনরায় সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। বঙ্কিম আনন্দমঠের ভূমিকায় লিখেছিলেন :—

> বাঙালী স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরাজেরা বাংলা দেশ অরাজকতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্কিম জীবিত ছিলেন না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পরে তাঁর আনন্দমঠকে জীবন-বেদ করে নিয়ে, আনন্দমঠে স্থাপিত বন্দেমাতরমকে মুক্তির মন্ত্র বলে গ্রহণ করে, কর্মক্ষেত্রে যাঁরা অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা কিন্তু আনন্দমঠের ওই ভূমিকাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা ধরে নিলেন যে, ইংরেজ-শাসকদের দণ্ড এড়াবার জন্যই বঙ্কিম ওই ভনিতা ভেঁজেছিলেন। আসলে কিন্তু তা নয়। তিনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতারই কথা বলেছিলেন। কেবলমাত্র বিদ্রোহ যে সমাজ-বিপ্লবকে সার্থক করে না, এই কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। আনন্দমঠ রচনার আর একটি কৈফিয়তও তিনি দিয়েছেন, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বর্ণনা। কিন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে আনন্দমঠের গল্পের মাত্র এই সম্বন্ধটুকুই আছে যে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা, লুঠতরাজই যাদের কাজ ছিল, তাদের দল পুষ্ট করেছিল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বুভুক্ষু কৃষককুলকে দলে টেনে নিয়ে। তাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে পটভূমি করে বঙ্কিম আনন্দমঠ রচনা করেন। সন্তান ধর্ম বলে যা তিনি বর্ণনা করেছেন, তা বিদ্রোহী-সন্ন্যাসীদের ধর্ম ছিল, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। সে ধর্ম দেশ-প্রাণ বঙ্কিমের। তিনি তাঁর ওই ধর্মের এই গূঢ়তত্ত্ব মহাপুরুষের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :—

> সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন-সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনো পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন এ কথা, আমি তোমাকে

> সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের সার ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এ-দেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিয়া শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম আপনা-আপনি পুনরুর্জীবিত হইবে।

তারপর বঙ্কিম বই শেষ করলেন :—

> সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

বঙ্কিমের এই অংশ যারাই পড়ল, তারাই যে সম্পূর্ণভাবে তা বিশ্বাস করল তা নয়; কিন্তু প্রেরণা পেল। তার কারণ ভারতের নর-নারীর রক্তের সঙ্গে নেচে বেড়িয়েছে এমনই একটা আদর্শ যুগ-যুগ ধরে। সব সময়ে তারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করেনি, আবার অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়েও দেয়নি। বঙ্কিমের এই সনাতনধর্ম হিন্দুয়ানী নয়, মানবধর্ম। ভারত এই মানবধর্ম যুগে-যুগে পালন করেছে, বর্জনও করেছে। পালন যখন করেছে, তখন শান্তি পেয়েছে, শক্তিও পেয়েছে—বর্জন যখন করেছে, তখন শান্তিও পায়নি, শক্তিও হারিয়েছে।

বঙ্কিম যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন; যদিচ ইংরেজের দানে তার আস্থা ক্রমেই কমে গিয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন; ছোট ইংরেজ, আর বড় ইংরেজ। বড় ইংরেজ সেই ইংরেজ,

## বঙ্কিম, গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ

যারা অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, যারা বিজ্ঞানকে মানব-কল্যাণে নিযুক্ত করেছে, যারা ডেমোক্রেশীকে রূপ দিয়েছে। তাদের কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। জীবনের শেষের দিকে যখন তিনি সকল ইংরেজকেই সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে দেখেছিলেন, তখন হৃদয় তাঁর দীর্ণ হয়েছিল। তবুও সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রত্যাশাভঙ্গ-জনিত হতাশা সবলে সরিয়ে দিয়ে মনকে মুক্ত করে তিনি শেষবারের মতো শুনিয়ে গিয়েছিলেন :—

> ভাগ্য-চক্রের পরিবর্তন দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে! জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।

বঙ্কিম ছিলেন বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি। মাতৃভূমিকে তিনি এই রূপে দেখেছিলেন ও দেখিয়েছিলেন :

> সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
> শস্য শ্যামলাং, মাতরম্

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশী-আন্দোলনের পুরোহিত। তিনি ধ্বনিত করেছিলেন :

> বাংলার মাটি বাংলার জল
> বাংলার বায়ু বাংলার ফল
> পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, হে ভগবান।

বঙ্কিম জানিয়েছিলেন :

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন :

ও আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাঁজায় বাঁশী।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের জয়-যাত্রার পরিবর্তী পরিচয় পেয়ে 'কালের যাত্রা' নাটকে শেষটায় বলে গেলেন :

কবি

পূজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি করেছ মাটি
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে!
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা ; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা—যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নিচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধূলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকার মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাট হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

এ-এক অনুপম নাটক। স্থূল ঘটনা নিয়ে এর কারবার নেই। ঘটনাই নেই। কিন্তু এর প্রতি কথা মনকে নাড়া দেয়, আশ্চর্যান্বিত করে, টেনে নেয় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দৃশ্যপট না থাকা সত্ত্বেও, মনকে মুহূর্তকাল স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, অথচ প্রশান্তিতে মন ভরে দেয়। এর ভাষা রক্তকরবী-মুক্তধারার ভাষার তুলনায় অনেক সরল, এমন কি চিরকুমার সভার চেয়েও সরল। এর গতি সবাক্-চিত্রের গতির চেয়েও দ্রুততর। এই হচ্ছে ভারতীয় নাটক। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ভারতীয়রা এর মর্যাদা দেয় নি। আজকার নাটুকেরাও এ-সব নাটকে মনোযোগ দেন নি। কিন্তু চেকভ, মেটারলিঙ্ক, ভারতীয় না হয়েও, ভারতের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর না হয়েও, নাটকের এই রূপ কখনো কখনো ফুটিয়ে তুলেছিলেন, প্রাচীন চীনও এই নাট্যরূপ অবহেলা করে নি। মিল আর অ-মিল দুই-ই বিস্ময়কর। বাংলা নাটকের কথা ভাবতে হলে, রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নাটকগুলি বাদ দিলে বড়ই ভুল করা হবে, যেমন ভুল করা হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ দিয়ে বাংলা-কবিতার এবং কাব্যের বিচার।

গিরিশ এঁদের চেয়ে পৃথক ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য

হয়েছিলেন। তিনি 'যত মত, তত পথ' জেনে শুধু মানুষকেই দেখতে লাগলেন, দেখাতে লাগলেন, দেখাতে লাগলেন পৌরাণিক ঐতিহাসিক সামাজিক নাটকের ভিতর দিয়ে। গিরিশ তাঁর নানা নাটকে সাত-আটশ' চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন। কদাচ তার একটি চরিত্র অপর চরিত্রের প্রতিচ্ছবিরূপে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের একই চরিত্র ঘুরে-ফিরে তার নানা নাটকে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে চরিত্র-সৃষ্টিকে আদর্শের ছাঁচে ঢেলে নিয়েছেন। গিরিশ আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ তাঁর ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়ে মানুষের পর মানুষকে দেখিয়েছেন, হয়ত তাঁর ঠাকুরকেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন আদর্শের জন্য চরিত্র তৈরি করেছেন, তেমন মানবতাকে গৌরব দেবার জন্যও চরিত্র তৈরি করেছেন—গিরিশের মতো আশে-পাশে যত মানুষ দেখেছেন, টেনে এনে নাটকে যায়গা করে দেননি।। রবীন্দ্রনাথ subjective, রবীন্দ্রনাথ didactic, গিরিশ তা নন। অমৃতলাল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাই। তাই ওঁদেরও সৃষ্টিতে আদর্শের ওপর একটা ঝোঁক আছে, আর চরিত্রগুলিও বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে। শরৎচন্দ্র didactic নন, কিন্তু পূরো-মাত্রায় subjective, নিজের অনুভূতি দিয়ে মানুষকে দেখেছেন। সে অনুভূতি ছিল তাঁর হৃদয়ের বস্তু। তার চরিত্রগুলি দরদ দিয়ে গড়া। শরৎ-চরিত্রগুলিও ঘুরে-ফিরে বার বার এসেছে। একমাত্র বঙ্কিম didactic এবং subjective হয়েও চরিত্র-বৈচিত্র্য দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশ বঙ্কিমের গান আর আদর্শ নিয়ে মেতে উঠল, আর পরিচয় পেল রবীন্দ্রনাথের, কেবল তাঁর নেতৃত্বের ভিতর দিয়েই নয়, গান ও কবিতা এবং প্রবন্ধ-উপন্যাসের ভিতর দিয়েও। গীতি-কাব্যের দেশ, গানে-কবিতায় মেতে উঠবেই। আর আদর্শ ত তখন বড় হয়ে ওঠবারই কথা।

(গিরিশ তখন ছত্রপতি, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম লিখে জাতিকে অল্প মাতিয়ে তুললেন না। কিন্তু নাটকগুলির অভিনয় সরকার বন্ধ করে দিলেন। গিরিশ আর তখনকার দাবি পূর্ণ করতে পারলেন না। তিনি সভা-সমিতিতে যেতেন না। তিনি পিছিয়ে পড়তে লাগলেন, আর রবিকর ক্রমশঃই প্রখর হতে

লাগল। জাতিও ক্রমশই রোমান্টিক আর আইডিয়ালিস্ট হয়ে উঠল আন্দোলন থেকে আন্দোলনের তরঙ্গে নেচে-নেচে, দোল খেয়ে।

শুরু হোলো রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রযোজনা-প্রয়াস, অভিনয়ের প্রয়াস। তাতেও তিনি ভারতীয় রীতি অবলম্বন করবার কথা ভাবতে লাগলেন, নকলনবিশী ছেড়ে দিয়ে। আর শুধুই ত তিনি একা নন, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায় প্রযোজনায় এবং অভিনয়ে যোগ দিলেন, সঙ্গে নিলেন তাঁদের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের।

জন্ম থেকেই বাংলা নাট্যশালা একদল লোকের বিরক্তি-ভাজন হয়েছিল তার অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন অসামাজিক বলে। সেই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসু যখন প্রথম স্ত্রীলোকদের দিয়ে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করান, তখন থেকেই এ-বিষয়ে দেশে দুটি মতের সৃষ্টি হয়। একদল ওই কাজ সমর্থন করেন, একদল করেন প্রতিবাদ। শরৎ ঘোষ যখন বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক গ্রহণ করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ওই কারণ দেখিয়ে তাঁকে নাটক সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে অস্বীকার করেন। নাট্যশালা তারপর থেকে যত জনপ্রিয় হতে লাগল, ততই ওর প্রতিবাদ যাঁরা করতেন, তারা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা অনাচারের এবং ব্যভিচারের কথাও মাঝে মাঝে যতই প্রকাশ পেতে লাগল, ততই একদল লোক প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে, নাট্যশালা অভিনেত্রী আমদানি করেই বাংলার নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমাজে পতিতার সৃষ্টির গভীরতর কারণ উপলব্ধি করতেন, তারা অবশ্য হৈ-চৈ করতেন না, তবে নাট্যশালার সমর্থনে এগিয়েও আসতেন না, নাট্য-সৃষ্টিতে নাট্যশালার দান অস্বীকার যদিও করতেন না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন নাটকের সমর্থক, কিন্তু তখনকার নাট্যশালার সমর্থক নন।

রবীন্দ্রনাথ নাট্যশালাকে আক্রমণ করে কিছু লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই, তবে বাংলা নাট্যশালার অভিনয় এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে এককালে

প্রচুর উপহাস করেছেন। পরবর্তীকালে নাট্যশালাকে তিনি কিছুটা স্নেহের চক্ষে দেখেছেন, এবং আচার্য শিশিরকুমারকে এবং আর্ট থিয়েটারের পরিচালকদেরকে এবং অভিনেতৃদেরকে আশীর্বাদও করেছেন, উৎসাহও দিয়েছেন।

বঙ্কিম দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়-আসরে তিনি কখনো-কখনো উপস্থিত থাকতেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে, দীনবন্ধুর নাটক দেখতে, তিনি কতবার এসেছেন, এবং অভিনয় দেখে কী বলেছেন, তা আমার জানা নেই। তবে বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে, বঙ্কিমও তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যশালায় তাঁর নানা নাটকের অভিনয় দেখেছেন সারাক্ষণ বসে থেকে। যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটকের অভিনয় তিনি দেখেছেন। গৃহপ্রবেশ অভিনয়ের কালে অবনীন্দ্রনাথ একদিন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সেটিংস ও প্রয়োগ-কল্পনা নিয়ে প্রয়োগ-কর্তাদের যখন তাঁর অনুপম-রীতিতে তাঁর মত শুনিয়ে দেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু কঠোর ভাষা কদাচ ব্যবহার করতেন। তিনি প্রশংসা করবার ছলে সত্যটিকে ব্যক্ত করে কর্তব্য শেষ করতেন; শ্রোতা কি ভাবলেন, না-ভাবলেন, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। গৃহপ্রবেশের প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা আমার আজও মনে আছে।

চোখে আর কণ্ঠে বিস্ময় ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন—"আপনারা দেখছি সবই করতে পারেন, মশাই!"

প্রবোধ গুহ মহাশয় কর্মী পুরুষ, মন তাঁর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পলকে ছুটে গিয়ে তাঁকে কর্মব্যস্ত রাখত। তিনি ভাবলেন, অবনীন্দ্রনাথকে টেনে আনবার প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে; অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের প্রশংসাই করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের ওই মন্তব্যের প্রকৃত মর্ম আমিও তখন বুঝিনি, যদিচ বলবার ভঙ্গিটা আমার কাছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। গৃহপ্রবেশ নাটককে আমি একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক বলে মনে করি। ওর অভিনয় হয়েছিল

অনুপম। নাটকখানি নিয়ে আমি অনেক ভাবতাম। হঠাৎ একদিন বুঝলাম ওর প্রযোজনা ঠিক হয়নি। আর্ট থিয়েটার যতীনের গৃহ-নির্মাণ বাস্তব করে দেখিয়েছিলেন। সত্যি-সত্যিই ইটের দেয়াল গাঁথা হচ্ছে, মায় ঝুড়ি-ঝাঁকাও ঝুলছে দেখিয়েছিলেন, ম্যাগনোলিয়া ফুল যে যতীনের শেষ মুহূর্তে সত্যি-সত্যিই ফুটে উঠল তাও দেখিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ও-সবই কল্পনা, যতীনের কল্পনা, লেশমাত্রও বাস্তব নয়। তাই অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আপনারা সব করতে পারেন, মশাই!" কাজটা ঠিক হয়নি, বোঝবার মতো ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে এসে অপ্রিয় কথা বলে কোন সুফল প্রত্যাশা সঙ্গত নয়; একথা ঠাকুরবাড়ির লোকেরা জানতেন। তাই তাঁরা নিজেরা অভিনয় করে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার সুফল প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আবির্ভাবে, আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়। আর্ট থিয়েটার আর শিশিরকুমার সম-সংখ্যক রবীন্দ্র-নাটক অভিনয় করেছেন। কিন্তু নাট্য-প্রযোজনায় এবং আবৃত্তিতে শিশিরকুমারের উপর যে রবীন্দ্র প্রভাব পড়েছিল, আর্ট থিয়েটারের শিল্পীদের ওপর তা পড়েনি।

## ( ১৪ )

## গিরিশের পরবর্তীকালের নাট্যশালা

গিরিশের সমসাময়িক কালে গিরিশের বয়োকনিষ্ঠ অমরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ও গিরিশ-প্রতিভা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন থিয়েটারে নানা চমকপ্রদ ব্যবস্থার আমদানি করে। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। বিখ্যাত দ্বারিক দত্তের বংশধর তিনি, হীরেন্দ্র দত্তের ভাই, সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, শক্তিমান অভিনেতা। তাঁর আবির্ভাব না হলে বাংলার নাট্যশালা সেদিন নিজেকে চালু রাখতে পারত না। অমরেন্দ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য দিয়ে নাট্যশালাকে সচল ও সজীব রাখলেন। গিরিশ জীবন-অপরাহ্ণে ম্লান হয়ে গেলেন। কিন্তু অমৃতলাল তখনো অম্লান রইলেন। অমরেন্দ্র অকালে লোকান্তরিত হলেন। সামাজিক অমৃতলাল,

রস-সাগর অমৃতলাল, নূতন জেনারেশনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করলেন। অমৃতলাল মনে-প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাংলার সমাজের প্রতি, বাংলার পল্লীর প্রতি, তাঁর ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। অথচ মলেয়ারকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ফরাসী-ভাষা জানতেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু মূল মলেয়ার তাঁর লাইব্রেরী থেকে ফুটপাথে বিক্রয়ের জন্য এসেছিল, তা আমার চোখে পড়েছে। তিনি যখন স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন, তখন বাংলা-থিয়েটারের উত্তর-ভারত পরিক্রমা বাংলা নাট্যশালাকে অখিল ভারতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অমরেন্দ্রনাথের শফর রাজকীয় শফরের সঙ্গে তুলনা করা যেতো, শুনিছি। অমৃতলাল বাংলা থিয়েটারে যে 'ডিসিপ্লিন' এনেছিলেন, তা ফলপ্রদ হয়েছিল।

নাট্যজগতে আবির্ভাব হোলো দুইজন শক্তিমান নাট্যকারের, ক্ষীরোদ-প্রসাদের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের। দুজনাই কবি, দুজনাই দেশপ্রেমিক। কিন্তু ওঁরাও কেউ গিরিশের গদ্য বা পদ্য রচনা-রীতি অবলম্বন করলেন না। করবার উপায় ছিল না। স্বদেশী আন্দোলন, আগেই বলেছি, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে দিয়েছে। গান এনে দিয়েছে কাব্যের প্রতি অনুরাগ। দুর্গম পথের অভিযান এনে দিয়েছে রোমান্টিক স্বপ্ন। তাই ওঁদের দুজনাই, গদ্যে-পদ্যে, বিষয়বস্তুতে, কাব্য আর রোমান্সকেই অবলম্বন করলেন। গিরিশের দিকে ওঁদের দৃষ্টি তেমন পড়ল না, যেমন পড়ল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনার দিকে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ পদ্যে যে ছন্দ ব্যবহার করলেন, তা না মাইকেলের, না গিরিশের; রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত হলেও তা তাঁর নিজস্ব। তা যেমন মধুর, তেমনই আবৃত্তির উপযোগী, তেমনই রঙীন। মাইকেলের মতো দুরূহ শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি, হেমচন্দ্রের মতো ভাব ও শব্দের সামঞ্জস্যও তিনি হারিয়ে ফেলেননি। আবৃত্তির ধারাও, রবীন্দ্র-প্রভাবে, তখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তাই গিরিশের ছন্দ অনেকের কানে বে-সুরো হতে শুরু করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে ছন্দকে যুগোপযোগী রেখেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের গদ্যও বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত, গিরিশের গদ্যের সঙ্গে তার মিল নেই। তাঁর নাটকের সংলাপে কথ্য-ভাষার প্রয়োগ কম। ক্ষীরোদপ্রসাদ

সামাজিক নাটক লেখেননি। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে তাঁর কাব্যময় রোমান্টিক ভাষা খুবই ফলপ্রদ হয়। তাঁর আলমগীর নাটকে আলমগীর-উদিপুরী সংলাপ নাটকের সংলাপ হিসেবে আদর্শ সংলাপ; আলিবাবার সংলাপও তাই। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে বা প্লটের গাঁথুনিতে তিনি আবেগের আতিশয্যে এদিকে-ওদিকে সরে যেতেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ মাতৃশক্তির উপর আস্থাবান ছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রসায়ণ-বিজ্ঞানের, Chemistryর, অধ্যাপক ছিলেন স্বল্পকাল, স্বল্পকাল তিনি ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশনেও অধ্যাপনা করেছেন। কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন নাটুকে। কিছুকাল তিনি মনোমোহন থিয়েটারে বেতনভুক নাট্যকার ছিলেন। তা-ছাড়া তিনি মুর্শিদাবাদ জিলার নিমতিতা গ্রামের জমিদার-বাড়িতে যে থিয়েটার ছিল, তার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি হয়েও নাটক পদ্যে লেখেননি, লিখেছেন গদ্য-কাব্যে। সে গদ্য তিনি কতটা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের গদ্য থেকে নিয়েছেন তা বলা শক্ত। তবে সেকসপীয়ারের কবিতাকে তিনি যে গদ্য-ছন্দে রূপান্তরিত করে নাটকে ব্যবহার করেছেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায়। গদ্য ভাষার সাহায্যে প্রায় জীবন্ত ইমেজ ফুটিয়ে তোলবার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে প্রথমেই সেকেন্দারের মুখ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের যে-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনুপম। তাঁর বিখ্যাত 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' থেকে তা কম বর্ণাঢ্য নয়। চাণক্য মায়ের মহিমা কীর্তন করে যে ভাষণ দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করেন, তাও কম ফলপ্রদ নয়। যাঁরা বলেন নাটকে ওর স্থান নেই, তাঁরা লেডী ম্যাকবেথ যে-ভাষণ দিয়ে তাঁর স্বামীকে হত্যায় লিপ্ত হবার জন্য তাতিয়ে তুলেছেন, তাই স্মরণ করুন। পার্থক্য এই যে, অপত্য-স্নেহকে নির্মূল করে নয়, অপত্য-স্নেহকে গৌরব দিয়ে চাণক্য ও-কাজ করেছেন। লেডী ম্যাকবেথ দন্তহীন অসহায় শিশুর মুখ থেকে স্তনাগ্র ছিনিয়ে পাষাণে আছাড় মারবার শক্তির গর্ব করছেন, চাণক্য ব্যক্ত করছেন মায়ের মহিমা, আর সেই মহিমা অম্লান রাখবার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্র-সৃষ্টিতে অত্যন্ত

খামখেয়ালী ছিলেন। যখন যেমনটি তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তখনই চরিত্রে সেই রূপ তিনি আরোপ করতেন। আবার কখনো কখনো নাটকের ভিতর দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি না করে গঠিত চরিত্রের মুখের কথা দিয়েই নাটককে তিনি চালিয়ে নিতেন। কোন কোন চরিত্রের মুখে এমন সংলাপও তিনি দিয়েছেন, যা সেই সব চরিত্রের মুখ থেকে বার হওয়া অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। কিন্তু তাঁর ভাষার ছিল মোহিনী শক্তি, আকর্ষণ ছিল দুর্বার, আবেদন ছিল চিত্তজয়ী। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের বড় আকর্ষণ। যাকে 'ভিলেন' বলা হয়, তা তিনি সৃষ্টি করেন নি। তাঁর নাটকে যারা খারাপ কাজ করেছে, তাদের তিনি হয় বোকা করে সৃষ্টি করেছেন, নয় করেছেন অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিক, নয়ত বা বাচাল অথবা রগচটা। কিন্তু তাদেরও চিত্তের গভীরে যে মানবতা আছে, মাঝে-মাঝে তাও প্রকাশ করে ফেলেছেন। নর-নারীর প্রণয়কে তিনি তাঁর নাটকে তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের তুলনায় বেশি স্থান দিয়েছেন। কোন কোন নাটকে সে প্রণয় গাঢ় হয়েছে। 'মানসী' তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। মানবতা ও স্বাদেশিকতা যে পরস্পরবিরোধী নয়, ব্যক্তিগত প্রেম যে, দেশ-প্রেমে এবং বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে, এ-কথা দ্বিজেন্দ্রলালের নানা নাটকে নানাভাবে বলা হয়েছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর কোন মতভেদ ছিল না। অথচ খুবই আশ্চর্যের কথা দ্বিজেন্দ্রলাল আর রবীন্দ্রনাথের মাঝে একটা অপ্রীতির আবর্ত-সঙ্কুল স্রোত দুইজনকে পৃথক করেই কেবল রাখেনি, প্রতিদ্বন্দ্বীরও রূপ দিয়েছিল। তাঁর জন্য পরম শ্রদ্ধাভাজন ওই দুই জন সাহিত্য-নায়ক কতটা দায়ী, আর কতটা দায়ী তাঁদের ভক্ত-অনুচরবৃন্দ, তা বলা শক্ত।

মাইকেল, বঙ্কিম, গিরিশ যেমন তাঁদের আত্ম-প্রকাশের সময় গোঁড়ামোর সমর্থনকারীদের নিন্দাভাজন ও বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই তাঁদের নিন্দা ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু তা হননি। দ্বিজেন্দ্রলাল দেওয়ান কার্তিকচন্দ্রের পুত্র, ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, বিলাত ফেরত, তবুও গোঁড়াদের তেমন বিরাগ-ভাজন হননি, যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর কারণ খুব

সম্ভবত তিনি তাঁর হাসির গানে যেমন গোঁড়া-হিন্দুদের কশাঘাত করেছিলেন, তেমন কশাঘাত করেছিলেন বিলেত-ফেরতাদেরও।

দ্বিতীয় কারণ তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলে বাংলার বিভিন্ন শহরের বিদগ্ধদের সঙ্গে মেশবার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং হাসির গান দিয়ে তাঁদের চিত্তজয় করেছিলেন ; এক কথায় সামাজিক লোক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সমাজ থেকে পৃথক করে রাখতেন। সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-প্রীতিকে সাধারণের বোধগম্য করে নানা সিদ্ধরসের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তখনকার দিনে একমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন যিনি ইঙ্গ-বঙ্গ মহলে এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী-সমাজে আর নাট্যশালায় সমানভাবে মেলা-মেশা করতেন। বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আদৌ ভাল ছিল না। বিলেতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখবার পর বাঙালীর অভিনয়ে দেখবার মতো কিছু যে থাকতে পারে, এমন কথা বিশ্বাস করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, বর্তমান কালের খ্যাতনামা লেখক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন তাঁকে একরকম জোর করেই গিরিশের অভিনয় দেখাতে নিয়ে যান। গিরিশের অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে পড়েন। এমন অভিনয় যে-নাট্যশালায় হয়, তা অবহেলায়, অনাদরে, উপেক্ষায় নিষ্প্রদীপ হয় যদি, তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না বলে তিনি মনে করলেন। তিনি নাটক লেখায় মন দিলেন, এবং নাট্যশালায় জোয়ারের প্লাবন এনে দিলেন।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র অপ্রীতি কিন্তু তাতে প্রশমিত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেল, এবং তার ফলে নাট্যশালা, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা প্রকাশের বাহন বলে, রবীন্দ্র ভক্তদেরও বিরাগ-ভাজন হোলো। অপ্রীতি চরমে উঠল আনন্দ-বিদায় অভিনয় উপলক্ষ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে একটা প্রহসন রচনা করলেন। প্রহসনখানি আনন্দবিদায়। স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের আয়োজন হয়। রিহার্সাল চলবার সময়েই প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, প্রহসনখানি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে রচিত হয়েছে। প্রথম অভিনয়-রজনীতে

বহু-রবীন্দ্রানুরাগী অভিনয় দেখতে যান। অভিনয় শুরু হবার অল্প পরেই প্রেক্ষাগৃহে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়। অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ দর্শকরা তাঁকে মার্জনা চাইতে বলেন। তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। উত্তেজিত দর্শকরা তাঁকে অপমান করবার জন্য ছুটে অগ্রসর হতেই থিয়েটারের কর্তারা পেছন দিকের দরজা দিয়ে তাঁকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেন। সারা শহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবং থিয়েটার প্রহসনখানি অভিনয় করতে সম্মত হয়েছিল বলে থিয়েটারও রবীন্দ্রানুরাগীদের এবং অনেক নিরপেক্ষ নাট্যানুরাগীদেরও বিরাগ ভাজন হয়ে পড়ে। আর শুধুই কি থিয়েটার? দ্বিজেন্দ্র-সংস্রবই এক দলের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রকেও অস্পৃশ্য বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল ওর সম্পাদক হবেন জেনে। দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর নাম থাকবার অপরাধেই ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করতেই দল-বিশেষের যে বিরূপ-সমালোচনা পায়, তাতে একটা অহেতুক আক্রোশই প্রকাশ পায়। তখনকার কোন কোন বিশিষ্ট বিদগ্ধও বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারেন নি।

এই সময় থেকেই কোলকাতায় একদল 'হাই-ব্রো' নাট্যানুরাগীর সৃষ্টি হয়। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ যে-সব অভিনয় করতেন, সেই সব আসরে ভিড় জমাতেন; বিলেত থেকে যে-সব নাট্যসম্প্রদায় কোলকাতায় অভিনয় করতে আসতেন, তাঁদের গুণকীর্তন করতেন; আর বাংলা থিয়েটারের অবিশ্রান্ত নিন্দা করতেন। ক্রমশ বাংলা থিয়েটারের নিন্দা সুরুচির পরিচয় হয়ে উঠল এক শ্রেণীর শিক্ষিতদের পক্ষে।

অবশ্য দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশ-হিতৈষীরা বাংলা থিয়েটারকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু শিক্ষিতদের যাঁরা থিয়েটারের নিন্দা করতেন না, তাঁরা ওর আত্মপ্রকাশের ও প্রতিষ্ঠার সহায়তা করতেও এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াতেন না। যাঁরা নিয়মিত অভিনয় দেখতেন পরম আগ্রহ ভরে, তাঁরাও প্রকাশ্যে থিয়েটারের সুখ্যাতি করতে ভয় পেতেন। যাঁরা সে ভয় জয় করতেন, তাঁরাও থিয়েটারের নানা

দোষ-ত্রুটির আলোচনা করে দু'চারটে ভালো কথা বলে কর্তব্য পালন করতেন।

কেবল বিপিনচন্দ্র পালই বাংলা নাট্যশালার এবং তার নাট্যকারদের অভিনেতৃদের দানের কথা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করতেন। তাঁর আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখেছেন—"দোষ-ত্রুটির কথা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত করে একথা বলা যায় যে, এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, এবং বক্তৃতামঞ্চ জাতির যতখানি হিতসাধন করেছে, এ দেশের নাট্যমঞ্চ তার চেয়ে কম হিত করেনি।" তিনি যখন নির্বাসিত অবস্থায় বিলেতে অবস্থান করছিলেন, তখন 'সেখান থেকে 'হিন্দু-রিভিউ' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করতেন। তাতে বাংলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর অভিনয়-প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সার বক্তব্য ছিল তারাসুন্দরীর মতো অভিনেত্রী যে কোন দেশের গৌরবের পাত্রী। তারাসুন্দরী বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটিই আত্মপ্রকাশ করেননি এ-কথা আমরা বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে দেখেছি, এবং নিজেরাও প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলা নাটকের সুখ্যাতি করেছেন এমন বহু দেশী ও বিদেশী মনীষীর মতও ইতিহাসে পাওয়া যায়। গিরিশের বুদ্ধ চরিত্রের অভিনয় দেখে 'লাইট অব এশিয়া'র লেখক এডউইন আর্নল্ড বলে গেছেন ওই নাটকে তিনি জাতির মর্মলোক প্রতিফলিত দেখেছেন। ন্যায়বিচারে প্রবৃত্ত যাঁরাই হয়েছেন, তাঁরা বাংলা নাটককে অগ্রাহ্য করতে পারেননি, দোষ-ত্রুটি অবশ্য অনেকেই দেখাতে পেরেছেন। এই দোষ-ত্রুটির সংশোধন সম্ভব হোতো, যদি সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষিতরা এগিয়ে আসতেন। কিন্তু হাই-ব্রোরা তা এলেন না।

( ১৫ )

## ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার মঞ্চে আবির্ভূত হবার পর এই হাই-ব্রোদের উঁচু ভুরু কিছু নীচু হলো। তাঁরা নাট্যাচার্যকে কিছু-কিছু পেট্রোনাইজ করা শুরু করলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কীর্তিমানদের মাঝে একা শিশিরকুমারই মঞ্চে এলেন না, এলেন নরেশ মিত্র, এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, এলেন আরো নবীন অনেকে। কিন্তু তাঁরা নাট্যাচার্যের দলে এলেন না বলে হাই-ব্রোদের নজরে পড়লেন না। নাট্যাচার্য যে গিরিশের এবং তাঁর অনুগামী সকল অভিনেতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কথা কেউ বলেন নি, নাট্যাচার্য নিজে ত ননই। কিন্তু হাই-ব্রোরা তাঁকে যুগাবতার বলে ঘোষণা করলেন কেন, বোঝা দরকার। প্রথম কারণ, এই হাইব্রোদের এক অংশ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সদস্য ছিলেন। নাট্যাচার্যকে যুগাবতার করতে পারলে তাঁরাও ছোট-খাট অবতারের আসন পেতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ, হাই-ব্রোদের অপর অংশ, যারা রবীন্দ্রনাথেরও নিন্দা করে বেড়াতেন, তাঁরাও দেখলেন আর্টের দোহাই দিয়ে নাট্যাচার্যের কাছে দাঁড়াতে পারলে বাংলা-থিয়েটারের রসাস্বাদনের সুবিধে হয়। তাঁদের দশা হয়েছিল অনেকটা বিলেত-ফেরত বাঙালী সাহেবদের মতো। শুক্ত-চচ্চড়ির লোভ লুকিয়ে মেটাবার সুযোগ পেলেন তাঁরা। অবশ্য আসল গুণী কয়েকজন কেবল নাট্যাচার্যের আর্টে আকৃষ্ট হয়েই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলা নাট্যশালা তাঁদেরও কাছে ঋণী। তাঁদের সকলের পরিচয় আমার জানা নেই। যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদেরই শুধু নাম করছি— নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থি, সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, যামিনী

রায়, চারু রায় প্রভৃতি। তাঁর তরুণ সমর্থকদের মাঝে ছিলেন আজকার দিনের খ্যাতিমান প্রফুল্ল রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল ইসলাম, পরলোকগত রমেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য নাট্যোৎসাহী।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে বাংলা নাট্যজগতের যুগাবতার বলা চলে কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা অসঙ্গত হবে না। তাঁর অনুরাগীরা বলতেন নিশ্চিতই বলা যায়। কেন না তিনি নব-যুগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে-যুগের পরিচয় কি পাওয়া যায়? কার কার নাটক তিনি অভিনয় করেছিলেন?

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রফেশনাল নট হিসেবে মঞ্চাবতরণ করেন মদন কোম্পানির বেঙ্গলী থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর নাটকের নাম ভূমিকায়। আলমগীর তাঁর অভিনয়ের গুণে একটি চিত্তজয়ী নাটকীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। তারপর, একজিবিশন উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করে নিজের সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্প্রদায় গড়ে তিনি পুনরায় যখন ওই সীতা অভিনয়ের আয়োজন করেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা অভিনয়ের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটার কৌশলে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা কাব্য-নাট্যের অভিনয়-স্বত্ব ক্রয় করেন, কিন্তু অভিনয় করেন না। তখন তিনি যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে 'সীতা' নাটক লিখিয়ে যে অভিনয় করেন, তাই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে তুলে দেয় যদিচ অভিনয়-নৈপুণ্যে, আমার বিবেচনায়, 'আলমগীর' 'রামের' চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি।

রচনা হিসেবে আলমগীর নাটক নব-যুগের কোন সন্ধান দেয় কিনা, আগে সেই কথাই আলোচনা করা যাক। বঙ্কিম রাজসিংহ লেখেন ১৮৭৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে আলমগীরের এক চরিত্র পাই। তার তেতাল্লিশ বছর পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে আলমগীর চরিত্র নাটকে প্রকট করেন, তা তুলনায় বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রের চেয়ে রচনা-চাতুর্যে নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্ট? নিকৃষ্ট মনে করবার কোন কারণ নেই। রাজসিংহের রচনা, বিশেষ করে ভাষা, অনুপম। কিন্তু আলমগীরের ভাষা, বিশেষ করে আলমগীর-উদিপুরীর মুখের, আগেই বলেছি, নাটকের আদর্শ-

সংলাপ ; পূর্ববর্তী নাটকে যা কচিৎ দেখা যায়। দিলীরের কাছে আলমগীরের স্বপ্ন-বর্ণনা সাহিত্য সৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এবং আলমগীর চরিত্রের নিগূঢ়-মর্মের বিস্ময়কর নাটকীয় রূপ। অবশ্য নাট্যাচার্যের তুলনাবিহীন অভিনয় ওর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। রাজসিংহে বঙ্কিম অত স্বল্পে, অমন হৃদয়গ্রাহী করে, আলমগীরকে ব্যক্ত করেননি। রাজসিংহ উপন্যাসে যেমন বঙ্কিম তাঁর ইচ্ছামত ঘটনা সংস্থাপন করেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদও তাই করেছেন। গিরিশ তা করতেন কিনা সন্দেহ। রাজসিংহের প্রভাব যে ক্ষীরোদের উপর পড়েছিল, তা বোঝা যায় যেমন আলমগীরের রোমান্টিক গঠনে, তেমন আলমগীরের তখনকার বয়েস ধার্যে। রাজসিংহের সঙ্গে ঔরংজীবের সংঘর্ষ হয় ঔরংজীবের সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরে, অত বৃদ্ধ বয়সে নয়। উপন্যাস ও নাটকের দোষ-গুণ বিচার করে এ-কথা বলবার কারণ পাওয়া যায় না যে, আলমগীর নাটক রাজসিংহ উপন্যাসের চেয়ে নিকৃষ্ট রচনা। নাটক হিসেবে আলমগীর ত্রুটিপূর্ণ এ-কথা বলা গেলেও অস্বীকার করা যায় না যে, আলমগীর সাহিত্যিক সৃষ্টি বলেই নাট্যাচার্য ওর অনবদ্য অভিনয় করতে পেরেছিলেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছরকাল নাটকখানি অভিনয় করবার উৎসাহ পাচ্ছেন।

আলমগীরের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানের ঔরংজীবও অভিনয়-নৈপুণ্য দিয়ে দীর্ঘকাল জনপ্রিয় করে রেখেছিলেন দানীবাবু। সে ঔরংজীব আলমগীর নন, শাহজাদা ঔরংজীব, সদ্য-সম্রাট ঔরংজীব। সে ঔরংজীব-চরিত্রেও কয়েকটি পরম-মুহূর্ত আছে। দানীবাবু সে-সব মুহূর্তগুলিকে খুব চিত্তাকর্ষক করে তুলতেন, কিন্তু সে স্পিরিচ্যুয়াল হাইটে তুলতে পারতেন না, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণ্যকের ভূমিকাভিনয়ে মায়ের মহিমাকীর্তনের সময় অথবা কন্যাকে ফিরে পাবার সময় যেমন তুলতেন। রচনার দিক দিয়ে সে ঔরংজীব আলমগীর অথবা চাণক্যের সমতুল হয়নি। নাট্যাচার্য আর দানীবাবুর তুলনায় নেহাতই নগণ্য অভিনেতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকে ঔরংজীবের চরিত্রকে একটা স্পিরিচ্যুয়াল হাইটে তুলে দিতেন। আবুলহাসান নাটকে আর একটি ঔরংজীব আছে। সন্তোষ সিংহ তাও চিত্তাকর্ষক করেছিলেন।

বিভিন্ন যুগের নানা নাট্যকারদের চিত্রিত ঔরংজীব চরিত্র বিচার করে দেখলে বলবার কারণ থাকবে না যে, চরিত্র রূপায়ণে নাটক পিছিয়ে গেছে।

নাট্যাচার্য দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা-কাব্যের রামকে যে-রূপ দিয়েছিলেন, তারও চেয়ে মনোরম রূপ দিয়েছিলেন যোগেশচন্দ্রের সীতা নাটকের রাম চরিত্রকে। কাব্যের দিক দিয়ে যোগেশচন্দ্রের সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি নয়, ছন্দের বিচারে তা নিকৃষ্টতর; কিন্তু মানবতার আবেদনে অধিকতর চিত্তস্পর্শী। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটক নয়, তাই দ্বিজেন্দ্র-নাটকে যে-মানবতা হৃদয়কে প্লাবিত করে দেয়, সে-মানবতা তাঁর সীতায় যতটুকু পাওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি পাওয়া যায় যোগেশচন্দ্রের সীতায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের লেখক হলেও যোগেশচন্দ্রের উপর গিরিশের প্রভাব বড় কম ছিল না। মনে হয় স্বদেশী যুগের, স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগের, অভিজ্ঞতা যোগেশচন্দ্রের তেমন ছিল না। তাঁর কোন নাটকে সে অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। গিরিশ যে সমাজ-আদর্শ স্বীকার করতেন, তিনিও সম্ভবত তাই-ই করতেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম আর ন্যাশনালিজম এবং র‍্যাশনালিজম তাঁর রচনার উপর তেমন কাজ করেনি। তাঁর অভিনয়ও ছিল নাট্যাচার্যের অভিনয়-পদ্ধতির চেয়ে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে রোমান্টিসিজম বর্জিত। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বিপ্লবের সৃষ্টি; আমরণ তিনি বিপ্লবী ছিলেন। মানবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মনোরঞ্জন নিজে মনে করতেন তিনি রোমান্টিক প্রকৃতির লোক নন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন বাংলা নাটক আজও রোমান্টিসিজম বর্জন করতে পারল না। তিনি যে অভিনয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তিনি আর তাঁর ভক্তরা তাকেই রিয়ালিজম বলতেন। আমার তা কখনো মনে হয়নি। যোগেশচন্দ্রের এবং তাঁর অভিনয়ের পার্থক্য ছিল। তাঁর অভিনয়ে রোমান্টিসিজম আর র‍্যাশনালিজম দুই-ই মিশ্রিত ছিল। তাকেই বলা হয় ন্যাচুরালিজম। নাট্যাচার্যের অভিনয়ও তাই, যদিচ তাঁর আবৃত্তি কখনো কখনো অত্যন্ত সুরেলা এবং উঁচু পর্দায় তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথেরও তাই ছিল, এবং বিস্ময়ের কথা দানীবাবুর আবৃত্তিতেও তাই

লক্ষ্যের বিষয় হোতো। আমাদের কীর্তন-যাত্রাতেও তাই দেখা যায়। এইটেই ভারতীয় অভিনয়-রীতি, বিশেষ করে বাংলা-অভিনয়ের রীতি। বাংলা-ভাষা ধ্বন্যাত্মক সংস্কৃত ও দেশীয় গীতি-কাব্যজাত বলে এমনটি হয়েছে। বাংলার কোন সাহিত্যিক সৃষ্টি বা শিল্প-সৃষ্টি রোমান্টিসিজম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার সঙ্গত কারণ আছে। কোন সাহিত্য, কোন শিল্প, পারবে কিনা, তাও ভাববার বিষয়। বিদ্রোহকালে সাময়িকভাবে পারলেও পারতে পারে, স্থায়ীভাবে পারবে কিনা তাই হচ্ছে প্রশ্ন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু পারেননি, দার্শনিকরাও সকলে পারেননি।

নাটকে রিয়ালিজম-এর দাবি কি সুফল দেয় তা বোঝাবার জন্য ইবসেনের নাম হামেসাই করা হয় তাঁর 'ঘোস্ট', 'পিলার্স অব দি সোসাইটি', 'এ ডলস হাউস' প্রভৃতিকে নজীর রূপে খাড়া করে। তিনি কবিতায় কাব্য করেও নাটক লিখেছেন, যদিচ কবিতায় নাটক লেখা চলবে না, এ-কথাও তিনি বলে গেছেন। এমনই ভুল করে বার্ণার্ড শকেও আমাদেরকে রিয়ালিস্ট বলে বোঝানো হয়।

সকল সৃষ্টির মূলেই থাকে রোমান্টিসিজম। সে রোমান্টিসিজম রিয়ালিটিকে অস্বীকার করে না, অগ্রাহ্য করে না, তাকে স্বীকার করে নিয়ে, তার কদর্যতা দূর করে, তাকে মোহন ও মহান করতে চায়। সকল শিল্পই তাই চায়। ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষ তাই চায়। তাকেই বলা হয় জীবনের স্বপ্ন, সৃষ্টির স্বপ্ন, স্বার্থকতার স্বপ্ন। বাস্তব জীবনকে অগ্রাহ্য করে, বিশ্বসৃষ্টির নিয়মকে বোঝবার চেষ্টা না করে, মানুষ যে-স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, যে এলো-মেলো চিন্তা করে, তা কিন্তু সৃষ্টির শক্তি দেয় না। তাই তা শিল্পের রোমান্টিসিজমও নয়, জীবনেরও নয়। তা আকাশকুসুম, তা নিউরোসিস। রচনায়, ভাষণে, আবৃত্তিতে শব্দ, অলঙ্কার, বাক্য, আবেগ, অনুভূতি, ধ্বনি সব মিলে রংয়ের কাজ করে, পটভূমির কাজ করে, আপেক্ষিক দূরত্বেরও কাজ করে। তবেই তা লেখকের কলম থেকে বেরিয়ে, বক্তার ও অভিনেতার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে, পাঠকের ও শ্রোতার মনে বর্ণোজ্জ্বল চিত্র এঁকে দেয়। তাও আবার একই রচনা সকল পাঠকের মনে, একই বক্তার বা অভিনেতার ভাষণ সকল

শ্রোতৃদের মনে একই চিত্র ফুটিয়ে তোলে না, ঠিক যেমন একই সূর্যোদয় দেখে পৃথিবীর সকল মানুষই জবাকুসুম সঙ্কাশম্ কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ বলে প্রণতি জানায় না। যা ওই প্রণতির প্রেরণা দেয়, তাই আর্ট। যারা প্রেরণা বহন করবার প্রয়াসে বাস্তব সূর্যকে প্রতিফলিত করে শব্দের ঝঙ্কার দিয়ে, আবেগের তরঙ্গ দিয়ে, বর্ণের বিভূতি দিয়ে, তারাই আর্টিস্ট। আর যারা সেই ঝঙ্কার, সেই তরঙ্গ, সেই বিভূতি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' স্থান দিতে পারে, তারাই রসিক। শুধু নবোদিত সূর্যের দিকে চেয়েই তা পারা যায় না, আতস কাচের মতো মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। সে-মাধ্যম হচ্ছে নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়, চিত্র, কাব্য, মন্ত্র, মূর্তি—আবার বস্তু, বিজ্ঞান, প্রশ্ন, বিচার। তাই আর্ট বাস্তব-অবাস্তব, সসীম-অসীম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সব-কিছুরই পরিণতির ইঙ্গিত। আর্টের সার্থকতা আধ্যাত্মিকতায়, স্পিরিচুয়াল অনুভূতিতে; উপলব্ধি তার ধ্যানে, ধারণায়, সাধনায়; পরিণতি পরিপূর্ণ জ্ঞানে। তাইত আর্টের সাধনা সহজ নয়, আর্ট সুলভ নয়, আর্ট সসীম নয়।

কালিদাস বাক আর অর্থ অবিভাজ্য বলেছেন। কিন্তু ওইটুকু বলেই পরিতৃপ্ত হন নি। আভিধানিক ওর বেশি বলা প্রয়োজন মনে করেন নি; কিন্তু কালিদাস করেছেন। কী রকম অবিভাজ্য? না, পার্বতী আর পরমেশ্বর যেমন অবিভাজ্য। বাক্যের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে রূপকের সহায়তা নিতে হয়। নাটককে প্রাচীন ভারতীয়রা তাই রূপক বলতেন। আধুনিক রসিকরা বলেন বাস্তবের প্রতিফলন; কিন্তু প্রজেকশন নয়, রিফ্লেকটরি ইলিউশন। দর্শক মনে যে চিত্র ফুটে উঠবে, তা হবে বাস্তব-অবাস্তবের সার-বস্তু, যা সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের পানে মনকে ছুটিয়ে নেয়। অভিনয় হচ্ছে রি-ক্রিয়েশন, নব-সৃষ্টি। নাট্যকারের সৃষ্টি অভিনেতার মনের মুকুরে যে ইমেজ সৃষ্টি করেন, তাই তিনি প্রজেক্ট করেন প্রেক্ষাগৃহে। তাই হচ্ছে অভিনয়। নাট্যকারের একই সৃষ্টি পৃথক পৃথক অভিনেতার মনে পৃথক পৃথক ইমেজ ফেলতে পারে। একই ভূমিকার পৃথক পৃথক অভিনেতা পৃথক পৃথক রূপও দিতে পারেন। কেউ নাট্যকার যে রূপ-পরিকল্পনা করেছেন,

সেই রূপ প্রজেক্ট করে থাকেন; কেউ সেই রূপকে নাট্যকারেরও কল্পনাকে অতিক্রম করে অধিকতর মনোরম করতে পারেন; আবার অক্ষমরা নাট্যকারকে ডুবিয়েও দিতে পারেন।

প্রাচীনকালে ওদেশে অভিনয়কে আর্ট বলা হোতো না, অনুকরণ বলা হোতো। আজ অভিনয় আর্ট বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার প্রাচীনকালে নাটক-রচনাকেই একমাত্র নাটুকে আর্ট বলা হোতো। এখন স্বার্থান্বেষীরা আর আত্মাভিমানী-অভিনেতারা আর প্রযোজক-পরিচালকরা সেই নাটককে আর্টের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে স্ক্রিপ্টে পরিণত করতে চাইছেন। তাঁরাই নাটকে কাব্য অলঙ্কার দর্শন নিরর্থক বলে প্রচার করেন। তাঁরাই বলেন নাটক ওতে অযথা ভারাক্রান্ত হয়। কথার পর কথা বসিয়ে একটা বোধগম্য-বিবৃতি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু কথা দিয়ে কাহিনী সৃষ্টি করতে হলে কথাকে কাব্যময়, অলঙ্কারময়, ব্যঞ্জনাপূর্ণ করতে হয়। নইলে কেবল কথা কখনো মনের গভীর স্তরকে নাড়া দিতে পারে না, এক কাণ দিয়ে ঢুকে অপর কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কাজেই নাটককে স্ক্রিপ্ট করলে যেমন-তেমন একটা গল্প হয়ত অভিনয়ের সাহায্যে রূপ দেওয়া যায়, কিন্তু নাটকের কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না।

বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পঁয়ত্রিশ বছর পরে এবং বঙ্কিমের তিরোভাবের বাইশ বছর পরে বাংলার বুকের উপর দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন বয়ে যায়। ওই বাইশ বছরের মাঝে বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপও মঞ্চে অভিনীত হয়; পরেও হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হবার নয় বছর আগে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয়। স্বদেশীর বন্যা তখন নেমে গিয়ে অন্তঃসলিলা হয় বিপ্লব আন্দোলন-রূপে এবং জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন শুরু হয়।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের একটা বড় রকমের পার্থক্য এই ছিল যে, সাহিত্য, অন্তত বাংলা সাহিত্য, তার দ্বারা তেমন প্রভাবান্বিত হয় না, যেমন হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা, এমন কি বৈপ্লবিক আন্দোলনেরও দ্বারা। তার কারণ এই যে, বাঙালী সকল শিক্ষিতরা মহাত্মার

অহিংস-অসহযোগকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারে নি, মহাত্মার গীতার ভাষ্যকেও নয়। পলিসি হিসেবে যাঁরা তা গ্রহণ করেন, তাঁরাও প্রসন্ন মনে ওকে গ্রহণ করেন না। তাই ত স্বরাজ্যদল গঠিত হয়।

নাটক তখন গিরিশের ঐতিহাসিক নাটক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শকে গ্রহণ ক'রে রোমান্টিসিজম্‌-এর দিকে বেশি ঝোঁক দেয়। কিন্তু পদে পদে সরকারের দিক থেকে বাধা পায়। তারই ফলে নাটকে যে-কোন সংঘাতই যেমন রাজনীতিক সংঘাতের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, তেমন আঙ্গিকও দৃষ্টি পায় বেশি। অর্থাৎ যে-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম কালে মালিকানা ও পরিচালনার দিক দিয়ে 'আর্টিষ্টস্‌ থিয়েটার' হতে চেয়েছিল, সেই নাট্যশালা নাট্যনিবেদনের দিক দিয়েও 'আর্টিষ্টস্‌ থিয়েটার' হবার চেষ্টা করে। নাট্যাচার্য হলেন সেই রকম থিয়েটারেরই প্রতিষ্ঠাতা। তাই দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালেরই নাটক অভিনয় করলেও, মূলত রোমান্টিক অভিনেতা হলেও, নাট্যাচার্য একটি নূতন যুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত হলেন। সে অভিনন্দন অসঙ্গত হয় নি। আর্টিষ্টস্‌-এর আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে সমগ্রভাবে নাটককে তার পরিণতিতে পৌঁছে দেবার প্রয়োজনীয়তা-বোধে অভিনেয়-বিষয়কে যেমন অভিনেতৃদের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে বর্ণোজ্জ্বল করে তোলবার চেষ্টা করা হোলো, তেমন সেই বর্ণ যাতে না বিকৃত হয় তারও জন্য, দৃশ্যপট, সঙ্গীত-নৃত্য, আঙ্গিক অভিনয়, আলো-ছায়া, সবই সুসমঞ্জস করবার চেষ্টা করা হোলো। প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও কোরিওগ্রাফি বাংলার নাট্যশালার ধ্যানের বিষয় হয়ে উঠ্‌ল। নাট্যশালা রোমান্টিসিজম্‌-এর ভিতর দিয়ে র‍্যাশনালাইজড হতে চাইল। এল ন্যাচুরালিজম-এর আবেদন। এইটেই হোলো যুগ-প্রবর্তন। তাই নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে যুগ-প্রবর্তক অবশ্যই বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথও নাট্যশালার এমনই একটি রূপ পরিকল্পনা করতেন। তাই নাট্যাচার্যের প্রয়াস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি সীতার অভিনয় আগ্রহ নিয়ে দেখলেন। দেখে কি মত দিলেন, তা আমার জানা নেই। ওর আগে তিনি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়ে অপর কোন নাট্যকার রচিত নাটকের অভিনয় দেখেছেন বলে শুনি নি।

রবীন্দ্রনাথ যা করতে চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যথার্থ তা-ই করেছিলেন, এমন কথাও বলতে পারি না। এ-কথা বলতে পারি যে, গিরিশ যা চেয়েছিলেন, নাট্যাচার্য তা করেছেন; অর্থাৎ নাটককে ন্যাশনাল রেখেছেন, আত্ম-প্রসারের জন্য নাটক যে-খাতটি তৈরি করেছিল, সেই খাতেই নাটককে প্রবহমান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র খাত তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তিনি জীবিত থেকে তা করে যেতে পারেন নি। তাঁর অমর নাট্যসৃষ্টির আভ্যন্তরিক শক্তি কোন দিন তা করতে পারবে কিনা, নিশ্চিত করে আজও তা বলতে পারি এমন কোন ইঙ্গিতও আমি পাই না। আজও মনে হয় বাংলা নাটক আত্মপ্রকাশের যে বিশিষ্ট খাত অবলম্বন করে চলেছে, তার পরিসর কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে, কখনো তা সঙ্কীর্ণ হয়েছে, স্রোতের গতি নানা বাঁকও সৃষ্টি করেছে; তার সমগ্র রূপটি মোহন বা বাঞ্ছনীয় না হলেও তাকে অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে, সম্পূর্ণ পৃথক একটা খাত কখনো সৃষ্টি করা যাবে না। কোন দেশেই তা যায় নি। তাই সকল দেশের নাটকই নানা ইজম্-এর আলেয়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে জন-সংস্রবের সহজ পথটিরই সন্ধান করছে।

গিরিশ যে জন-সংস্রব স্থাপন করতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা কামনা করেন নি। তিনি তাঁর নাট্য-প্রয়াসকে স্বতন্ত্রই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর নাটকের জনতার মুখেও জাতির জনতার ভাষা দেন নি। নাট্যাচার্য কিন্তু নিজেকে স্বতন্ত্র রাখবার কল্পনায় প্রসন্ন হতে পারেন নি। তিনি সৌখিন সম্প্রদায়ের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাকে আত্মপ্রকাশের, আত্ম-সম্প্রসারণের, বাধা মনে করেছেন। নেশাকে তিনি পেশা করে নিয়েছেন অর্থ উপার্জনের তাগিদে নয়, জন-সংস্রবকে তিনি কামনার বিষয় করে নিয়েছেন রাজনীতিক প্রয়োজন-বোধে নয়—নিয়েছেন, তাঁর শিল্পী-সত্তাকে ব্যক্ত করবার জন্য। আর্টিষ্টের স্বধর্মই হচ্ছে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ, বহুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া; প্রফেট হওয়া নয়, গুরু হওয়া নয়, সেবক হওয়াও নয়। আর্টিষ্ট যেমন যুগাতীত, তেমন যুগ-সংপৃক্ত। তাই আর্টিষ্টের সৃষ্টির মাঝে যুগ-লক্ষণের পরিচয় থাকবেই, জন-সান্নিধ্য তাঁকে কামনার ধন করে নিতে হবেই। নাট্যাচার্য তাই নাটুকে

নেশায় যখন একেবারে মজে গেলেন, তখন বুঝলেন অভিনয়কে পেশা করে না নিলে, ওর আঘাত-অভিনন্দন, ওর আনন্দ-বেদনা, ওর সার্থকতা-ব্যর্থতা স্বীকার করে না নিলে, সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। ইউরোপের বহু নাট্যকারকে, বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাই করতে হয়েছিল। যাঁরা তাই করেছিলেন, তাঁরাই নাটককে ও নাট্যশালাকে কেবল প্রতিষ্ঠাই দিয়ে যান নি, উন্নতও করে গেছেন। সেক্সপীয়ার থেকে শুরু করে ইবসেন, সকলেই তাই করেছেন। একা ইবসেন একশত পঁয়তাল্লিশখানা নাটক প্রযোজনা করেছেন পেশাদার প্রয়োগকর্তারূপে। এমন নাটকও তাঁকে প্রযোজনা করতে হয়েছে, যা তাঁর শিল্পী-মনকে আঘাত করেছে। গ্যয়টেকেও ও-কাজ করতে হয়েছে। মলেয়ার ত ও-কাজ করেছেনই। কিন্তু মলেয়ার বড় শক্ত লোকও ছিলেন। চতুর্দশ লুই বিরক্ত হবেন জেনেও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ নাটক রচনা করে রাজাশ্রয় ত্যাগ করেছিলেন, অভিনয় পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে ফরাসী আকাদেমীর সদস্য হবার গৌরব উপেক্ষা করেছিলেন। বার্নার্ডশও কম শক্ত লোক ছিলেন না বলে আমরা শুনি। কিন্তু তাঁকেও ক্যানডিডা অভিনয় করবার যোগ্যা অভিনেত্রী সন্ধান করবার জন্য লণ্ডনের অগণ্য থিয়েটারে রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তিনিই বলে গেছেন। তাঁর নেশা ছিল নাটকে, কিন্তু পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন সঙ্গীত ও নাটকের সমালোচনা। যদি শুরু থেকেই নাটককে তিনি পেশা করে নিতেন, তাহলে হয়ত তাঁর কাছ থেকে আমরা অন্যরকম নাটক পেতাম।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার নেশাকে পেশা করে নিয়েছিলেন বলেই যুগ-লক্ষণ তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। সে যুগ মাইকেল-দীনবন্ধু-বঙ্কিম-গিরিশ-অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরশ পেয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল। জাতির এমন কোন প্রয়াস, এমন কোন প্রতিবাদ, এমন কোন বেদনা, এমন কোন আনন্দ, এমন কোন আশা, এমন কোন হতাশা জাতিকে আন্দোলিত করে নি—যা, ওঁদের রচনায় প্রকাশ পায় নি। নাট্যাচার্য ওঁদের কাউকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নি, কাউকে সমগ্রভাবে প্রত্যাখ্যানও করেন নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি মাইকেলের কোন নাটক উপস্থিত করেছেন বলে আমার জানা নেই, দীনবন্ধুর 'সধবার

একাদশী' খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, গিরিশের প্রফুল্ল করেছেন, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস করেছেন, পাণ্ডব-গৌরবও করেছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত এবং সাজাহানও করেছেন; ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর, নরনারায়ণ, আর আলমগীর; যোগেশচন্দ্রের সীতা, দিগ্বিজয়ী, বিষ্ণুপ্রিয়া; রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, শেষরক্ষা, যোগাযোগ, আর তপতী; শরৎচন্দ্রের ষোড়শী, রমা, বিরাজ-বৌ, বিজয়া, গৃহদাহ নিজ প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন। মনোমোহন থেকে শুরু করে নাট্যমন্দিরের অবলুপ্তি পর্যন্ত তাঁর আত্মপ্রকাশের বর্ণবহুল যুগ। ওই যুগে তাঁর নাটক নির্বাচন থেকে এ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, তিনি প্রবহমান নাট্যধারাকে খর-স্রোতা করতে চেয়েছেন, নূতন খাতে তাকে বহিয়ে নিতে চান নি। যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে তিনি যেমন সীতা, দিগ্বিজয়ী লিখিয়ে নিয়েছিলেন, তেমন অন্য লেখকদের দিয়ে তিনি তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুভূতি প্রতিফলিত নাটকও লিখিয়ে নিতে পারতেন। সীতার আর দিগ্বিজয়ীর সাফল্য তাঁকে বোঝবার অবসর দিয়েছিল যে, নূতন নাট্যকারের লেখা মাত্রই ব্যর্থ হতে বাধ্য নয়। কিন্তু তবুও তিনি নূতন নাট্যকারের নাটক নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর যে তখত্-ই-তাউস তিনি শ্রীরঙ্গমে অভিনয় করলেন, তার পাণ্ডুলিপি তিনি পেয়েছিলেন নাট্যমন্দির চালু থাকবার সময়েই। শ্রীরঙ্গমে তাঁর অভিনয় দেখবার সময় আমার কেবলই এই আফসোস হয়েছিল, হায়রে! তাঁর জীবন-মধ্যাহ্নে নাটকখানি কেন তিনি অভিনয় করলেন না! ওই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সেই সময়েই গোর্কির লোয়ার ডেপথস্ অবলম্বনে 'মাটির মাণিক' নাম দিয়ে একখানি চমৎকার নাটক লিখেছিলেন। তিনি সেখানিও পরখ করে দেখেন নি। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তার মুক্তি' বোধ করি মদন কোম্পানির বেঙ্গলী থিয়েটারেই তিনি অভিনয় করিয়েছিলেন। সে একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়েছিল। মণিলাল নাট্যমন্দিরে তাঁর সহচর রূপেই থাকতেন। সেই মণিলালকে দিয়ে 'মুক্তার মুক্তি'র মতো আরো কয়েকখানি মধুময় সৃষ্টি তিনি করিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে 'বসন্তলীলাও' পরম চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ও-রকম সৃষ্টিও তিনি অনেকই দিতে পারতেন। তাও তিনি

দেন নি। নব-নাট্যমন্দিরে তিনি বিরাজ-বৌকে নিজে নাটকে সাজিয়েছিলেন, এবং পরে রীতিমত-নাটকে সহ-রচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম দেখতে পাই জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে। বিরাজ-বৌ আর রীতিমত নাটকের প্রয়াস দেখে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, তিনি বাংলা নাটকের নূতন রূপের সন্ধান করছিলেন। লেখক নেই বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। নব-নাট্যমন্দিরেই সমসাময়িক রাজনীতিক প্রয়াসের উপর রচিত আমার 'দশের দাবী' দিন কয়েকের জন্য তিনি অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় খুব ভালোও হয়, জমাটিও হয়। কিন্তু নাটকখানি দর্শক আকর্ষণ করতে অসমর্থ হয়। সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে রচিত নাটক বোধকরি ওই তিনি প্রথম অভিনয় করেন। কথনো তিনি বলতেন নাটকখানি ভালো হয়েছে, তিনি নিজে ওর অনুবাদ করবেন ইংরিজিতে, এবং বিলেতে নাটকখানি ইংরিজিতে অভিনয় করবেন। আবার কখনো বলতেন কিছুই হয় নি ওখানা। আমার মনে হয় তখন নাটকের রূপ নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। তাঁর চিত্ত চাইছিল এক, এবং বুদ্ধি চাইছিল আর। তাই বোধকরি সৃষ্ট হয়েছিল দিগম্বর চরিত্র।

শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন করেন তিনি নূতন নাট্যকার-রচিত নূতন নাটক নিয়ে। নাটকখানি তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ'। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও লিখে দেন 'দেশবন্ধু' পেট্রিয়ট অবলম্বনে, আর 'বন্দনার বিয়ে'। নিতাই ভট্টাচার্য নাট্যাচার্যের ছাত্র। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন—'আই শ্যাল সিঙ্ক অর সুইম উইথ শিশিরকুমার ভাদুড়ী'। তিনি দিলেন 'উড়ো-চিঠি' নাটক। সেখানাও ভালো চলল না। নিতাই ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদনে' নাট্যাচার্য তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পেলেন। অনুপম অভিনয় করলেন তিনি। কিন্তু নিতাই ভট্টাচার্য আর তাঁর জন্য নাটক লিখলেন না। তিনি নাটক লেখাই ছেড়ে দিলেন। বাংলার নাট্যশালা একজন শক্তিধর উদীয়মান নাট্যকার হারালেন। আজ বাংলার সিনেমা-জগতে সূর্যের মতো ভাস্বর নিতাই ভট্টাচার্য।

তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'কে তিনি নাটক বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে নাটকে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নি—না অভিনয়ে, না প্রয়োগ-ব্যবস্থায়। করতেন যদি, নাটকের পরিণতির দৌর্বল্যটুকু হয়ত তিনি শুধরে

দিচ্ছেন। তারপরেও তিনি নূতন নাট্যকার জিতেন মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' আর তারাকুমারের 'প্রশ্ন' অভিনয় করেছেন। কিন্তু শিশির-প্রতিভা সে দু'খানি নাটককেও প্রদীপ্ত করতে পারেনি।

শ্রীরঙ্গমে তিনি এতগুলি নূতন নাটক মঞ্চস্থ করলেন কিন্তু একমাত্র মাইকেল মধুসূদন ছাড়া একখানি নাটকেও তিনি তাঁর চিত্তের আবেদন অনুযায়ী ভূমিকা পান নি বলে জন-সংশ্রব স্থাপন করতে পারেন নি। অথচ নাটকগুলি তিনিই মনোনয়ন করে নিয়েছিলেন। ভালো জেনেই নিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে-নাটকগুলি তিনি মনোনয়ন করেছিলেন, তাদের কি এমন আবেদন ছিল না, যা দর্শক-হৃদয় স্পর্শ করতে পারে? 'দুঃখীর ইমান' করেছিল, তিনিই বলেছেন। বিপ্রদাস, বিন্দুর ছেলে জন-সমর্থন পেয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিধায়কের 'সেই তিমিরে'ও জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু তিনি যেগুলি মনোনয়ন করে নিজে অবতীর্ণ হলেন, সেই নূতন নাটকগুলিই দর্শক আকর্ষণ করল না, যদিচ মাইকেল মধুসূদন করল, তখত্-ই-তাউস করল।

আমার মনে হয় যে-নাটকগুলি দর্শক আকর্ষণ করতে পারে নি, তা অন্য কোন মঞ্চে অভিনীত হলেও দর্শক আকর্ষণ করতে পারত না। দুঃখীর ইমানের আবেদন স্বতন্ত্র। ও বিষয়-বস্তু তখন দেশের লোকের চিত্ত স্পর্শ করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অন্যগুলি ভূয়ো-ইন্‌টেলেক্টের খেলা, অথবা অন্ধ-অনুকৃতির পরিচয়। ভারতবর্ষ ও-ধরনের নাটকের সঙ্গে পরিচিত নয়। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন আর তখৎ-ই-তাউস তা নয়। দেশের লোক ওদের রূপের সঙ্গে পরিচিত। ওরা যে রস-সৃষ্টি করেছিল, তারও সঙ্গে পরিচিত। নাট্যাচার্যও ওদের মাঝে আপন অনুভূতির তুল্য-অনুভূতির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই আলমগীর-চন্দ্রগুপ্তের চেয়ে ও-গুলি ভাষায়, গঠনে ও আবেদনে পৃথক হলেও নাট্যাচার্য তাঁর রোমান্টিসিজম আর র‍্যাশনালিটি দিয়ে অভিনয়কে ন্যাচুরালিজমের পর্যায়ে তুলতে পেরেছিলেন, তখনকার অন্য নূতন নাটকগুলির অভিনয়ে যা তিনি পারেন নি।

যে-নাটকগুলি জনপ্রিয় হয় নি, তা যে সর্বৈব ব্যর্থ রচনা হয়েছে, এ-কথাও আমি বলতে চাই না। আগেই বলেছি, দর্শকরা পরিচিত হন নি নাটকের

ওই রূপের সঙ্গে, এবং যে ইনটেলেকচুয়াল-অনুভূতির দাবী নিয়ে ওই নাটকগুলি দাঁড়িয়েছিল, তা দর্শকদের কাছে ইন্‌টেলেক্ট-গ্রাহ্য বলে মনে হয় নি।

পর পর অতগুলি নূতন নাট্যকার রচিত নাটক নাট্যাচার্য পূর্বে কখনো অভিনয় করেন নি, এবং তাঁর অভিনীত অতগুলি নাটক পর পর জন-সমর্থন লাভে কখনো বঞ্চিতও হয় নি। কিন্তু ও-নাটকগুলি ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক অথবা স্বল্প-পরবর্তীকালের নাটক নয়। বিশ-পঁচিশ বছর ব্যবধান রয়েছে ওই দুই রূপের নাটকের মাঝে। সেই ব্যবধানকালে স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন রূপান্তরিত হয়েছে, তেমন কমিউনিজমও দিকে দিকে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইংরেজের আবির্ভাবের সময় যেমন বিদেশী সংস্কৃতি একটা চমক নিয়ে এসেছিল, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমও তেমনই একটা চমক নিয়ে এলো। তারই সঙ্গে সঙ্গে এলো ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিজমের বিরোধীদের বাণী। ইউরোপ দুই মতবাদের ভিতর দিয়েই নূতন করে দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হোলো। নাট্যশালা যদিও রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ওদেরকে গ্রহণ করল না, কিন্তু যেহেতু গান্ধী-মতবাদ থেকে এতদিন প্রেরণা পায় নি—সেইহেতু ইউরোপীয় মতবাদ থেকে সে সামাজিক-মতবাদ গ্রহণ করল, এবং বল-প্রয়োগে স্বাধীনতা অর্জন যে অন্যায় নয়, কৌশলে তা প্রচার করাও কর্তব্য বলে মেনে নিল।

তখনকার নাটক মূলত রোমান্টিকই রয়ে গেল, কিন্তু বঙ্কিম-গিরিশ সমাজ-তন্ত্রকে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, নূতন লেখকরা সে দৃষ্টি দিয়ে না দেখে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রকে আদর্শ বলে গ্রহণ করল। এই যুগের নাটকগুলিতে তাই লক্ষ্যের বিষয় হয়ে ওঠে বিদেশী শাসন এবং স্বদেশী সমাজ-শাসন উভয়ই ব্যর্থ করে দেবার আবেদন। বিদেশী-শাসন সম্বন্ধে অনেক নাট্যকার নীরব থাকলেও সমাজের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহের আবেদন সৃষ্টি করেছেন; সমাজকে সমর্থন করবার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেন নি। উপন্যাসে কিন্তু ও-সময়ে কেউ কেউ তা করেছেন। নবীন-উপন্যাসকাররা যদিও শাসনতন্ত্রের স্বৈরাচার সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, সমাজতন্ত্রের স্বৈরাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ( গোরা, ঘরে-বাইরে, চার অধ্যায় ) রাজনীতিক চেতনা এবং উত্তেজনাকে বিষয়বস্তু করে নেন। শরৎচন্দ্র পথের দাবী উপন্যাসে বাংলার বিপ্লববাদ যে মানবতা জাত, তা বোঝাবার চেষ্টা করেন। চার অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আবার বিপ্লববাদের নিষ্ঠুরতার দিক দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেন। নাটকে রবীন্দ্রনাথ হিংসা-অহিংসার ঊর্ধ্বতর স্তর থেকে রাজনীতি ও সমাজনীতি বিশ্লেষণ করে মানবের পরিণতির পথের হদিস দেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের পরবর্তী নাট্যকাররা ক্রমশই নাটকে এমন চরিত্র গড়ে গেলেন, এমন ঘটনা স্থাপন করতে থাকেন, যাতে করে রাষ্ট্র-সমাজের গঠন যে মানুষের পরিণতির সহায়ক বা হন্তারক তা বোঝা যায়। তখনকার নাটকের হিরো-হিরোইনরা শুধু প্রণয়ই করে না, পরাধীনতার বন্ধন-বেদনাও প্রকাশ করে। সমাজের বন্ধন এবং রাষ্ট্রেরও বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হতে চায় যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হবার জন্য নয়, নূতন রাষ্ট্র গড়বার জন্য, নূতন সমাজ গড়বার জন্য, নূতন পরিণতির দিকে মানুষকে এগিয়ে দেবার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে, বিশেষ করে কোন্ কোন্ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আগে উল্লেখ করেছি। রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশ-অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের দান তাঁদের পরবর্তী নাট্যকাররা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন। কেউ কেউ ওঁদের কারু কারুর রচনার অনুকরণ করতে চেয়েছেন, এবং কেউ কেউ একটা সমন্বয়েরও চেষ্টা করেছেন—কিন্তু প্রায় সকলেই তখনকার রাষ্ট্র-সমাজকে আঘাত করা কর্তব্য বলে মনে করেছেন। বঙ্কিম থেকে ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রলালের এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি থেকে তাঁরা সম্পদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন। বিদেশী নাটককেও তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন।

আঙ্গিকের দিক দিয়েও তাঁরা নাটককে অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়েছেন। আগেই দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রযোজনায় যে নূতন আলো ঢেলে দিয়েছিলেন, তারই কিছুটা পেশাদারী মঞ্চে প্রতিফলিত করে নাট্যাচার্য অনেক পুরাতন নাটককেও নব-রূপে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

( ১৬ )

## আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির

শিশিরকুমারের সমসাময়িক আর্ট থিয়েটারের দান সম্বন্ধে এতক্ষণ বিশেষ কিছুই বলিনি। আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ষ্টার থিয়েটারে। স্বনামধন্য প্রবোধচন্দ্র গুহ ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের, অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানিটির সম্পাদক; ম্যানেজার ছিলেন নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র। বোর্ড অব ডিরেক্টরসে´ কোলকাতার অনেক ধনিক-নাট্যরসিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এবং পরবর্তীকালে রঙমহল ও নাট্যভারতীর কর্ণধার গদাধর মল্লিক মহাশয় বাংলার নাটকের ও নাটাশালার পোষক ও অগ্রগতির সহায়ক বলে চিরস্মরণীয় থাকবেন, যেমন থাকবেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধচন্দ্র।

নাট্যাচার্যের আর আর্ট থিয়েটারের আবির্ভাবের আগে বাঙলা থিয়েটারকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন যাঁরা, এবং পুরাতনে আর নূতনে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় আর বরণীয় থাকবেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধচন্দ্র এবং একই কারণে মনোমোহন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাণ্ডে এবং তখনকার মিনার্ভার মালিক উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বর্তমান ষ্টা'র থিয়েটারের মালিক সলিলকুমারের পিতৃদেব।

যাঁদের দানের উল্লেখ করলাম, তাঁদের মাঝে একমাত্র প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে সকলের বৈশিষ্ট্য-প্রকাশ সম্ভব নয়। এই আর্ট থিয়েটারেই সমবেত হন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং সুশীলাসুন্দরী ( বড় ) রাজলক্ষ্মী ( বড় ), সুবাসিনী ( কিন্নরীকণ্ঠী ), নীহারবালা, কৃষ্ণভামিনী,

সুশীলাবালা (ছোট) সরস্বতী, লাইট প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতৃরা যাঁরা বাংলার নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করে ধন্য হয়েছেন। এঁদের পাশে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েছেন অমৃতলাল বসু, দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) এবং তারাসুন্দরী।

নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য ছিল; তাই সৃষ্টিতেও কিছু পার্থক্য দেখা যেত। আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুনে আর নাট্যাচার্যের সীতায়, আর্ট থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণ আর নাট্যাচার্যের নর-নারায়ণে, এই পার্থক্যটা পরিষ্কার চোখে পড়েছিল। নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানে নাটকের ভিতর দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি হোতো, প্রযোজনায় যে শিল্প-চেতনা প্রকাশ পেত, যে আবেগ অন্তরকে দোলা দিত,—আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তার অভাব দেখা যেত।

কর্ণার্জুনে যেমন বিরাট সেটিংস ব্যবহৃত হোতো, সীতাতেও তার চেয়ে কিছু কম হোতো না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'সীতা' যেমন শ্রী নিয়ে ফুটে উঠত, কর্ণার্জুন তেমন শ্রী নিয়ে ফুটে উঠত না—যদিচ সীতার সেটিংসে ত্রুটি বড় কম ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি প্রথম দৃশ্যে যে বেদীর উপর সীতাকে নিদ্রিতা দেখা যেত, সেই বেদীটির গঠন প্রাচীন স্থাপত্যের কোন ইঙ্গিতই দিত না। দ্বিতীয়ত রামায়ণের ওই কাহিনী রূপায়িত করতে সাঁচী-স্তূপের বিখ্যাত তোরণটির অনুরূপ একটি তোরণও দেখা যেত। এমন অনেক anachronism সীতায় ছিল। কর্ণার্জুনে যে স্থাপত্য দেখা যেত, তা কোন-কালেরই স্থাপত্যের পরিচয় বহন করত না। Anachronism সত্ত্বেও সীতার সেটিংস নাটকীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে, যেমন অঙ্গাঙ্গি হয়ে দর্শক মনে একটা ছাপ রেখে দিত, কর্ণার্জুন তা দিত না। কর্ণার্জুনে প্রত্যেক বড় বড় সেট-সিনের অভিনয়ের অন্তে দীর্ঘকাল বিরতি দিতে হোতো পরবর্তী সেট তৈরির সময় নেবার জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখাবার জন্য আর্ট থিয়েটার নামক প্রতিষ্ঠানেও কাঠের রথ আর মাটির ঘোড়া মঞ্চে স্থান দেওয়া হোতো, দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের আর অর্জুনের প্যাকাটির তীর বর্ষণ দেখিয়ে যুদ্ধের ইলিউশন সৃষ্টির চেষ্টা করা হোতো, বৃষকেতুকে করাত দিয়ে কেটে দেখানো হোতো যে,'সে আসলে

অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কোলে। কাগজের হাতীতে চড়ে ঔরংজীব যুদ্ধ করছেন তাও দেখেছি গোলকুণ্ডা নাটকের অভিনয়ে। অবশ্য এ-সব ব্যাপার দর্শকদেরকে পীড়া দিত না। যদি পীড়া দিত, তাহলে ও-নাটক অমন চলত না।

কিন্তু কর্ণার্জুন চলবার কারণ ও-গুলি নয়। কর্ণার্জুনে যে বাইরের সংঘাত আছে, যে গতি আছে, এবং ভাষায় সেই সংঘাতকে এবং সেই গতিকে দর্শক-মনে সংক্রমিত করবার যে শক্তি আছে, তাই শক্তিমান অভিনেতৃদের সহায়তায় দর্শকদেরকে মায়ালোকে সরিয়ে নিতে পারত। কর্ণার্জুনের রচয়িতা অপরেশচন্দ্র নিজেকে গিরিশের শিষ্য বলে পরিচিত করতেন। তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই-ই মিষ্টি ছিল। কিন্তু গিরিশের প্রভাব তাঁর রচনার উপর ছিল না—না পদ্যে, না গদ্যে। তাঁর ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নয়, যদিচ অভিনয়োপযোগী করে বাঁধা, তবুও রবীন্দ্র প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। দৃশ্যপটে এবং আবহে আধুনিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে যদি ওই নাটকখানিকে ভারতীয় রীতিতে অথবা এলিজাবেথীয় রীতিতে পরিবেশন করা হোতো, তাহলেও ও-নাটকখানি দর্শক আকর্ষণ করতে পারত, যেমন পারত সীতা। দুখানি নাটকেই আবৃত্তি এবং আঙ্গিক অভিনয় নূতনত্বের পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে নূতনত্ব সর্বৈব সঙ্গত হবার স্বীকৃতি দাবী করতে পারে কিনা, তা হচ্ছে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণও অপরেশচন্দ্রের রচনা। স্থানে-স্থানে তাও সুরচিত। কিন্তু কর্ণার্জুনের মতো তা তেমন সহজ ও সরল নয়। তার ঘটনা সংস্থাপনাও নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারের পরিচয় বহন করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ওই নাটকের একটি কৌতুককর সমালোচনা লিখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নাট্যকার কেমন করে নিজের খেয়ালকেই নাটকের আকারে গড়ে তোলবার দুশ্চেষ্টা করেছিলেন। ওই শ্রীকৃষ্ণ নাটকেই দেখানো হোতো শ্রীকৃষ্ণের হস্তচ্যুত সুদর্শন চক্র অগ্নি-বৃত্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে মহাবীর পশুপালের শির ছেদন করছে। ওই নাটকের জন্য প্রচার করা হয়েছিল, খাস কাশী থেকে পঞ্চাশখানা বানারসী ধুতি ও শাড়ি আনা হয়েছিল। বাহুল্য ও বালকোচিত আয়োজনের প্রাচুর্যও ওই নাটকখানিকে দীর্ঘজীবী করতে

পারেনি, সুনামও দেয়নি। কিন্তু নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের নর-নারায়ণকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রযোজনায় অতি সহজ-সঙ্কেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সার্থক ভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি; দুটো ভাঙা রথের চাকা, কিছু দলিত-মথিত বৃক্ষশাখা এবং একটা থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ-সংগ্রাম হয়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-সম্পদ অপরেশচন্দ্রের চেয়ে বেশি ছিল, এবং কাব্যাবৃত্তিতে নাট্যাচার্য আর তাঁর শিষ্যরা অধিকতর দক্ষ ছিলেন বলেই নর-নারায়ণে জটিলতা বেশি থাকলেও নাট্যাচার্য তাকে সার্থক সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন। দুইটি থিয়েটারের সব পৌরাণিক নাটক আলোচনা না করে এ-কথাই বলা যায় যে, নাট্যাচার্যের সৃষ্টিতে যে কাব্যের পরিচয় পাওয়া যেত, আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তা পাওয়া যেত না। আমি নাট্যাচার্যকে কয়েকবার বলিছি তিনি বড় কবি না বড় অভিনেতা, সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। দানীবাবুর অভিনয় দেখেও আমার মনে হোতো তিনিও কবি-চিত্তের অধিকারী। তাঁর চাণক্যে, তাঁর যোগেশে, আমি বেশি অভিভূত হতাম, নাট্যাচার্য রূপায়িত ওই দুইটি ভূমিকার তুলনায়। শাস্তি কি শান্তি? নাটকে দানীবাবুর শেষের দিককার অভিনয় দেখতে দেখতে আমার একখানা বিলিতি ছবির কথা মনে পড়ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে একটি পাহাড়ের শৃঙ্গ উঠেছে, চারিদিক থেকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটে এসে তাতে আঘাত হেনে ফেটে পড়ে ফিরে যাচ্ছে, পর্বতশৃঙ্গ পদতলের তরঙ্গ-বিক্ষোভ তুচ্ছ করে নীল-আকাশ স্পর্শ করবার আগ্রহ নিয়ে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দানীবাবু অভিনীত শাস্তি কি শান্তি নাটকের প্রসন্ন চরিত্র আমার মনে ওই ছবি জাগিয়ে তুলত। আমি যেন তা প্রত্যক্ষ করতাম। আমি প্রসন্নর মৃত্যু দিয়ে নাটক শেষ করা তখনো পছন্দ করতাম না, এখনো করি না। তবে এখন মনে করি গিরিশের যে বিশ্বাস ছিল, তা আর কোন সমাপ্তি স্বীকার করে না। সে বিশ্বাস এই যে, ভাগবৎ কৃপা ব্যতীত মানুষের সে রূপান্তর ঘটে না, যে

রূপান্তরের ফলে রক্ত-মাংসের মানুষ সকল আঘাতে অটল থাকতে পারে। চাণক্য যখন কন্যাকে ফিরে পায় চন্দ্রগুপ্ত নাটকে, তখন দানীবাবু যে অভিনয় করতেন, তা কাব্য হয়ে উঠত। কিন্তু যোগেশের 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বলায় নাট্যাচার্য দানীবাবুর চেয়ে বেশি কাব্য সৃষ্টি করতেন। দারার ছিন্ন মুণ্ড দেখবার কল্পনা যা দানীবাবুর অভিনয়ে প্রকাশ করতেন, আমার মনে হোতো, তার চেয়ে ভালো অভিনয় হওয়া উচিত। অবশ্য রচনাও তেমন হয় নি, যেমন করে সেক্সপীয়ার রচনা করেছিলেন ম্যাকবেথ নাটকে ব্যাঙ্কোর ভূত দেখবার কল্পনাকে। মনে করবার কারণ আছে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেরণা পেয়েছিলেন তাই থেকেই। আগেকার যাত্রায় প্রায় প্রত্যেক পালায় কিন্তু অনুরূপ একটা দৃশ্য থাকতই। অনেকে মনে করেন দানীবাবুর আর নাট্যাচার্যের অভিনয় একেবারে বিপরীত ধরনের। আমি কিন্তু তা মনে করি না। ওঁদের দুজনারই অভিনয় একই ধরনের, আবৃত্তিতে দুজনাই অতুলনীয়। দানীবাবু অভিনয় শিখেছিলেন অমৃতলাল মিত্রের কাছে, জনক গিরিশের কাছে নয়। অমৃতলাল মিত্র আবৃত্তিতে অতুল, শুনেছি।

আর্ট থিয়েটারের অভিনেতৃদের মাঝে ও-রকম আবৃত্তি-যাদুর অধিকারী কেউ ছিলেন না, অপরেশচন্দ্র ব্যতীত। অপরেশচন্দ্রের অভিনয় নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর কণ্ঠে নাট্যাচার্য দানীবাবুর কণ্ঠের চেয়ে কম ব্যঞ্জনা ছিল না। তাঁর শারীরিক অপটুতা তাঁর অভিনয়কে পরিণতিতে পৌঁছুতে দেয়নি—তবু চিরকুমার সভায় শেষ বয়েসে তিনি যে রসিক করে গেছেন, তা অতিক্রম করবার মতো অভিনেতার আবির্ভাব আজো হয়নি। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তির খ্যাতি ছিল। আবৃত্তিবহুল ভূমিকাগুলি অভিনয় করে তিনি শ্রোতৃদেরকে মাতিয়ে তুলতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তা কেবল সুষ্ঠু আবৃত্তির গুণেই নয়, বাক্-বিভূতির বা oration-এরও গুণে। দুর্গাদাসের গদ্য আবৃত্তি সুমধুর ছিল। কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যের জন্য, বিশেষত যখন তিনি খাদে আবৃত্তি করতেন। তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, তাঁর পুরুষোচিত সুঠাম দেহ, তাঁর গাঢ় কালো চোখ, তাঁর অনুপম চলা-ফেরা। মঞ্চে অমন করে দাঁড়াতে, অমন চলা-ফেরা করতে, আর কাউকে আমি দেখিনি।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি ছবি ফুটিয়ে তুলত। নরেশচন্দ্র আর রাধিকানন্দ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। মঞ্চে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা নাটকের চরিত্র হয়ে উঠ্‌তেন। নরেশচন্দ্রের খর্ব আকৃতির আর খিন্ন কণ্ঠস্বরের সকল ত্রুটি দূর করে দেয় তাঁর প্রদীপ্ত চোখের অভিনয় এবং ইমোশনকে দুর্বার করে দেখাবার কৌশল। রাধিকানন্দেরও কণ্ঠস্বর কিছুটা ভগ্ন ছিল, কিন্তু বাণী ছিল বিশুদ্ধ, অভিনয়ে ইমোশনের চেয়ে ইনটে-লেক্ট প্রয়োগ করতেন বেশি। যেমন প্রচীন বাংলার সামাজিক শিক্ষিতের, তেমন ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাতের, তেমনই ফেরঙ্গ-বয়াটের চরিত্র সমান ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তিনি সেই জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বংশজ যাঁর বাজ-বন্দনাকে ব্যঙ্গ করে গজদানন্দ বা হনুমান চরিত্র অভিনয় করে নাট্যশালা ১৮৭৬ সালের আইনের অক্টোপাসে জড়িয়ে পড়ে। পূর্বপুরুষ নাট্যশালার বন্ধন-যন্ত্রণার নিমিত্তভাগী হয়েছিলেন বলেই হয়ত তিনি প্রায়শ্চিত্ত-মানসে সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাট্যশালার সেবা করেই জীবন অতিবাহিত করে গেলেন। নরেশচন্দ্রও ওকালতীর মোহ ত্যাগ করে নাট্য-শালায় যোগ দান করেন। ওঁরা দুজনাই প্রথমে যোগদান করেন মিনার্ভা থিয়েটারে, পরে আসেন আর্ট থিয়েটারের আসরে। নাট্যমন্দিরেও অভিনয় করেন ওঁরা।

সব শেষে অহীন্দ্র চৌধুরীর কথা বলছি, তিনি সবচেয়ে নিরেস মনে করে নিশ্চিতই নয়, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কতগুলি কথা বলবার আছে বলেই। তিনি কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে অথবা আবৃত্তির গুণে প্রতিষ্ঠা করে নেননি। কণ্ঠস্বর তাঁর কর্কশ নয়, আবৃত্তিও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু তাঁর অভিনয়ে ও-দুটি বিষয় যেন গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তার অনুপম কৌশল। নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি ইমোশন দিয়ে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জনা দিয়ে, দর্শক চিত্তে ঝড় তুলে দিতে পারেন। তাঁর নিজের মনে নাটকের চরিত্র যে-রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তাঁর মনের রংয়ের পরশ দিয়ে তাকে প্রজেক্ট করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তিনি দুর্নিবার, চিত্ত তিনি জয় করে নেবেনই; হয় কণ্ঠ দিয়ে, নয় দৃষ্টি দিয়ে,

নয় ত বা বিশিষ্ট কোন ভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু সব সময়েই গভীর আবেগের আবেদন দিয়ে। যুগপৎ সব কৌশল তিনি এক সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু সহজাত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি অভিনয়কে ধ্যানের ও ধারণার বিষয় করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ক্রম-বিবর্তন কখনো স্তব্ধ থাকেনি। যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন বয়েসের ভূমিকা তিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর সমসাময়িক আর কোন অভিনেতা তা করেননি। অবশ্য সব ভূমিকাতেই তিনি যে সফল হয়েছেন, তা বলি না। কিন্তু যে-গুলিতে তিনি সফল হয়েছেন, সে-গুলি জনচিত্ত-জয়ে অজেয় হয়েই রয়েছে। অনেককে বলতে শুনি তাঁর চন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের কল্পনানুযায়ী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন, আমি জানি না। তবে শুনেছিলাম তিনি নাকি বলেছিলেন, ওটি অহীন্দ্রর একটি সৃষ্টি। ওই সৃষ্টির ক্ষমতা আর্টিষ্টের বড় ক্ষমতা। নানা যুগের অভিনেতৃরা সেক্সপীয়ার-অঙ্কিত নানা চরিত্র নানা রূপে সৃষ্টি করেছেন। সব-সৃষ্টিগুলি যদি সেই-সব চরিত্রকে রূপ দিতে পেরে থাকে, তাহলে সেক্সপীয়ারের সৃষ্টিকে যেমন অসাধারণ মানতে হয়, তেমন অভিনেতৃদের সৃষ্টিকেও অসাধারণ বলতে হয়। আর সেক্সপীয়ার ত এখন বলতে আসছেন না, কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী ঠিক তাঁর মনের মতোটি করে তাঁর কল্পনার চরিত্রকে যথার্থ রূপ দিয়েছেন। তাঁর নাটকের সঙ্গে নূতন সৃষ্টি কতটা খাপ খায়, তাই দেখেই বিচার করা হয়। চিরকুমার সভা এমন একখানি 'কমেডি অব ম্যানার্স' যা নিয়ে যে-কোন দেশ গৌরব করতে পারে, যেমন পারে 'কমেডি অব এরারস' শেষ রক্ষা নিয়ে। দুখানা নাটকই বাংলার অভিনেতৃরা অনুপম অভিনয় করেছেন। চিরকুমার সভায় অহীন্দ্রর চন্দ্রবাবুকে আর দুর্গাদাসের পূর্ণকে অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেন, তাঁরা নাটকখানির মর্মবাণী মনে না রেখে ওকে একখানা বাস্তব সামাজিক কমেডি বলে প্রমাণ করতে চান। তা করতে যাওয়া ঠিক নয়। চিরকুমার সভার প্রকৃত রূপ ত শৈল আর রসিকদা অনাবৃত করে দিয়েছেন। ওর সব কিছুই ত রঙ ফলানো। নইলে একদল কুমার আর কুমারী মিলে ও-রকম রুমালের হরিরলুঠ সত্যি সত্যিই এ দেশে কখনো দিয়েছে, না এখনই

দেয়? চিরকুমার সভা হচ্ছে একটা টেন্‌ডেন্‌সির বা ঝোঁকের বিস্তার, অর্থাৎ প্রজেকশন, বাস্তবের প্রতিফলন নয়। আমি কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি কোন একজন আপন-ভোলা অধ্যাপক নাকি চন্দ্রবাবুর চরিত্রের উৎস, এবং নাট্যাচার্য সেই অধ্যাপককে জানতেন বলে চিরকুমার সভার চন্দ্রবাবুকে অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন। 'উৎস' সম্বন্ধে এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা তা আমি জানি না। কিন্তু যুক্তিটা আমি আদৌ মানি না। 'উৎস' হলেও অধ্যাপকটি কোন কমেডির চরিত্র ছিলেন না, ছিলেন সমাজের বাস্তব মানুষ। তাঁকে সেখান থেকে তুলে এনে একটি কমেডির ভূমিকায় রূপায়িত করলে কমেডি ফেঁসে যায়। কেননা তাহলে সমাজের বাস্তবতাও আমদানি করতে হয়। চিরকুমার সভাকে বাংলায় প্রহসন বলা হয় ওর অভিনয় হাসায় বলে। কিন্তু ওখানি ফার্স নয়, স্যাটায়ারও নয়, সমাজের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গত-মিলনের ব্যাকুলতাকে কুণ্ঠার ও লজ্জার আবরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করবার প্রয়াস নিয়ে রসিকদার নির্মল কল্যাণকাম পরিহাস। একটা ঝোঁক নিয়ে যে পরিহাস করা হয়, তাতেও একটা ঝোঁক থাকে; রঞ্জন প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, অহীন্দ্র যে রূপ দিয়েছিলেন, তার ছবি মন থেকে মুছে ফেলা শক্ত। সকল শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদের সম্বন্ধেই এ-কথা বলা যায় না, কারু-কারু সম্বন্ধে বলা যায়। অহীন্দ্র সেই স্বল্প শ্রেষ্ঠদের অন্যতম।

অহীন্দ্রর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নূতনের প্রতি অনুরাগ, বিরাগ নয়। তাই বলে 'নতুন কিছু কর' বুলিকে কখনো তিনি স্লোগান করে তোলেন নি। নূতনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ আর্ট থিয়েটারে বার-বার প্রকাশ পেয়েছে। তখন পরিচালক বলে কারু নাম প্রচারের রেওয়াজ ছিল না। বড়-অভিনেতৃরা মিলে-মিশে কাজ করতেন। কিন্তু কারু-কারু ঝোঁক থাকত নূতনকে স্থান দেবার। অহীন্দ্রর ছিল। কিন্তু তিনি কোনদিনই এগ্রেসিভ ছিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে অহীন্দ্র আর্ট থিয়েটারে প্রবোধ গুহ মহাশয়ের প্রীতি পেয়েছিলেন। গলা বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে অহীন্দ্রর যেমন কুণ্ঠা ছিল, প্রবোধচন্দ্রের তেমন ছিল স্বভাব। তিনি একেবারে বিপরীত প্রকৃতির লোক।

মাথায় একবার একটা আইডিয়া কিছু ঢুকলেই হোলো! সে আইডিয়াকে তিনি বাস্তবে পরিণত করতে উঠে-পড়ে লেগে যাবেন, এবং আশ্চর্যজনক অল্প সময়ে সেই আইডিয়াকে একটা রূপ দেবেন—তা স্বরূপ হোলো, কি বিরূপ হোলো, সুরূপ হোলো, কি কুরূপ হোলো, তা ধৈর্য ধরে তিনি দেখবেন না। তিনি যা করবেন, তা বিরূপ বা কুরূপ হবে, এমন সন্দেহ কখনো তাঁর মনে ছায়াপাত করত না—আর করলেও কাক-কোকিলকেও তিনি তা জানতে দিতেন না। এই প্রবোধচন্দ্রকে দিয়ে অহীন্দ্র আর্ট থিয়েটারে অনেক নূতনত্ব আমদানি করেন নাটকে, দৃশ্যপটে, পোশাক-পরিচ্ছদে, নাচে-গানে।

আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের যত নাটক অভিনীত হয়েছে, নাট্যাচার্যের নাট্যমন্দিরেও তত নাটকই অভিনীত হয়েছে। নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছে বিসর্জন, শেষরক্ষা, আর তপতী। আর আর্ট থিয়েটারে হয়েছে চিরকুমার সভা, শোধবোধ, গৃহ-প্রবেশ। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে নাট্যাচার্য যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্র-নাটকে সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে তিনি আর্ট থিয়েটারের অভিনয়কে ম্লান করে দিতে পারেন নি। আর্ট থিয়েটারের তিনখানি রবীন্দ্র-নাটকেরই অভিনয় নিরুপম হয়েছিল। আবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও নাট্যাচার্যই তাদের অভিনয়কে অনুপম করে তোলেন। পল্লী-সমাজ ষ্টারে যা অভিনীত হয়, রমা রূপ নিয়ে নাট্যমন্দিরে তার তুলনায় অনেক ভালো অভিনীত হয়। ষোড়শীর অভিনয় খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও বোধ করি কুড়ি-পঁচিশটি অভিনয়ের পর তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা জুড়ে দিয়ে চালাতে হয়। আর্ট থিয়েটারেই সর্বপ্রথমে একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয় মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'। মন্মথ রায় আর্ট থিয়েটার অবলম্বন করেই নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা করে নেন। আমি আর্ট থিয়েটারের সংশ্রবে গিয়ে পড়ি সাংবাদিক হিসেবে, প্রবোধচন্দ্র যখন নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সান্ধ্য-দৈনিক বৈকালী পরিচালনার ভার নেন। আমি ছিলাম সেই কাগজের কার্যকরী সম্পাদক। ওই আর্ট থিয়েটারের গ্রীণ-রুমে বসেই অহীন্দ্র আমাকে বলেন নূতন ধরনের নাটক লেখায় মন দিতে। তখন আমি নাটক লেখার কল্পনাও করিনি।

আর্ট থিয়েটারের আর নাট্যমন্দিরের প্রতি অভিনয়ই আমি নিয়মিত ভাবে তিন বছর ধরে দেখি। তার আগে, অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে, আমি মাত্র দুটি নাটকের অভিনয় দেখেছি। কিন্তু সিনেমার আবির্ভাব যখন হয়েছে, তখন থেকে সিনেমাই অবিরাম দেখেছি। তখন কোলকাতায় একটিও সিনেমা-গৃহ ছিল না। মদন কোম্পানি ময়দানে তাঁবু খাঁটিয়ে সিনেমা দেখাতেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের নামকরা উপন্যাসগুলি তখন দেখানো হোতো খণ্ডে খণ্ডে ধারাবাহিকরূপে। তাই ছিল আকর্ষণ। তারপর এম্পায়ার থিয়েটারে ( এখনকার রক্সী ) সিনেমা দেখানো হোতো। ক্রমে তৈরি হোলো এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস ( এখনকার মিনার্ভা সিনেমা ) মদন থিয়েটার প্যালেস অব ভ্যারাইটিজ ( এখনকার এলিট ) গ্লোব থিয়েটারও সিনেমা দেখানো শুরু করল। থিয়েটার দেখার নেশা যত জমে উঠতে লাগল, সিনেমা দেখার নেশা ততই কমে যেত লাগল, এবং থিয়েটার দেখতে দেখতে ক্রমে মনে হোলো নাটক লেখবার চেষ্টা করা যাক। তখন কিন্তু বাংলা নাটক বিশেষ কিছু পড়িনি, পড়েছিলাম কিছু ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদ, আর ইংরেজি নাটক। কাজেই অহীন্দ্র নূতন ধরনের নাটক লিখতে বলায় যে নাটক লিখলাম, তা নতুন হোলো, কিন্তু ইউরোপীয়ও হোলো না, ভারতীয়ও হোলো না। সে-নাটক অহীন্দ্র অভিনয় করেন নি, করেছেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে। সে থিয়েটারটি তখন অরোরা ফিলম্স-এর মালিক অনাদি বসু পরিচালনা করছিলেন। নাটকখানি সাপ্তাহিকের পাতা থেকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রমোহন রায় অনাদিবাবুকে দেখান। তিনি ওখানি অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাত্র পাঁচটি দৃশ্যের নাটক, পাঁচটিই সেট। তারপর আবার একই সঙ্গে তিনটি ঘরে অভিনয় চলছে। কি করে অভিনয় করা যাবে ? রিভলভিং ষ্টেজ তখন ছিল না, ওয়াগন ষ্টেজও কল্পনায় আসেনি। কর্ণার্জুনের দীর্ঘ-বিরতির কথা স্মরণ করে প্রতি দৃশ্যের পর যবনিকা ফেলা আমার কাছে ভীতির বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঠিক করলাম প্রতি দৃশ্য অভিনীত হবার পর পরবর্তী দৃশ্যের মুড্ নিয়ে একটি গান দিলে সেট্ সাজাবার সময় পাওয়া যায়।

সে-গান নাটকের কোন চরিত্র গাইবে না, গাইবে একটি কল্পিত নারী, নিয়তিরই মতো, অথচ নিয়তি নয়। তার কাজ হবে অনেকটা সূত্রধরের মতো। নাটকের ইউনিটি ওই করে বজায় রাখা যাবে, এবং একটানা সওয়া দুইঘণ্টা অভিনয় করে নাটক শেষ করা যাবে। নজরুলকে বললাম গান বেঁধে দিতে হবে। নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখানা গান লিখে দিলেন ; চারখানা গাইবে প্রতি-দৃশ্যের শেষে কল্পিত চরিত্রটি, আর তিনখানা গাইবে নাটকের দুটি চরিত্রে। নজরুল নিয়ে এলেন সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালাকে, কল্পিত চরিত্রটির গান গাইবার জন্য। ইন্দুবালার সেই চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল। রক্তকমলে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, গণেশ গোস্বামী, শেফালিকা, সরযূবালা। নাটকে অতিরিক্ত আর একটি পরিচারিকা ছিল। শেফালিকা দু'খানি, আর সরযূবালা একখানি গান গাইতেন। রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুল-গীতিই খুবই জনপ্রিয় হয়। নূতন দর্শকরা একটা নূতন কিছু পেয়ে খুসিই হলেন, কিন্তু পুরাতন দর্শকরা গান পেয়েও তেমন খুসি হলেন না। তাঁদের দুটি আপত্তি ; প্রথমত বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়ত সওয়া দুইঘণ্টার বই। বিষয়বস্তুতে পতিতার মানবতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বার্ণার্ড শ' যে-ভাবে মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রোফেশন লিখে সমাজ-ব্যবস্থার গলদ দেখিয়েছিলেন, সে-ভাব নিয়ে ও-নাটক আমি লিখিনি। পুরুষের বেলা লীলা-খেলা পাপ লিখেছ নারীর বেলা, এই রকম একটা প্রতিবাদ নিয়ে নাটকখানা লিখেছিলাম কাব্য করে, এবং কাব্য করেই মানবতার কথা বড় করে তুলেছিলাম। তার আগে আমাদের দেশের অনেক নাটকে উপন্যাসে পতিতা এসে গেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডালিম একটি দৃষ্টান্ত। তখনকার দিনে কোলকাতায় পথ চলতেও ওদের পাশ দিয়ে ছাড়া চলা যেত না, ওদের সংস্রবও বিরল ছিল না। আপত্তির দ্বিতীয় কারণ নাটকের আয়তন। মাত্র সওয়া দুইঘণ্টার নাটক তখনকার দর্শকদেরকে পরিতৃপ্ত করত না। পাঁচঘণ্টা না হলে আবার নাটক কি ? মাত্র কয়েকটি রাত একক অভিনীত হবার পর ওর সঙ্গে আর একখানি নাটক জুড়ে দেবার কথা হোলো। কিন্তু তাতেও বিপত্তি ঘটল এই যে, দানীবাবু তখন ওই থিয়েটারে কাজ করছেন। রক্তকমলে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। নাটক জুড়ে দিলেও দানীবাবুকে দ্বিতীয় নাটকে

নামতে বলা যায় না। তাই রক্তকমলকেই নেজুড় করা হোলো। যাঁদে নূতন ধরনের নাটক দেখবার আগ্রহ জন্মেছিল, তাঁরা তাই দেখবার আগে একখানা পূর্ণাঙ্গ পুরাতন নাটক দেখবার দুর্ভোগ ভুগতে রাজী ছিলেন না। বন্ধ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় একদিন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীকে নিয়ে গিয়েছিলেন নূতন ধরনের নাটক দেখাতে। আমি সেদিন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলাম। মহারাজা বললেন—"মশাই, আপনার রক্তকমলের সুখ্যাতি শুনে দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু এমন অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ভয়ে দর্শকরা আপনার নাটক দেখতে আসবে না।" এলোও না। রক্তকমল শুকিয়েই গেল। হয়ত অমনিও যেত। কিন্তু তারও পরখ হোলো না। মন্মথর একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' ওই একই কারণে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত কাহিনী বলবার জন্য উপরের ওই ঘটনাটিকে সবিস্তার লিখলাম না। লিখলাম এই কথাই বোঝাতে যে, নূতন ধরনের নাটক লেখা হলেও যে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেই, তা জোর করে বলা যায় না। সকল দেশেই এককালে নূতন লেখকদের এই অসুবিধায় পড়তে হোতো। অবশ্য চিরাচরিত ধারা মেনে চললে কিছুটা সমর্থন পাওয়া সম্ভাবনার মাঝে থাকে। এই কথাটি বুঝতে পেরে আমি আমার প্রতি-তিনখানি নাটকের মাঝে দুইখানি লিখেছি চল্‌তি-ধারা মোটামুটি বজায় করে রেখে, আর একখানি লিখেছি নিজের রুচি অনুসারে। ভাগ্যক্রমে আমার কয়েকখানি নাটক মালিকদেরকে পয়সা দিয়েছিল বলে মালিকরা আমাকে মাঝে-মাঝে এক্সপেরিমেণ্ট করবার সুযোগ দিতেন। সকলে সে-সুযোগও পান না।

( ১৭ )

## নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের পরবর্তীকাল

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, নাট্যাচার্যের প্রভাব, আর্ট থিয়েটারের প্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বহু নূতন নাট্যকার, নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাটককে, নাট্যশালাকে, নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করেছিলেন। নাট্যমন্দির আর আর্ট থিয়েটার লিকুইডেশনে যাবার পর ওই দুই থিয়েটারের শিল্পীরা নব-প্রতিষ্ঠিত নানা থিয়েটারে ছড়িয়ে পড়েন, নাট্যকাররাও নানা থিয়েটারে নাটক দেওয়া শুরু করেন।

সেই সময় থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা নাটকের এবং বাঙালী অভিনেতৃদের অভিনয় রীতির এবং প্রয়োগ-ব্যবস্থারও স্মরণীয় পরিবর্তন হয়। প্রযোজনাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়, তাতে সতুসেনের দান সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এই দ্বাদশ বছরের স্মরণীয় বিষয়গুলি এই :—

(১) নাটক সংক্ষিপ্ত হয়; ছয় ঘণ্টার স্থানে তিন ঘণ্টা, এবং তারও কম। 'মুক্তির ডাক' আর 'রক্তকমলের' কথা আগেই বলিছি। 'ঝড়ের রাতে', 'দশের দাবী'ও এক অঙ্কের, এবং তিন ঘণ্টার নাটক ছিল। কিন্তু ওই রীতি তখন স্বীকৃতি পায়নি; বড় নাটকই অভিনীত হোতো। উপেন্দ্র-কুমার মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারে কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় সর্বপ্রথমে তিন ঘণ্টাব্যাপী নাটকের অভিনয় রীতি হিসেবে চালু করেন। তাঁর থিয়েটারেই সর্বপ্রথমে শনিবারে ও রবিবারে দু'বার অভিনয় শুরু হয়, এবং সপ্তাহের প্রতিদিন সেই নাটকেরই অভিনয় হতে থাকে। প্রবেশ-মূল্যও সিনেমার প্রবেশমূল্যের মানে আনা হয়। আজ কোন থিয়েটারে ছুটির দিন ছাড়া, সপ্তাহে তিন দিনের বেশি অভিনয় হয় না। নাটক অবশ্য তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করতে হয়; প্রত্যহ একই নাটক অভিনীত হয়। মিনার্ভার পরে রঙমহলে স্বামী-স্ত্রী নাটক রবিবারে দু'বার অভিনয়ের রীতি স্থাপন করে। ও-নাটকের অভিনয়ের সময় লাগত

কিঞ্চিদধিক আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু শনিবার ও রবিবারেই কেবল অভিনীত হোতো। বুধবার আর বৃহস্পতিবার অন্য নাটক।

(২) তিন ঘণ্টায় নাটকের অভিনয় সীমাবদ্ধ রাখায় নাট্যকারদের সংযমী হতে হোলো। অল্প সময়ে বলবার সব কথা প্রকাশ করবার জন্য ভাষাকে নানা ভাবে উন্নত করতে হোলো; সংলাপকে ছোট করতে হোলো, ব্যঞ্জনাত্মক করতে হোলো। অভিনয়ও আঙ্গিক ও মানসিক অভিব্যক্তির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিল।

(৩) ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নাট্যকাররা অযথা 'রাজপথ', 'বনপথ', 'অলিন্দ' প্রভৃতি ফ্লাট-ড্রপে অভিনয়োপযোগী দৃশ্য লিখবার দায় থেকে মুক্তি পেলেন। অকারণ গানও নাটকে আর দিতে হোতো না। পর-পর সেট সিন ব্যবহার করা চলত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'প্রেমালাপ' বা 'মন্ত্রণা' করবার অশোভন ব্যাপার লিখতেও হোতো না, অভিনয়ও করতে হোতো না। তটিনীর বিচার থেকে শুরু করে পর পর সংগ্রাম ও শান্তি, পথের দাবী, বিশবছর আগে, নার্সিং হোম, প্লাবন, কঙ্কাবতীর ঘাট প্রভৃতি নাটকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে পুরোপুরি ব্যবহার করা হোলো। হালে ষ্টার থিয়েটার শ্রীকান্ত নাটকে যুগপৎ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও ওয়াগন ষ্টেজ কাজে লাগাচ্ছেন বলে শুনেছি। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ একটি দোষও আমদানি করেছে। হালের উপন্যাসের নাট্যরূপে তা ধরা পড়ছে। নাট্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে উপন্যাসের গল্পটিকেই দেখানো। নাটক কিন্তু তার অতিরিক্ত আরো কিছু।

(৪) সতু সেন শুধু ঘূর্ণায়মান মঞ্চেরই আমদানি করলেন না, সামাজিক সেটিংস-এ বাস্তবতাও এনে দিলেন, এবং মুড্-লাইট নাটককে কতকটা রস-ঘন করে, তাও বুঝিয়ে দিলেন। অবশ্য তাঁর আবির্ভাবের আগে মুড্-লাইটের কথা যে ভাবাই হোতো না, অথবা হাই-লাইট ব্যবহার করা হোতো না, কি আলো-ছায়ার মোহ-সৃষ্টিকে একেবারে অবহেলা করা হোতো, তা বলা মিথ্যাই বলা হবে। নাট্যাচার্য 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে যে মুড্-লাইট ব্যবহার করতেন, তা আজও আমার

মনে ছবির মতো ছাপা রয়েছে। দিগ্বিজয়ীতে আলোর যে সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা গিয়েছে, তাও উপেক্ষা করবার মতো নয়। আর্ট থিয়েটার ইরাণের রাণীতে আলোকে ফলপ্রদ করেছিলেন। তবে এ-কথা সত্য যে, সমগ্রভাবে অভিনয়ের অঙ্গ-হিসেবে আলোর ব্যবহার অভিনয়কে এবং নাটককে কত বেশি মর্ম-স্পর্শী করে, সতু সেন তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'ঝড়ের রাতে' আর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' তার দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, 'কামাল আতাতুর্কও' তাই। সতু সেনের কৃতিত্ব আরো স্বীকার করতে হয় এই কারণে যে, আলো কি করতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের একান্ত অভাব সত্ত্বেও। মধুর অভাব তাঁকে পূর্ণ করতে হয়েছিল গুড় দিয়ে। কোন মঞ্চ-মালিক তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর সকল সরঞ্জাম তাঁকে এনে দেননি। নিজে কারিগরি করে তিনি কিছু কিছু তৈরি করে নিয়েছিলেন, এবং তাই দিয়েই মাঝে-মাঝে মায়ালোক সৃষ্টি করে দর্শকদেরকে বিস্মিত করেছিলেন।

(৫) বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বাংলা নাটক সব সময়ে কেবলই যে যুগের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে এসেছে তা নয়, অনাগতের আভাসও দিয়েছে, এবং সব সময়েই মানবতার জয়-গানই গেয়েছে। অপর দেশে নাটকের অধঃপতনের যুগে যে-সব তুচ্ছ বিষয়বস্তু নাটকে বড় স্থান পেয়েছে, আমাদের দেশের নাটকে কোন সময়েই তা দেখা যায়নি।

(৬) সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আমদানি করলেন, কিন্তু 'মহানিশা' প্রভৃতি নাটকে তা ব্যবহার করলেন শুধু দৃশ্য পরিবর্তনের সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে। তাঁর এবং নরেশ মিত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় তখনকার রঙ-মহল যত নাটক পরিবেশন করেছেন, তাতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে ওর অতিরিক্ত কোন কাজে লাগান হয়নি। প্রবোধচন্দ্র গুহ আমার 'জননী' নাটক, নাট্যনিকেতনে অভিনয় করাবার সময়, 'ওয়াগণ ষ্টেজ' তৈরি করালেন। কিন্তু তা ত্রুটি-বহুল হবার জন্য নানা বিপত্তি ঘটালো। নাটক যদি জমে যেত, তাহলে ত্রুটি তখন-তখনই সংশোধিত

হোতো। কিন্তু নাটকই জমল না। কাজেই পয়সার অভাবে ত্রুটিও সংশোধন করা গেল না। কিন্তু অনুরূপা দেবীর 'মা' অভিনীত হয় ওয়াগণ ষ্টেজকে সংশোধিত করে। তখন আর কোন বিপত্তি ঘটেনি। নাটকও জমে গিয়েছিল। 'জননী' ছিল এক কুমারী-জননীর জীবন-সংগ্রাম। 'মা' এক বিপত্নীক স্বামীর জীবন-সংগ্রাম, যাতে শান্তি এনে দিল সন্তান-বঞ্চিতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর সপত্নী-পুত্রকে আপন পুত্র করে নেওয়ায়। দর্শকরা 'জননী'কে সমাজ-বিরোধী, আর 'মা'কে সমাজরক্ষী বলে মনে করে 'জননী'কে প্রত্যাখ্যান করলেন, আর 'মা'কে জানালেন অভিনন্দন। আজ আইনত এক পুরুষ দুই বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু আজও সপত্নীর মহত্ত্ব প্রকাশ করে সাহিত্য রচিত হয়, ওর নিন্দা করেও রচিত হয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে যা মনকে আঘাত দেয় না, নাটকে তা দেয়। সপত্নী-সঙ্কট নিয়ে আমিও একখানা নাটক রচনা করেছিলাম, 'কালের দাবী'। নাটকখানি চার অঙ্কের, প্রতিটি অঙ্কে একটি দৃশ্য। সে নাটকখানিও চলেনি। কেন না কোন স্ত্রীই স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে না। দুই স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে, এবং প্রতি স্ত্রী আত্মত্যাগ করে অপরকে সুখী করতে চায়; একজন সন্ন্যাস নেয়, একজন করে আত্মহত্যা। ওটা দর্শকদের ভালো লাগে না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের পরে নাটক সত্যি সত্যিই সব বিষয়ে সবার চেয়ে দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। মৌলিক নাটক রচিত হয়েছে, এবং জন-সংস্রবও রক্ষা করে চলেছে। নাটকের আঙ্গিকেরও নানা পরিবর্তন ঘটেছে।

## ( ১৮ )

# যুগান্তরের সূচনা

বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই কংগ্রেস যে-আন্দোলন শুরু করে, তার লক্ষ্য হোলো ইংরেজের যুদ্ধায়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ। ও যুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়নি, ভারতবর্ষকে তার বিজয়ীরা ওর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। আন্দোলনটা কেবলই প্রতিবাদমূলক রইল না, ইংরেজের ভারত-ত্যাগের দাবী এবং ইংরেজকে বহিষ্কৃত করবার ব্যাপক সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বিরোধিতাও সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠল। কংগ্রেস-নায়করা এবং প্রকাশ্য-কর্মীরা কারারুদ্ধ হলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনি ঘোষিত হোলো। মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে নেহি মরেঙ্গে' সঙ্কল্প জাতির সকল স্তরের মানুষকে শেষ-প্রয়াসের জন্য উতলা করে তুলল। আন্দোলন হিংসা-অহিংসার বিচারকে তখন তুচ্ছ বিষয় মনে করে 'মন্ত্রের সাধন বা শরীর পাতনের' সঙ্কল্প এনে দিল। ইংরেজ-শাসকরা সেই জন-আন্দোলন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ব্যর্থ করে দেবার জন্য রুদ্র-নীতি অবলম্বন করলেন। তারই দিকে লক্ষ্য রেখে স্বেচ্ছায় ঘটিয়ে তোলা হোলো একটা দারুণ দুর্ভিক্ষ, যার ফলে ত্রিশ লক্ষ নর-নারী খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে মরে গেল। সেই দুর্ভিক্ষ বাংলার নবীন-শিল্পীদের চিত্তে এনে দিল দীন দরিদ্র লাঞ্ছিত জনগণের প্রতি মমত্ববোধ। শিল্প নব-প্রকাশের মাধ্যম সন্ধান করতে লাগল।

যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যেমন আন্দোলন ব্যাপক করে তুলল, তেমন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিও একটা আন্দোলন দ্বারা জনমতকে জাগ্রত করতে চাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান যোগ দিয়েছিল নাৎসী-ফাসী পক্ষে, অর্থাৎ, ইংরেজ-ফরাসী-রুশ-আমেরিকার বিপক্ষে। আন্তর্জাতিক কমিউনিজম্-এর নীতি অনুসারে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের সহায়তা সধর্ম বলে

মনে করলেন, এবং শ্লোগান দিলেন জাপানকে রুখতে হবে। ফাসিষ্ট-জাপানের ভারত আক্রমণ ব্যর্থ করবার সঙ্কল্প ভারতীয় স্বাদেশিকতার বিরোধী নয়। কিন্তু তখন সে-কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যুদ্ধের সহায়তা করা, এবং ইংরেজেরই সহায়তা করা। ইংরেজের পরিবর্তে ফাসিষ্ট জাপান এসে ভারতে জেঁকে বসলে ভারতের কত ক্ষতি হবে, সে-কথা ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করছিলেন, তাঁরা ভাবেননি; যদিচ জওহরলাল নেহরুও বলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রও যদি জাপানকে প্রতিষ্ঠা দেন, তিনি তাঁরও বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। নেতাজীর সঙ্গে জাপানী অভিযানের কী সম্বন্ধ ছিল, তখন দেশের সাধারণ লোকের তা জানা ছিল না,—আদৌ কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাও কেউ জানত না; জানত কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিল যে ইংরেজরা তারাই, আর তাদের সঙ্গে যে দু'চারজন ভারতবাসী এসেছিল তারা। কাজেই জাপানকে রোখা যে নেতাজীর বিরোধিতা করা, জাতীয় মুক্তির বিরোধিতা করা, অথবা ইংরেজের প্রভুত্ব কায়েম রাখবার সহায়তা করা—এ-কথা মনে করবার কোন কারণ ছিল না। তখনকার দিনে কেউ তা করেনও নি। কিন্তু জাপানকে রুখতে বলা যে, যুদ্ধে ইংরেজের আয়োজনকে সমর্থন করার সামিল, এমন একটা সন্দেহ কমিউনিষ্ট-বিরোধীরা যেমন করেই হোক জাগিয়ে তুলেছিলেন। তা সত্ত্বেও বহু নবীন কর্মী যেমন আন্দোলনকে অহিংস রাখবার শুচিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন, তেমন জাপানকে রোখা আর ইংরেজ রাজচক্রবর্তীত্ব ধ্বংস করা সমান কথা বলে মানবার যুক্তিও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন ফাসিজম রোখা, আর সাম্রাজ্যবাদ রোখা, সম্ভব হয় একই জন-শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে। তাঁরা তাই জনসংস্রব স্থাপন করা, জন-মনকে তৈরি করা, মুক্তি-আন্দোলনের বড় কাজ বলে মনে করলেন। তাঁরা যুদ্ধের শুরু থেকেই নাচ গান ও অভিনয়কে জন-চেতনা জাগ্রত করবার কাজে নিয়োগ করতে লাগলেন। তাঁরাই লোক-নৃত্যকে, লোক-সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন, যা তাঁদের পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা ছাড়া, আর কোন শিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান করেন নি। তাঁরাই সর্বপ্রথমে মনে করলেন নাটকে কেবল জনজীবনের প্রতিফলনই করতে হবে না, রচনায় ও প্রযোজনায় তার

এমন রূপ দিতে হবে, যা জন-মনে বাস্তব-জীবনের সঙ্কট ও সম্ভাবনা প্রকট করতে পারে।

বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ ঘটনা তাঁদেরকে আত্মপ্রকাশের পথের নির্দেশ দিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' হোলো বাংলা নাটকের এক নূতন প্রকাশ। রচনাতেই শুধু নূতনত্ব প্রকাশ পেল না, অভিনয়ে ও প্রযোজনাতেও প্রকাশ পেল নানা অভিনবত্ব। ওর দুর্বলতার, ওর ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা তুচ্ছ। বড় কথা এই যে, বাংলার সাধারণ নাট্যশালায় ওর আগে জনচিত্তের ক্ষোভকে, জন-বঞ্চনাকে ওভাবে রূপায়িত করা হয় নি ; নীলদর্পণেও নয়।

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বঙ্কিম বন্দেমাতরম মন্ত্র আনন্দমঠে স্থান দিয়েছিলেন এবং আনন্দমঠকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষকে রবীন্দ্রনাথ কবিতায়, নাটকে, মানুষের অসহায়তার চিত্র রূপে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যে নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে, সে কথা সাধারণ নাটক রচয়িতারা আর সমালোচকরা পরিহাসযোগ্য মনে করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' নামক ক্ষুদ্র অথচ অমূল্য ইতিহাসে এই পরিহাসের একটি নমুনা রহস্য-সন্দর্ভ থেকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তা এই :—

"দুর্ভিক্ষ-দমন নাটক। [ যদুনাথ তর্করত্ন প্রণীত ] নগরে নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিস্সৃত 'গোলাপকান্ত' 'নলিনীকান্ত', 'কামিনী-বিলাস', 'দূতীবিলাস' প্রভৃতি কাব্যকরকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলাবৃষ্টিতে প্রায় সেইরূপ আপদ উপস্থিত হইয়াছে। এমন লোকও বর্তমান হইয়াছে যাহারা দুর্ভিক্ষকেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে। বোধ হয় ইহার পর জ্বর-বিকার ওলাউঠা প্রভৃতির নাটকও অসম্ভব হইবে না।"

রহস্যসন্দর্ভের ওই লেখক বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন নাটকে যে বিষয়ের অনুপ্রবেশ তিনি হাস্যকর মনে করেছিলেন, পৃথিবীর নানা জাতি সে বিষয়কেও নাটকের বিষয় নির্বাচন করা অন্যায় বা অশোভন মনে করেন নি।

সে যাই হোক, নবান্ন নাটক ও তার অভিনয় যে অভিনন্দন লাভ করেছিল, তা থেকে বোঝা যায় শহরের শিক্ষিতদের মনে এ-কথা জেগেছিল যে, নাটকে জন-জীবন প্রতিফলিত করা প্রয়োজন হয়েছে। ওর সাফল্য নূতন দৃষ্টি খুলে দিল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা পেয়ে সারা ভারতে নব-নাট্য আন্দোলনের বান বহিয়ে দিল। মনে রাখবার মতো কথা এই যে, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বাংলাকে সাহায্য করবার জন্য সারা ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পীরা কেবল যে তাঁদের শিল্পকে পণ্য করে অর্থই সংগ্রহ করতে লাগলেন, তা নয়—সঙ্গীত নৃত্য নাটককে নূতন খাতে বহিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসও শুরু করে দিলেন। এ বিষয়ে কোন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা, বিরাগ, বিদ্বেষ, কোন বিভেদ সৃষ্টি করল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, সবগুলি প্রদেশ, ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সঙ্গীত-নৃত্য-নাটকে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের পরিচয় রয়েছে, তাই উপলব্ধি করল। সারা ভারতে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হোলো, এবং প্রাদেশিক সংস্থাগুলিকে অটোনমি দিয়েও কেন্দ্রীয় সঙ্ঘকে প্রতিনিধিমূলক করা সম্ভব হোলো। এই বিরাট অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান প্রাণ পেয়েছিল বাংলার দুর্ভিক্ষের অমানিশায়, পরবশতার অন্ধকারে। এমনই সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখকদের নিয়ে সঙ্ঘ গঠিত হোলো সর্বপ্রকার ফাসিজম-এর বিরোধিতা করবার জন্য। এই দুইটি বিস্ময়কর কাজ সম্ভবপর হয়েছিল ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রেরণায়—যদিচ প্রতিষ্ঠান দুটির কোনটিই কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা ছিল না, এবং কোনটিরই সদস্যপদ অ-কমিউনিষ্টদের অনধিগম্য ছিল না। বর্তমানে আমি পাঁচ-বছরকাল গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের কাজ করচি এবং পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতিত্ব করছি। আমি নিশ্চিত করে জানি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান কোন রাজনীতিক দল থেকে অর্থ সাহায্য পান না, প্রত্যাশাও করেন না। কখনো কোন প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ জমা থাকে না। প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় অভিনয়াদি করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। বেশির ভাগ সময় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণগ্রস্ত থাকতে হয়। আর্থিক অবস্থা যা-ই হোক্, কর্মীদের নিষ্ঠা এক সময়ে

ছিল তনু-মন নিবেদিত। তাঁরা যে শ্রম করে লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, পরিবেশন করেছেন, জন-চিত্তকে বোঝবার জন্য যে-ভাবে পল্লী-পরিক্রমা করেছেন, নাটক যে-ভাবে প্রস্তুত করেছেন, লোক-নৃত্য যে-ভাবে আয়ত্ত করেছেন, তা অনেকের ধারণারও অতীত। কি কষ্ট যে তাঁরা করেছেন, তা তাঁদের স্বাস্থ্যহানির খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন।

তাঁরা যদি পেশাদারি নাট্যশালায় আসতে পারতেন, যেমন শিশিরকুমার এসেছিলেন, তা হলে যে তাজা-রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল, নাট্যশালা তা অবশ্যই পেত। কিন্তু তাঁরা আসতে পারলেন না। নাট্যশালা তাঁদেরকে আহ্বান করে আনতে সাহস পেল না। কারণ দুটি। একটি কারণ তাঁদের রাজনীতি, আর দ্বিতীয় কারণ তাঁদের নাট্যনীতি। দুটিকেই নাট্যশালা পরিহার করে চলতে চাইল।

আজ যখন রাজনীতি মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার আয়ত্ত করে নিয়েছে, তখন নাটক আর নাট্যশালা তা বর্জন করে চলতে চাইলে পিছনেই পড়ে থাকবে। আজকার রাজনীতি রাজার নীতি নয়, রাষ্ট্রের নীতি। আর রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে মানবতার বিকাশ, মানুষের প্রতিষ্ঠা, এবং সমগ্র মানুষের উন্নয়ন। নাটকেরও কাজ তাই। সাহিত্যেরই কাজ তাই। সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরই তাই কাজ। আমাদের রাষ্ট্র হোলো ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র। আমাদের সংবিধান প্রতি মানুষের স্বাধীন চিন্তা করবার, স্বাধীন মত প্রকাশ করবার স্বাধিকার স্বীকার করে নিল, স্বীকার করে নিল নানা রাজনীতিক দলের স্বাধীন অস্তিত্ব, স্বীকার করে নিল শাসন-ক্ষমতা আয়ত্ত করবার জন্য দলে দলে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার অধিকার।

কিন্তু শাসন করবার ক্ষমতা যাঁরা পেলেন, ক্ষমতা তাঁরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবেন কেন? তাঁরা চাইলেন ক্ষমতা যাঁরা কেড়ে নেবার কথা বলবে, তাঁদেরকে লোকচক্ষে হেয় করতে, অথবা কথা বলবার যায়গার অভাব ঘটিয়ে দিতে। আবার ক্ষমতা যাঁরা কেড়ে নেবার কল্পনা পোষণ করলেন, তাঁরাও চাইলেন ক্ষমতা যাঁদের আয়ত্তে আছে, তাঁদেরকে লোকচক্ষে হেয় করতে, নাটক-নৃত্য-সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকদেরকে বোঝাতে যে শাসন-ক্ষমতা যাঁদের

হাতে আছে, তাঁরা যোগ্য নন। বলা বাহুল্য ডেমোক্রেশী, জন্মলাভ করেই, ঠিক করে নিতে পারে না রাজনীতিক ক্ষমতা আয়ত্তে পাবার জন্য ক্ষমতা-প্রাপ্ত দলের বিরোধিতা কোথায় কোথায় কতখানি করতে হবে, কোথায় কোথায় করতে হবে না। আবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলও বুঝতে পারে না, তারা কেমন করে স্বাধিকারপ্রমত্তঃ হয়ে ডেমোক্রেশীকে ব্যুরোক্রেশীতে রূপান্তরিত করে।

স্বাধীনতা পাবার পর ক্ষমতা-প্রাপ্ত দল এবং ক্ষমতা কেড়ে নিতে চান যাঁরা, তাঁরাও সর্ব বিষয়ই বিপরীত দৃষ্টি-কোণ থেকে জাতির প্রয়োজনকে দেখতে লাগলেন, মায় জাতীয় সংস্কৃতিকে পর্যন্ত। অবশ্য সংস্কৃতিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় জাতি গড়বার কাজে যার উপর সবচেয়ে জোর দিতে হয়। কেন না ওই সংস্কৃতির উপরই নির্ভর করে জাতির প্রতি মানুষের ব্যক্তিগত এবং সকল মানুষের সমষ্টিগত মানসিক গঠন। মানুষের মন যদি না সুস্থ হয়, সবল হয়, স্বার্থ-পরার্থের সমন্বয়ে সক্ষম হয়, তাহলে স্বাধীনতা সত্ত্বেও জাতি শীর্ণ সঙ্কুচিত প্রগতিবিমুখ হতে পারে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতি তাই জাতির কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার আগে থেকেই গণজীবন গঠন যাঁরা প্রয়োজন বলে জেনে-বুঝে ভারত-ব্যাপী কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, যাঁরা বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে যে মোহ বিস্তার করে এসেছে, তা সংস্কৃতির আলো ঢেলে অপসারিত করতে হবে, তাঁরা সোস্যালিজকে নব-সংস্কৃতি বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নেবার কারণ, ইমপিরীয়ালিজম আর ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম মানুষের সংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তার অকল্যাণকর প্রভাব যেমন প্রকট হয়েছিল, তেমন সোবিয়েৎ রাশিয়ার এবং কয়েকটি পিপল্‌স্ ডেমোক্রেশীর প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, সোস্যালিজমকে মানব-সংস্কৃতির বিষয় করে নিলে মানুষের কল্যাণ হয়। নব-সংস্কৃতির প্রচারকরা তাই সোবিয়েৎ রাষ্ট্র এবং পিপল্‌স্ ডেমোক্রেশীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে আগ্রহান্বিত হলেন। ক্ষমতার অধিকারীরা ভাবলেন ওই প্রয়াস নিছক ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিজমকে জোরালো করবার ছলনা। ওই প্রয়াসকে তাঁরা বাঞ্ছনীয়

মনে করলেন না। তাঁরা পারতেন মূলেই ওই প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে, পাস-পোর্ট দিতে অস্বীকার করে। অনেকের পাস-পোর্টের আবেদন তাঁরা অগ্রাহ্যও করলেন। কিন্তু বাইরে যাবার দাবী এত বেশি এবং এমন ঘন-ঘন হতে লাগল যে, সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্যও যেমন, তেমন প্রকৃত অবস্থা অবগত হবার কৌতূহলের জন্যও, ব্যাপকভাবে বাধা তাঁরা দিলেন না ; আন্-অফিসিয়াল সাংস্কৃতিক দলের যাওয়া-আসা অব্যাহত থাকতেই দিলেন।

আমি এই রকম দুইটি দলের নায়কত্ব করবার সুযোগ পেয়েছি। কাজেই আমি বলবার অধিকার রাখি যে, এই-সব দল কেবল কমিউনিষ্ট দলের লোকদেরকে নিয়েই গঠিত হয়নি, এবং এই সব দলে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা বিদেশে কমিউনিজমকে আলোচনার বিষয় করে তোলেন নি ; ভারতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও চাননি। তাঁরা সর্বত্র এই কথাই বলেছেন যে, মানবের ও মানবতার প্রতিষ্ঠার সহায়ক সকল রাষ্ট্রকেই ভারতবর্ষ মিত্র বলে মনে করে। এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোনই কারণ নেই যে, এই সব আন্-অফিসিয়াল দল চীন-রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের মানুষের মন থেকে ভারত সম্বন্ধে অহেতুক অনেক সন্দেহ নিরসন করেছে, যেমন করেছে নিখিল-ভারত শান্তি-সংসদ, ভারত-সোবিয়েৎ মৈত্রী-সঙ্ঘ, ভারত-চীন মৈত্রী-সঙ্ঘ, প্রগতি লেখকসঙ্ঘ, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি। পঞ্চশীল নীতি হিসেবে গৃহীত হবার পিছনে উল্লিখিত দলগুলির প্রয়াস অস্বীকার যাঁরা করেন, তাঁরা কার্য-কারণের সম্বন্ধ মানেন না। কিন্তু তাঁরা না মানলেও দেশের বেশি লোকই তা মানেন, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতেরও অধিকাংশ। চীন-রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জানবার আগ্রহ এ-দেশের লোকের কত প্রবল হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় শহরে পল্লীতে বক্তৃতা করতে আহূত হয়ে আমরা জানবার অনেক সুযোগ পেয়েছি। সে আগ্রহ যে কমিউনিজম-এর প্রতি আগ্রহ তা নয়, মানুষের নবজন্মের বৃত্তান্ত জানবার একান্ত স্বাভাবিক আগ্রহ। সাংস্কৃতিক কর্মীর কাজ হচ্ছে এই আগ্রহকে জাগিয়ে দেওয়া, মানুষের নবজন্মের প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত করে তোলা, বিশ্বমানবের জয়যাত্রাকে সার্থক করে তোলবার প্রেরণা দেওয়া।

( ১৯ )

## আজকার সমস্যা

ডেমোক্রেটিক দেশে প্রত্যেক রাজনীতিক দলই মনে করেন যে, বিশ্ব-মানবের জয়যাত্রার পথ রচনা করে দেবার শক্তি কেবলমাত্র তাঁদেরই আছে। কাজেই প্রতি দলই প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরা ছাড়া আর যারাই যা-কিছু বলেন সবই ক্ষতিকর, কেবল বিশ্বমানবতার পক্ষেই নয়, রাষ্ট্রেরও পক্ষে। এতেও ক্ষতি হয় না যদি সবাইকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়। তাই দেবার অঙ্গীকার ডেমোক্রেশীতে থাকে বলেই ডেমোক্রেশীর মূল্য দেওয়া হয়।

ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র আমাদের দেশে সদ্যজাত হলেও ডেমোক্রেশীর ইতিহাস আমাদের অজানা নেই। আমাদের ঐতিহ্যে ও-বস্তু অনাস্বাদিত নেই। ডেমোক্রেশীও যে মানবের সহস্র বন্ধনের হেতু হতে পারে তা আমরা দেখিছি, এবং ডেমোক্রেশী যে মানুষকে সর্ববন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে তাও আমরা জেনেছি। ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ শাসনই একমাত্র সত্য নয়, বৌদ্ধপ্লাবনও সত্য ; অচ্ছুতই একমাত্র সত্য নয়, চৈতন্য রামানুজ নানক কবীর রামকৃষ্ণও সত্য ; বেদ-ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই কেবল সত্য নয়, বিদ্রোহীকে অবতার করে নেওয়াও সত্য। শুধু ন্যায় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে সংঘাতে-সংঘাতে প্রখর করে তুলে এ-দেশে কতবার কতই না মহাবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্লাবনের পর হাজার বছরেরও উপর নানা মতের কখনো সশস্ত্র, কখনো নিরস্ত্র, সংর্ঘষের ফলে, যে দর্শন-কাব্য-শিল্প বাণিজ্য জন্মলাভ করেছিল, দিকে দিকে বিস্তার লাভ করেছিল, তাই ত ভারতের গৌরব। তার দান প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণের দানের চেয়ে তুচ্ছ নয়। সেই দান ভারতীয় চিন্তাকে, ভারতীয় জীবনকে, অতীতের একদেশদর্শিতার ত্রুটি সংশোধন করে ব্যালান্সড করে দিয়েছিল। জীবনের এই ব্যালান্সড দৃষ্টভঙ্গিই ভারতীয় সংস্কৃতি। এই সমন্বয় তার প্রথম অথবা শেষ সমন্বয় নয়। প্রথম সমন্বয়

হয়েছিল অনার্যদের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতের সময়ে। আর এক সমন্বয় সাধিত হয় ইসলামিক প্রভুত্বকালে। তারও চেয়ে বড় সমন্বয় ঘটে ইংরেজ আমলে। কিন্তু ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে চলে যাবার সময় ভারতকেই শুধু বিভক্ত করে গেল না, ভারতের সংস্কৃতিতে যে সমন্বয় ঘটাবার আবেদন ছিল, তাতেও সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে গেল। সেই সন্দেহ ঘোরালো হয়ে উঠল কংগ্রেস আর কমিউনিষ্ট দলের আদর্শবাদের সংঘাতে। মহাত্মা বলেছিলেন স্বাধীনতা প্রাপ্তি কংগ্রেসকে সার্থকতা দিয়েছে। সুতরাং তার আর রাজনীতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়। হলে, তার কায়েমী-স্বার্থবোধ জাতির প্রগতিকে এক বিশেষ খাতে বইয়ে নিতে চাইবে। তা কল্যাণকর নাও হতে পারে। কংগ্রেস জাতিকে এগিয়ে আনে নি, এমন অবিশ্বাস্য কথা আমি বলি না; সারা মন দিয়ে বলি কংগ্রেস এমনই একটা আশ্চর্য শক্তি সৃষ্টি করেছিল যে, কংগ্রেস যখন নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছিল, তখনো সেই আশ্চর্য শক্তি বিস্ময়কর ভাবে কাজ করেছিল। সেই আশ্চর্যশক্তি অকংগ্রেসীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল কংগ্রেস-বিরোধীদেরকেও।

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেস নায়করা প্রথমেই দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা 'ভায়োলেন্স' অবলম্বন করে ইংরেজকে অতিষ্ঠ করেছিলেন, তাঁদেরকে ভ্রষ্টাচারী বলে ধিক্কার দিলেন; তারপরেই ধিক্কার দিলেন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে তাঁরা 'জাপানকে রুখতে হবে' ধ্বনি তুলেছিলেন বলে। আভ্যন্তরিক বিপ্লবে যে সহায়তা কমিউনিষ্টরা করেছিলেন, তাও চাপা দেওয়া হোলো। তার পরও তাঁরা শ্রেষ্ঠতম ষ্টাণ্ট দিলেন আই-এন-এ ট্রায়ালে গাউন পরে ভায়োলেণ্ট অভিযাত্রীদেরকে সমর্থন করবার জন্য লাল-কেল্লার আদালতে হাজির হয়ে। সে-কাজে এগিয়ে না গেলে দেশের লোক তাঁদেরকে মার্জনা করবে না, এ-কথা মহাত্মাজী সেদিন বুঝিয়েছিলেন, যেমন বুঝেছিলেন জনশক্তির সঙ্গে ওই ভাবে সংযোগ স্থাপন করতে না পারলে শাসন-ক্ষমতা হাতে নেবার দাবিদার হওয়াও হবে হাস্যকর। ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা উঠতেই মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলনের প্রয়াস মহাত্মা এমনই ধুম-ধাড়াক্কা করে জাঁকিয়ে তুল্লেন যে, প্রমাণ করে দিলেন ক্ষমতা পাবার দাবী রয়েছে মাত্র দুটি দলের—কংগ্রেসের

আর মুসলিম লীগের। বাকি যাঁরা বিপ্লবকে দুর্বার করেছিলেন, তাঁদেরকে যুদ্ধোত্তর ভারত থেকে আপোষী-কংগ্রেস একেবারে মুছে দিলেন। তাঁরাও কোন দাবি তুল্লেন না, দলে ভারি ছিলেন না বলে যেমন, তেমন সকলেই তখন সর্বাগ্রে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন বলে।

এই স্বাধীনতা পাবার জন্যই যে দেশ-বিভাগ অপরিহার্য হোলো, তাও মনে করবার :কারণ নেই এইজন্য যে, ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা ছিল না। তাতে ছিল গ্রুপিংয়ের পরিকল্পনা। বাংলা-আসামকে এক গ্রুপ করে সংযুক্ত আসাম-বাংলায় মুসলিম ব্রুট-মেজরিটি হ্রাস করে সাম্প্রদায়িক সমতা আনবার যে চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে আইন-পরিষদে দুই সম্প্রদায়ের পার্থক্য থাকত তিন থেকে পাঁচের মতো। রাজনীতিক আদর্শ এই অনুপাতকে স্থায়ী হতে দিত না কেবিনেট মিশন এমনই আশা করেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আসামকে বল্লেন ওতে সম্মতি দিলে সে মরে যাবে। কংগ্রেস মহাত্মার উপদেশে এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করল। অবশ্য মুসলিম লীগও পরিকল্পনা গ্রহণ করল না। কিন্তু কংগ্রেস যদি গ্রহণ করত, তাহলে ইংরেজই বা কি করে, আর লীগই বা কি করে, তা দেখবার বিষয় হয়ে উঠত। মহাত্মা, শুনতে পাই, দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে, ইংরেজ বাধা হবে কংগ্রেসেরই হাতে ক্ষমতা দিতে। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা পর পর দুটি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করতে ভরসা পেলেন না। তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের উপদেশ গ্রহণ করলেন। ভুল করেছিলেন বলে মনে হয় না। মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনের জন্য জীবন পণ রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরও কামনা ছিল কংগ্রেসই ক্ষমতার অধিকারী হোক। নইলে আসাম মরে যাবে বলে একটা ভয় জাগিয়ে তুলে পেথিক লরেন্সের পরিকল্পনা বর্জন করতে উপদেশ দিতেন না। পেথিক লরেন্স গ্রুপগুলিকে বেশি অটোনমি দিয়েছিলেন। সেও একটা কারণ ছিল, যার জন্যে নায়করা তা বর্জন করলেন। কিন্তু পেথিক লরেন্স ঠিক কাজই করেছিলেন। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর শুভ-কামনা জানিয়ে পেথিক লরেন্স যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের ইতিহাসে

তিনি দেখেছেন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ভারতবর্ষ কোনকালেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে চায়নি। সেই কারণেই তিনি গ্রুপগুলিকে বেশি মাত্রায় আত্ম-কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। যদি ভারত রিপাবলিকে কোনদিন ফাটল ধরে, তার কারণ হবে কেন্দ্রের অতিরিক্ত কর্তৃত্ব। কংগ্রেস-নায়করা সে-কথায় কান দিলেন না। জাতীয় পার্লামেণ্টে বিপুল মেজরিটি পাবেন জেনে তাঁরা দেশ-বিভাগকেও অকল্যাণকর বলে মনে করলেন না।

অপর দলগুলির মাঝে এক কমিউনিষ্ট পার্টিরই সাংগঠনিক শক্তি ছিল বেশি। কাজও তাঁরা করেছিলেন বেশি। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে নীতি তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন, তা তাঁদেরকে যেমন অপ্রিয় করে তুলেছিল, তেমন ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবার সময় এটাও দেখে যেতে চেয়েছিল যে, ভারতবর্ষে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা লাভ না করে। স্বাধীন ভারতে কমিউনিষ্ট দলের যাত্রা শুরু হোলো অবাঞ্ছিত দল হিসেবে, যদিচ ওর উদ্ভব নিশ্চিতই হয়েছিল বর্তমান জগতের ইভলিউশনের স্বাভাবিক নিয়মেই। অবাঞ্ছিত দল রূপে স্বাধীন ভারতে স্থান পাবার জন্য এই দলটি যেমন স্লোগান দিলেন, 'ই আজাদী ঝুটা হ্যায়', তেমন ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিজমকে ন্যাশনাল প্রগ্রেসের চেয়েও বড় বলে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন। কিন্তু এই আজাদী বা এই স্বাধীনতা সত্য নয় মিথ্যা, এমন কথা বলবার হাজারো কারণ থাকলেও পরবশতা থেকে সদ্যমুক্ত একটা জাতিকে তা বোঝানো শক্ত। আর স্বাধীনতা যখন সত্য, তখন তাকে মিথ্যা বলে লোকে মানবেই বা কেন? অভিযোগের অসংখ্য কারণ থাকলেই বা নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে কেন? কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই ত আজও পর্যন্ত আদর্শ স্বাধীনতাকে রূপায়িত করতে পারে নি। তারা ত বলে না তাদের রাজনৈতিক স্বাধীন সত্তা সত্য নয়, মিথ্যা।

স্বাধীনতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য স্বাধীন ভারতের সকল কর্ম-প্রয়াসই তাঁরা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চাইলেন, মায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও। এখানেও তাঁরা ভুল করলেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে, শিল্পীকরণ সম্বন্ধে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে যে নূতন চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, তা প্ল্যানিং এবং ইন্‌ডাষ্ট্রীয়ালাইজেশন প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত দোষ-গুণ নিরপেক্ষ একটা

স্বতন্ত্র রূপও দিয়েছিল। শুধু শব্দগুলিই তখন ওঁকারের মতো হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ যতটা ইণ্টারন্যাশনাল বিরোধ সমাধানে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে লাগল, ততই রাষ্ট্রগুলি জাতিসমূহের কাছে বেশি মনোযোগ পেতে লাগল, আদর্শগত ঐক্যের চেয়েও। ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিজম ক্রমশই গৌণ হয়ে উঠতে লাগল, রাষ্ট্রের গ্রুপিং হয়ে উঠল চিন্তার বিষয়। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি বোঝাতে চাইলেন যে, কমিউনিজম ছাড়াও অপর রাষ্ট্রের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ তারা করতে প্রস্তুত মানবতার ক্ষেত্রে। কমিউনিজম ছাড়া যে মানবতা প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হতেই পারে না, এমন কথা আর জোর করে বাইরের লোকদের কাছে তাঁরা বলতে চাইলেন না, নিজেদের দেশে যে-কথাই বলুন এবং যে-কাজই করুন। কমিউনিজম-এর সহায়তায় তাঁরা যে সোস্যালিজমই প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং পরিপূর্ণ সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্রই যে তাঁদের আদর্শ, এই কথার উপরই তাঁরা জোর দিতে লাগলেন বেশি। ভারত-রাষ্ট্রও ঘোষণা করল যে, সোস্যালিষ্ট প্যাটার্নে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করা তারও কামনা। এই ঘোষণা দুটি কাজ করল। প্রথমত, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অর্থাৎ পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিকগুলি ভারত রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল বলেই গ্রহণ করতে পারল; দ্বিতীয়ত, কমিউনিজম-এর বিরোধীরাও বুঝতে পারল ভারতবর্ষ আর যাই করুক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র হয়ে কমিউনিজকে দুর্বার করে তুলবে না।

এই দুইটি কাজে জওহরলাল নেহরু যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন, তা তাঁকে দল-নায়কের উর্ধ্বে তুলে রাষ্ট্র-নায়ক করে দিল, পৃথিবীর দলগত সকল প্রাইম্-মিনিষ্টারদের চেয়ে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন। ভারতীয় কমিউ-নিষ্টরা তাঁর বৈদেশিক নীতি সমর্থন করলেন, তাঁর পঞ্চশীলের বাণী প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিলেন, তাঁর বিশ্ব-শান্তি স্থাপন প্রয়াস তাঁদেরি উক্ত প্রয়াসকে স্বার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে স্বীকার করলেন, স্বীকার করে নিলেন যে ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিজম ছাড়াও ন্যাশনাল কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, এবং মানবের প্রগতির সহায়তা করতে পারে রেসপনসিভ কো-অপারেশন। এই পরিবর্তন বড় অল্প পরিবর্তন নয়।

নাটকের কথা লিখতে বসে এত কথা লিখলাম বলে পাঠকদের কেউ কেউ

হয়ত ভাবতে পারেন যে, ধান ভানতে আমি শিবের গীত গেয়েছি। এ-কথা অনেকে বলবেন জানি, অনেকে যেমন বলেন নাটক লিখতে বসে স্বদেশী-স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার নাট্যকারেরা তাই-ই করেছেন, অর্থাৎ প্রচারণাই করেছেন। আমরা তা অস্বীকার করি না। কেন না আমরা নাটক লেখবার প্রেরণা পেয়েছি জাতির ওই গুরুতর প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই। আমাদের পূর্বাচার্যেরাও তাই পেয়েছিলেন। আমাদের পরবর্তীরা যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন নবান্ন দিয়ে, তাঁরাও ওই প্রেরণা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। সামাজিক এবং রাজনীতিক সমস্যা আমাদের পূর্বাচার্যদের কাছে যা ছিল, আমাদের কাছে তা স্বতন্ত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, এবং আমাদের অনুজরা আরো নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তর কাটিয়ে জাতি খাদ্য ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, এলো উদ্বাস্তু আশ্রয়হারার দল, এল প্ল্যানিং, সমাজ পুনর্গঠনের নানা পরিকল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোলো রাজ্য পুনর্গঠনের পালা। রাষ্ট্র-সমাজের নানা পরিবর্তনের সময় নাট্যকেরা যে নানা বিষয়ে নানা মতের অধিকারী হবেন, নানা দাবীকে তাঁরা যে প্রতিফলনের বিষয় করে নেবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি থাকতে পারবে? তা না হলেই হতাশার কারণ ছিল। নাট্যকেরা যা করেছেন, তাতেই খুসি হবার কারণ না থাকলেও আশা পোষণ করবার কারণ অবশ্যই ছিল, যদি না দলগত স্বার্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। এই প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকূল ব্যবস্থা সত্বেও গণনাট্য-সঙ্ঘ, বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার, থিয়েটার সেণ্টার প্রভৃতি যা করেছেন, তার মূল্য নিশ্চিতই নগণ্য নয়। যুগের দাবী ওঁদের কাছে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ওঁরা কেবল নাট্যকে-নেশা নিয়েই নাট্যজগতে আবির্ভূত হন নি, নাটকের ভিতর দিয়ে যুগকে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব-বোধ ওঁদেরকে নাট্য-জগতে এনেছে। ওঁরা প্রায় সবাই গড়ে উঠেছেন জাতীয় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে—নবান্ন, দুঃখীর ইমান, ছেঁড়া তার, বাস্তুভিটা, তরঙ্গ, নতুন ইহুদী, দলীল প্রভৃতি নাটকে যে ত্রুটি-বিচ্যুতিই থাকুক না কেন, বাংলার ব্যথাকে, বাংলার চেতনাকে, বাংলার প্রয়াসকে যে রূপায়িত করেছে, সে-কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। ওর কোন একখানাতে কমিউনিজম-এর প্রচারণা নেই,

মানুষের কথাই বলা হয়েছে—যে মানুষদেরকে আগেকার বাংলা নাটকে দেখা যায় নি। সে মানুষও বিদ্রোহ করছে না, শুধু প্রকাশ করছে জীবন কী দুর্বিষহ হয়েছে তাই, চাইছে প্রতিকার। প্রতিকার চাইছে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের বহু কর্ণধার এই প্রতিকারের দাবী পছন্দ করছেন না। কিন্তু তাঁরা যদি চোখ বুজে থাকেন, অথবা তাঁদের দৃষ্টি যদি সুদূর-প্রসারী না হয়, তার জন্য কি শিল্পীরা দোষী হবে? দিল্লী আর্ট ক্লাব 'কল অব দি ভ্যালী' নাম দিয়ে একখানি নাটক পরিবেশন করেছিলেন। তাতে ছিল কাশ্মীরে আমেরিকান গ্রুপ কী অনিষ্টের আয়োজন করেছেন তারই চিত্র। বাংলার গণনাট্য-সঙ্ঘ শেখ আবদুল্লার কারসাজি নিয়ে একটি ছোট নাটিকা অভিনয় করেছিলেন। কোন সম্প্রদায়ই কি অন্যায় কাজ করেছিলেন? উচিত ছিল তাঁদেরকে উৎসাহ দেওয়া। জনসাধারণ তাই দিয়েছিল। কিন্তু শাসকদের অনেকে ওদেরকে দুশমন বলে ধরে নিলেন। বহুরূপী যখন 'রক্তকরবী' অভিনয় করলেন, কোলকাতায় প্রবল আলোচনার ঝড় উঠ্‌ল ওর রূপারোপ নিয়ে। এই রক্তকরবী আর ছেঁড়া তার ন্যাশনাল ড্রামা ফেষ্টিভ্যালে অভিনীত হবার মতো নাটক রূপে যখন নির্বাচিত করলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে আকাদেমীতে অভিযোগও গিয়েছিল। কিন্তু দিল্লীতে যাঁরা বিচারক ছিলেন, তাঁরা বহুরূপীকে আধুনিক নাটকের সর্বোত্তম অভিনয়ের জন্য সর্বোত্তম দল রূপে পুরস্কৃত করলেন। ছেঁড়া তার প্রচুর সুখ্যাতি পেল দিল্লীতে। আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম না। কিন্তু পরে যখন দিল্লীতে যাই, তখন ফেষ্টিভ্যালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন খুব উচ্চপদস্থ অফিসার আমাকে বল্লেন—"তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ।" আমি বল্লাম—"জানি, কমিউনিষ্ট নাটক পাঠিয়েছে বলে।" তিনি বল্লেন—"আরে, না। কমিউনিজম-বিরোধী নাটক পাঠিয়েছ বলে।" আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লাম—"সে আবার কোন্ নাটক!" তিনি বল্লেন—"রক্তকরবী।" আমি বল্লাম—"বলেন কি!" তিনি বল্লেন—"অভিযোগটা তাই।" আমি বল্লাম—"তাহলে মানতেই হয় দিল্লীর দর্শকরা নাটকের সমঝদার হয়ে উঠেছেন বাংলার কর্তাদের চেয়ে।" ফেষ্টিভ্যালে সাধারণ মঞ্চের নাটকও পাঠাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল

হইনি। কেন সফল হইনি সে-কথা বলে কোন লাভ নেই। ফেষ্টিভ্যালে "কল অব দি ভ্যালী"ও অভিনীত হয়েছিল। একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি। সে-কথা এই যে, জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমী অপর দুটি ন্যাশনাল আকাদেমীর মতোই ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান নয়, তিনটি আকাদেমীই এখনো পর্যন্ত সত্যি সত্যিই অটোনমাস প্রতিষ্ঠান। ওদের বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হলে কোনটিতেই কি রাজ্য গবর্ণমেণ্টের, কি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের, কোন মনোনীত সদস্য থাকবে না। আমি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মনোনীত প্রতিনিধি নই। পশ্চিম-বঙ্গের আকাদেমী সম্ভবত খাস সরকারী প্রতিষ্ঠান। ন্যাশনাল আকাদেমীর সঙ্গে ওর যোগও নেই, বিরোধও নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের নায়কদের অনেকে ন্যাশনাল সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর প্রতি বিরূপ, ওটি নির্দলীয় বলে,—বহুরূপী, দিল্লী আর্ট থিয়েটার, গণনাট্য-সঙ্ঘ প্রভৃতির সৃষ্টিকেও বিচার করে দেখতে চায় বলে।

ভারতের নানা-রাজ্যে নানা সম্প্রদায় আজ নাটকের মাধ্যমে নানা কাজ করছেন। অধিকাংশ রাজ্য-সরকারই নব-নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান করেন, সহায়তাও করেন—ব্যতিক্রম কেবল দেখা যায় বাংলাদেশে। বাংলা সরকার যা কিছু করেন, সবই করেন খাস তত্বাবধানে। কেন এই ব্যতিক্রম? দলগত স্বার্থের কারণে। এখানে কী নাটক করা হোলো, তার বিষয়বস্তু কী, কেমন তার অভিনয়, তার প্রযোজনায় কি নূতনত্ব এল, তার বিচার করা হয় না—শুধু বিচার করা হয় নাটক কে লিখল, কারা অভিনয় করল, কারা ভালো বল্ল তাই। যদি দেখা গেল লেখকরা, অভিনেতৃরা, সমর্থকরা, কর্তৃত্ব প্রাপ্ত দলের লোক নয়, তাহলেই ধরে নেওয়া হোলো তারা কমিউনিজমই প্রচার করছে, বিশেষ করে তারা যদি এমন নাটক লেখে, এমন অভিনয় করে, যার মতো নাটক স্বরাজ পাবার আগে লিখিত বা অভিনীত হয় নি।

বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের সময় থেকে, বিয়াল্লিশের বিপ্লবের সময় থেকে, উদ্বাস্তুর সৃষ্টি থেকে, যে-সব মরমী দরদী তরুণ-তরুণী লেখক হিসেবে, শিল্পী

হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সমাজকে, রাষ্ট্রকে, মানুষকে, নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখা শুরু করেছেন। তাঁরা যে অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়েছেন, সে অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁদের পূর্ববর্তীদের আত্ম-প্রকাশ করতে হয়নি। তাঁদের দৃষ্টি-কোণ নূতন হবারই কথা। না হোতো যদি, তা কেবল দুঃখের কথাই হোতো না, লজ্জারও কথা হোতো। এঁদের বেশির ভাগ লেখক ও শিল্পী প্রাক্-স্বাধীনতা আমলের কংগ্রেস যে-দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রকে, সমাজকে, এবং মানুষকে দেখত, সে-দৃষ্টি দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের সমাজকে ও মানুষকে দেখতে পারলেন না। এটাও তাঁদের অপরাধ নয়।

কংগ্রেসই যে স্বাধীনতার আগে যে দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের সমাজকে এবং মানুষকে দেখেছে, এখনো তা-ই দেখছে, আমি নিজে তা মনে করি না। কিন্তু কংগ্রেসের নতুন দৃষ্টির পরিচয় কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, মঞ্চে ও পর্দায় পাই না। কেন পাই না? লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা প্রায় সকলেই ত কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের অনেককেই তাঁদের পাশে দেখতে পাই। তাঁরা কেন তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা কংগ্রেসের নূতন দৃষ্টি ফলিয়ে ধরতে পারেন না? আগেকার অভিনেতৃদের মাঝে একমাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়া আর কাউকে সেই উনিশ শ' পাঁচ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র-সমাজের মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখিনি।

কিন্তু কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত না হয়ে যাঁরা নূতন নাট্যান্দোলন সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা বিপ্লবের ভিতরেই বর্ধিত হয়েছেন। তাঁরা তাই নাটককে কেবলমাত্র বুর্জোয়া ট্রাজেডি-কমিডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না, কৃষক শ্রমিক মুটে মজুর প্রভৃতির জীবনকে প্রতিফলিত করতে চাইছেন। মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরকেও তাঁরা উপেক্ষা করছেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমার মনে হয়না গণনাট্য-সঙ্ঘ, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, থিয়েটার সেণ্টার প্রভৃতি যে নাটক পরিবেশন করেন, তা তাঁরা অবাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন। মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিংয়ের সংশ্লিষ্ট ড্রামা-অর্গানাইজেশন যে-সব নাটক প্রচার করছেন, তাদের অভিনয় আমি দেখেছি। আমার মনে হয় প্রগতিশীল দলগুলি যে নাটক

পরিবেশন করেন, সেগুলিও জাতির পক্ষে বা রাষ্ট্রের পক্ষে তুলনায় কম প্রয়োজনীয় নয়। জাতির প্রতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আমার যে আন্তরিক দরদ নেই, তা আমি মনে করি না, এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় একাধিক মিনিষ্ট্রির সঙ্গে সহযোগিতাও আমি করে এসেছি, যখনই তাঁরা তা চেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার মনিব-ভৃত্যের সম্বন্ধ নেই। আমি জানি এবং মানি তাঁরা নাটকের মারফত জনোন্নয়ন করতে চান।

কিন্তু সব সত্ত্বেও দেখে বিস্মিত হই বাঞ্ছিত ব্যবস্থা হয় না। এ সম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রাজনীতি একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার বলেন নাটকে আবার রাজনীতির আমদানি কেন? সাহিত্যিকরা অম্নি সায় দিয়ে বলেন—তাই ত! নাটকে আবার রাজনীতি কেন? সাধারণ মঞ্চের মালিকরা সেই কথা শুনে গলা বাড়িয়ে বলেন—আমরা ব্যবসায়ী, আমরা অর্থনীতি বুঝি, রাজনীতি আমরা চাই না। সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা বলেন—আমরা আর্টে উৎসর্গীকৃত, আমরা ত চিরকালই বলে এসেছি, মেনে এসেছি, আর্ট সকল নীতিরই ঊর্ধ্বে। কিন্তু নাট্যকেরা ও-কথা বলতে পারেন না, বিশেষত নূতন নাট্যকেরা, যাঁরা সাহিত্যিক হননি, মঞ্চমালিক হননি, সাধারণ মঞ্চের আর্টিষ্ট হন নি। তাঁরা যে জানেন আজকার রাজনীতি মানুষের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়—রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, জীবন, মরণ। ও-সব বাদ দিয়ে নাটক লেখবার কোনই ত মানে হয় না। তাঁরা সবই বলতে চান, সবই দেখাতে চান।

কিন্তু সব বলবেন কি করে? ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন নেই? সে আইন আছে, এবং থাকবেও। প্রি-সেন্সারসিপ ওতে নেই, কিন্তু ওরই কল্যাণে চালু হয়েছে। আইনত তাও থাকতে পারে না। কিন্তু পুলিশ মঞ্চমালিকদের বলে দেন, তাঁদের ছাড়পত্র যাঁরা দেখাতে পারবেন না, তাঁদেরকে নাটক অভিনয় করবার জন্য তাঁরা যেন মঞ্চ ভাড়া না দেন। এ নির্দেশ মুখে দেওয়া হয়, লিখে নয়। মঞ্চমালিকরাও মুখে বলে দেবেন ছাড়পত্র দেখাতে পারেন মঞ্চ ভাড়া দেব, নইলে নয়। ছাড়পত্র এনে অভিনয় করতে হলে ভাড়া দিতে হবে

অভিনয় পিছু তিনশ টাকা; কিন্তু টিকিট বিক্রয় করতে দেওয়া হবে না। টিকিট বিক্রয় করতে হলে অভিনয় পিছু ভাড়া দিতে হবে পাঁচশ টাকা, আর প্রমোদকর জমা দিতে হবে আগাম কমসে-কম আড়াইশ টাকা, বেশি চাইলেও দিতে হবে। টিকিট বিক্রয় না করলে প্রমোদকর-কলেক্টরকে নাম-ধাম দিয়ে আসতে হবে তাঁদের, যাঁরা অভিনয়ের ব্যয় বহন করবেন। মিথ্যে বলা হোলো কি সত্যি বলা হোলো, তা হয়ত তদন্ত করা হবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের সাহায্যে। নাটককে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখবার জন্য কী জাল বিস্তার করা হয়েছে দেখুন। কিন্তু তবুও সৌখিন সম্প্রদায়ের নাটক অভিনীত হয়, কোন মঞ্চ কোনদিনই খালি থাকে না। কারা অভিনয় করেন? করেন আফিসের ক্লাবগুলি। তাঁদের টাকা চাঁদায় ওঠে, আফিস থেকেও কিছু আদায় হয়। আরো কেউ কেউ করেন, টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন আমি বলতে পারি না, পুলিশ হয়ত জানেন। কী নাটক এঁরা অভিনয় করেন? সাধারণত পুরোণো নাটক, অথবা সাহিত্যের নাম করা কোন গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ— নূতন নাটক অভিনয় করবার ঝামেলায় কেউ বড় এগুতে চান না। মঞ্চ-মালিকরাও নূতন নাটকের দায়িত্ব নিতে চান না কর্তাদের কার কোন্ নাটক দেখে কখন মুখ ভারি হবে তাই ভেবে। মুখে অবশ্য তাঁরা বলেন নাটকই কেউ লিখতে পারে-না, তাঁরা অভিনয় করবেন কি? আশী বছর বাংলা থিয়েটার নূতন নাটক লেখবার লোক পেল, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পরই নাকি লেখবার লোকের অভাব ঘটল! এটা প্রমাণিত হওয়ায় স্বরাজের গৌরব বাড়ল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা স্বরাজের মিত্র নন।

## ( ২০ )

## আগামীকালের প্রস্তুতি

মানুষের প্রতিষ্ঠাই নাটুকদের কামনা। নাটকের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাবোধ মানুষের মনে মনে সহজে বুনে দেওয়া যায়। তাই আমি যেমন জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর মারফত কাজ করবার সুযোগ পেয়ে খুসি আছি, তেমনই খুসি আছি ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং ভারতের সকল রাজ্যের সকল প্রগতিশীল নাটুকেদের প্রীতি পেয়ে। ততোধিক খুসি আছি বিশ্বশান্তি সংসদের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। আমি বিশ্বাস করি মানুষের প্রতিষ্ঠার, মানুষের জয়যাত্রার, প্রতিবন্ধকতা করতে ভারত-রাষ্ট্র কথনো সজারু-পৃষ্ঠ হবে না—, রাষ্ট্র কংগ্রেসীই থাকুক, কি কমিউনিষ্টই হোক, কি সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বেই পরিচালিত হোক্। আমি তাই চাই :—

(১) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আইন বাতিল করা হোক্।

(২) প্রি-সেন্সারশিপ রদ করা হোক্।

(৩) ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত লাভের উদ্দেশ্য নেই, এমন সকল নাট্য-প্রতিষ্ঠানকে প্রমোদ-করের দুর্বহ বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক্।

(৪) কোলকাতা শহরে আরো নাট্য-গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হোক্, যেখানে নন-কমার্শিয়াল নাটুকে দলগুলি অভিনয় করতে পারেন। রাষ্ট্র-পরিচালকদের মনে রাখা উচিত যে, কোলকাতার ন্যায় জন-সংখ্যা যে-শহরে আছে, কোন সভ্য দেশে সে-শহরের অধিবাসীরা মাত্র চারটি থিয়েটার নিয়ে সভ্যতার গরব করে না।

(৫) কর্পোরেশন কয়েকটি বড় পার্কে ওপন-এয়ার থিয়েটারের মঞ্চ তৈরি করে দিন, যেখানে নাচ গান ও নাট্যাভিনয় মারফত সমাজ-কল্যাণের প্রেরণা দেওয়া হবে।

(৬) সরকার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ষ্টেট-থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করুন, এবং একটি অটোনমাস বডি তৈরি করে ওটি পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ

করুন। কমার্শিয়াল থিয়েটার ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান। নাটক ও অভিনয় এবং নাট্য-প্রযোজনার মানোন্নয়নের দায়িত্ব সেই সব থিয়েটারের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজও থাকুক, জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হোক্।

(৭) প্রত্যেক মিউনিসিপালিটিতে একটি করে নাট্যগৃহ তৈরি করা হোক্। ষ্টেট থিয়েটারের কোন কোন দলকে সেখানে অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া হোক্, এবং সেগুলিতে সৌখিন সম্প্রদায়গুলিকেও অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হোক্।

(৮) প্রত্যেক বড়-বড় হাটের কাছে একটি করে ওপন-এয়ার থিয়েটারের মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হোক্। সেখানে ষ্টেট থিয়েটারের কোন-কোন দলকে এবং সৌখিন দলগুলিকে হাটের দিনে দিনে অভিনয় করতে দেওয়া হোক্।

(৯) লিখিত নাটক প্রকাশ করবার জন্য একটি কো-অপারেটিভ পাবলিশিং হাউস গড়ে তোলা হোক্।

(১০) এমন কয়েকটি যাত্রার দল গড়ে তোলা হোক্ যারা যাত্রার ট্রাডিশনাল ফর্ম ফিরিয়ে আনবে, থিয়েটারের নকল করবে না।

আমার বিশ্বাস নবযুগের নাটুকেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ দান করলে তাঁরা কখনই এমন কাজ করবেন না, যাতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে, জাতির ক্ষতি হবে। নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘকাল অযথা 'নেই নেই' জিগীর জাগিয়ে রাখা হয়েছে। তার প্রতিধ্বনি বিদেশেও শুনে এসেছি। এই আলোচনায় আমি দেখিয়েছি বাংলা নাটকের দান নগণ্য নয়। যাঁরা তা জানেন না, তাঁরা সত্যকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু আমি এ-কথাও বলি না, যা হয়েছে খুবই হয়েছে। আমি জানি যুগে-যুগে নাটকের পরিবর্তন হতে বাধ্য। যুগকে ফুটিয়ে তোলা, ফলিয়ে ধরা, নাটকের প্রধান কাজ। সার্থক ভাবে তাই করতে পারলেই যুগের নাটকও, যুগকে অতিক্রম করে, প্রেরণাপ্রদ হতে পারে। আমি

# আগামীকালের প্রস্তুতি

মানি না সর্বযুগে নাটক একই রূপ ধরে গড়ে উঠবে। যে যুগের নূতন নাট্যকেরা নাটকের যে রূপ দেবেন, তাই হবে সেই যুগের নাটক। পৃথিবীতে এতদিন তাই হয়ে এসেছে। আমি দেখে এসেছি পিপলস্ ডেমোক্রেশীগুলি নাটকের ও নাট্যশালার মাধ্যমে মানব-জীবনকে কেমন সুন্দর করেই না ফুটিয়ে তুলছে। আমি জানি প্রাচীন ভারত অতীতে তাই করতে সফল হয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের ভারতও তাই পারবে। শুধু রাষ্ট্রকে সুস্থচিত্তে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে, দলগত মনোভাব পোষণ না করে, উদার দৃষ্টি নিয়ে নাট্য-প্রয়াসকে জাতীয় প্লানিংয়ের ভিতরে স্থান দিতে হবে। স্বীকার করে নিতে হবে ডেমোক্রেশী দলগত ক্ষমতার হস্তান্তর বা রাষ্ট্র-কাঠামোর রূপান্তর অস্বীকার করে না বলেই তার মর্যাদা দেওয়া হয়। যে-ডেমোক্রেশী তা অস্বীকার করে, তা মর্যাদা পাবার অযোগ্য। নাটক নেই, নাটক হয় না, এ-কথা বলা বা মেনে নেওয়া, না সাহিত্যিকের, না রাষ্ট্র-পরিচালকদের গৌরবের কথা। যে-সাহিত্যে ভালো নাটক হয় না, বুঝতে হবে সে-সাহিত্য একান্তই অপরিণত। যে-রাষ্ট্রে ভালো নাটক হয় না, অভিনয় হয় না, বুঝতে হবে সে-রাষ্ট্র পুরোপুরি সভ্য হয়ে ওঠেনি, সংস্কৃতিকে জানেনি। আমি বিশ্বাস করি না আমাদের সাহিত্য, আমাদের রাষ্ট্র, সত্যই নিকৃষ্ট। আমাদের সাহিত্যে নাটকও হয়, নাট্যশালাতেও হয় অনেক সু-অভিনয়। যুগ-যুগান্তরের জীবনাদর্শের সংঘর্ষই নাটককে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে যায়। আর ওরই মাঝে নাটক যুগোত্তীর্ণও হয়, চিরন্তন রূপও পায়।



---

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬